বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা

বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা

প্রথম খণ্ড

পরমেশ আচার্য

অনুষ্টুপপ্রকাশনী
২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯

গ্রন্থস্বত্ব :
গায়ত্রী আচার্য

প্রথম প্রকাশ :
মাঘ ১৩৭২

প্রকাশক :
অনিল আচার্য
অনুষ্টুপ প্রকাশনী
২ই নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ :
প্রবীর সেন

মুদ্রক :
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬

বাবার স্মৃতির উদ্দেশে

বিষয়সূচি

গোড়ায় কিছু কথা

বাংলার দেশজ শিক্ষার ইতিহাস রচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। বাংলার দেশজ শিক্ষার উদ্ভব, ক্রমবিকাশ, বৈশিষ্ট্য, আর তার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট আমাদের আলোচনার পরিধি। তবে বাংলার দেশজ শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করতে হলে গোড়াতেই এই আলোচনার পদ্ধতি, প্রয়োজন ও কয়েকটি সম্পর্কিত বিষয়ের ধারণা সুস্পষ্ট করে নেওয়া দরকার। দেশজ শিক্ষা বলতে কী বোঝায়। যে দেশের দেশজ শিক্ষা সেই দেশ ও দেশবাসীর পরিচয় প্রসঙ্গে ভাব, ভাষা ও ভূগোল, এক কথায় আঞ্চলিক বিশিষ্টতা সম্পর্কেও দু'এক কথা বলে নেওয়া দরকার। সেইসঙ্গে এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সাক্ষ্যপ্রমাণের উৎস বিষয়েও কিছু উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। আর তাই এই গোড়ায় কিছু কথা।

দেশজ শিক্ষা

দেশজ শিক্ষা কথাটির আক্ষরিক অর্থ দেশজাত শিক্ষা। কোন দেশের মাটিতে যে শিক্ষা স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে অর্থাৎ যা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয় তাকেই দেশজ শিক্ষা বলা যায়। ইংরেজি *indigenous education* কথার অর্থও তাই। একটি তাত্ত্বিক ধারণা হিসাবে শিক্ষা কথাটি নিয়ে কিন্তু পণ্ডিতমহলে আলোচনার অন্ত নেই। সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারণতত্ত্ব হিসাবেই বুঝি শিক্ষা কথাটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। শিক্ষা ষড় বেদাঙ্গের একটি। প্রচলিত অর্থ শেখা। কোন বিষয় আয়ত্ত করার জন্য যে অভ্যাস বা চর্চা তাই শিক্ষা। ইংরেজি *education* কথাটির আভিধানিক অর্থ শিশুকে গড়ে তোলা বা ভেতরের শক্তিকে বাড়িয়ে তোলার তালিম। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে তালিম কথাটি বুঝি অনেক বেশি দ্যোতক। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী 'নই তালিম' কথা ব্যবহার করেছেন। ইংরেজিতে education, instruction, training এই নামবাচক শব্দগুলি বা educate, instruct, train এই ক্রিয়াবাচক শব্দগুলি সমার্থক না হলেও নিকট-সম্পর্কিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। আসলে শিক্ষা কথাটি

যেমন ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা যায় তেমনি তার একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞাও আছে। ব্যাপক অর্থে শিক্ষার অস্তিত্ব সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেও আঁচ করা যায়। শিশু বাবা-মার কাছে যে বৃত্তিগত তালিম পেত বা বাবা-মার কাছ থেকে যে নৈতিক বোধ বা মূল্যবোধ আত্মস্থ করে, ব্যাপক অর্থে তাও শিক্ষার আওতায় পড়ে। এমনকি সমাজে বাস করার ফলে শিশুর মধ্যে যে সামাজিক বোধ গড়ে উঠে তাও ব্যাপক অর্থে শিক্ষা। নির্দিষ্ট অর্থে শিক্ষা বলতে বোঝায় আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। সমাজবিকাশের ধারায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্ভব থেকেই নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় শিক্ষাব্যবস্থার শুরু ধরা হয়। একটি বিশেষ দেশে বাসকারী জনগোষ্ঠী নিজেরা নিজেদের জন্য যে নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং যা তারা নিজস্ব পদ্ধতিতে পরিচালনা করে তাকেই সেই দেশের দেশজ শিক্ষাব্যবস্থা বলা যায়। একটি বিশেষ দেশ বাংলায় স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠা শিক্ষার এই আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপের ইতিহাসই আমাদের আলোচনার বিষয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে আমাদের দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল উনিশ শতকের ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ ও শাসকরা তাকেই দেশজ শিক্ষা বা indigenous education বলেছেন। উইলিয়াম অ্যাডাম ১৮৩৫, ১৮৩৬ ও ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে, উনিশ শতকের গোড়ায় বাংলা ও বিহারে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল সে সম্পর্কে তিনটি প্রতিবেদন সরকারে পেশ করেন।[১] এই প্রতিবেদনে দেশজ প্রাথমিক শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লেখেন, "যেসব স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয় এবং যেগুলি দেশীয় লোকের সাহায্যে দেশীয় লোকের দ্বারা স্থাপিত অর্থাৎ যেগুলি কোন ধর্মীয় সংস্থা বা দাতব্য সংস্থার সাহায্য গড়ে ওঠেনি, সেইসব স্কুলকে দেশজ প্রাথমিক স্কুল বলা হচ্ছে।" এখানে দাতব্য ও ধর্মীয় সংস্থা বলতে অ্যাডাম প্রধানত খ্রীস্টান মিশনারিদের কথাই বলেছেন। অবশ্য তিনি তাঁর প্রতিবেদনে এ কথাও বলেছেন, "মুসলমানদের নিজেদের কোন আলাদা দেশজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই।"[২] এ হিসাবে 'মখতব'কে দেশজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করা হচ্ছে না বলেই মনে হয়। মুসলমানের 'মখতব' ও 'মাদ্রাসা'কে দেশজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলা যায় কিনা সে আলোচনার আগে ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন দেশজ শিক্ষা সম্পর্কে যে-সংজ্ঞা দিয়েছেন তা আমরা জেনে নেব।

ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশনের ১৮৮৩ সালের প্রতিবেদনে দেশজ শিক্ষার

সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইভাবে, "দেশজ শিক্ষালয় বলতে বোঝায় সেইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেগুলি দেশীয় লোকেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এবং যেগুলিতে দেশীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এইসব শিক্ষালয়গুলি হয় শুধুই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাহয় একেবারেই প্রাথমিক শিক্ষালয়।" শিক্ষা কমিশনের মতে, "প্রাথমিক শিক্ষার চাইতে উচ্চশিক্ষায় ধর্মীয় প্রভাব অনেক বেশি, সে হিন্দুর টোলই হোক বা মুসলমানের মাদ্রাসাই হোক।" শিক্ষা কমিশন আরও জানাচ্ছেন যে, "হিন্দুর উচ্চশিক্ষালয়গুলিতে কার্যত ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের প্রবেশ নিষেধ; কিন্তু হিন্দুর প্রাথমিক পাঠশালায় সকল বর্ণের ছেলেরাই পড়তে পায়; তাছাড়া এই শিক্ষার বিষয়গুলির ব্যবহারিক উপযোগিতা এমন যে নিচুশ্রেণীর লোকেদের বিভিন্ন পেশায় পারদর্শী হতে আর লেনদেনের ঠগ-জুয়াচুরির হাত থেকে রেহাই পেতে তাদের সাহায্য করে; অন্যদিকে মুসলমানের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মীয় শিক্ষার প্রাধান্য দেখা যায়, সেখানে অঙ্কের চাইতে কোরানের উপর জোর দেওয়া হয় বেশি।"[৩] শিক্ষা কমিশনের এই মন্তব্য যে যথার্থ, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা কমিশন মুসলমানের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'মখতব' ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'মাদ্রাসা'কে দেশজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবেই ধরেছেন। শিক্ষা কমিশনের এ মত আমাদের সঙ্গত বলেই মনে হয়। যদিও এবিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। এবিষয়ে আমাদের কথা বলার আগে দেশজ শিক্ষার একটা মোটা দাগের বিবরণ হাজির করা দরকার।

ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা চালু হওয়ার আগে এদেশে লেখাপড়া শেখার দুটো পুরোপুরি আলাদা ধারা চালু ছিল। একটি উঁচুবর্ণের ও উঁচুশ্রেণীর গতর-আয়েসী মানুষের সংস্কৃত ও আরবী-ফারসী শিক্ষাধারা। আর অন্যটি সকলের বিশেষ করে গতরখাটা মানুষের কথার ভাষায় লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার ধারা। প্রথম ধারায় সংস্কৃত শাস্ত্রীয় শিক্ষার জন্য ছিল চতুষ্পাঠী আর আরবী-ফারসী ইসলামী শিক্ষার জন্য ছিল মাদ্রাসা। দ্বিতীয় ধারায় শেখা চলত পাঠশালা আর মখতবে। পাঠশালা আর মখতবকে বলা যায় সাধারণ শিক্ষার স্কুল। এই দুই ধারার শিক্ষার মধ্যে কোন পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল না, যেমন এখনকার প্রাথমিক, মাধ্যমিক আর উচ্চশিক্ষার মধ্যে আছে। এই দুই ধারার শিক্ষাই ছিল আপনভরা বা স্বয়ংসম্পূর্ণ।[৪] প্রথম ধারার সংস্কৃত বা আরবী-ফারসী শিক্ষা চলত প্রধানত রাজা-জমিদারদের দেওয়া লাখেরাজ জমির আয়ের উপর

নির্ভর করে। আর দ্বিতীয় ধারার বাংলা পাঠশালা ছিল পুরোপুরি পড়ুয়াদের দেওয়া বেতন বা সিধার উপর নির্ভরশীল। মসজিদ সংলগ্ন মখতবগুলি অবশ্য বহুক্ষেত্রেই মসজিদের সম্পত্তির আয় থেকেই চলত। পাঠশালার সঙ্গে মখতবের আরো একটা বড় তফাত ছিল। মখতবগুলি অনেক বেশি ধর্মীয় প্রভাবাধীন, কিন্তু পাঠশালার শিক্ষা ছিল মোটামুটি ধর্মনিরপেক্ষ বা 'সেকুলার' এবং অনেকটাই ব্যবহারিক। এই দুই ধারার শিক্ষা অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা, পরিচালনা বা সংগঠিত করার জন্য কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল না বা এদের উপর রাষ্ট্রের বা সরকারের কোন সরাসরি কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু প্রথা ও ঐতিহ্যবলে এগুলি প্রায় একই ধরনের বা মানের শিক্ষা দিত। শিক্ষকই ছিলেন এই দুই ধারার শিক্ষার মূল খুঁটি।* এইসঙ্গে একটি তৃতীয় ধারার উল্লেখ করা যায় যাকে ফারসী স্কুল বলা যেতে পারে। এগুলিও প্রধানত শিক্ষক বা কোন অভিভাবকের ব্যক্তিগত উদ্যোগে পড়ুয়ার চাহিদা ও পড়ুয়ার দেয় বেতনের ভিত্তিতে গড়ে উঠত। এগুলিতে রাজভাষা ফারসী শেখানো হত। এখানে অঙ্ক শেখার রেওয়াজ বড় একটা ছিল না। আর এই স্কুলগুলিও ছিল যথেষ্ট সেকুলার। এই বিভিন্ন ধারার দেশজ শিক্ষার ইতিহাসই আমাদের আলোচনার বিষয়। মুসলমানের মখতব ও মাদ্রাসাকে দেশজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলা যায় কিনা এবার আমরা সেবিষয়ে কিছু আলোচনা করব।

ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মখতব ও মাদ্রাসার উদ্ভব হয়েছিল আরব দেশে ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। এদেশ জয় করার পর মুসলমান শাসকরা এই ইসলামী শিক্ষা এদেশে চালু করে। ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা যা ব্রিটিশ শাসকরা এদেশে চালু করেছিল, তাকে যখন দেশজ শিক্ষা বলা হচ্ছে না, তখন মুসলমান শাসক প্রবর্তিত ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থাকে দেশজ শিক্ষা বলা যায় কিনা এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আসলে কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে বিরাট গুণগত পার্থক্য আছে। ব্রিটিশরা এদেশ জয় করে একে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন একটি উপনিবেশে পরিণত করে। মুসলমান শাসকরা কিন্তু আরব, পারস্য, তুর্ক বা অন্য কোন দেশের অধীন হিসাবে এই দেশ শাসন করেননি। তাঁরা ভারতে এসে স্থানীয় শাসকদের পরাজিত করে শাসনক্ষমতা দখল করেন এবং এদেশের বাসিন্দা হিসাবে থেকে যান। তাছাড়া, বিরাটসংখ্যক ভারতবাসী ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করায় মুসলমান শাসন স্বাভাবিক রূপ নেয়। ভারতের স্বাধীন সত্তা বজায় থাকে। অন্য দেশ থেকে এদেশে এসে রাজ্য স্থাপন করায় যদি মুসলমান শাসকরা বিদেশী তবে তো

তথাকথিত আর্যরাও বিদেশী। পণ্ডিতরা মনে করেন, আর্যরা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দলে ভারতের ভৌগোলিক সীমার বাইরে থেকে এদেশে এসে স্থানীয় শাসকদের পরাস্ত করে বসতি করেন এবং নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করেন। অবশ্য তাঁরা আর তাঁদের পূর্বতন বাসস্থানের সঙ্গে কোনরকম সম্পর্কই রাখেননি। এদেশের উচ্চশ্রেণীর মুসলমানরা যত ক্ষীণই হোক, আরব দেশের সঙ্গে একটা ধর্মীয় যোগসূত্র রাখার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যের হানি ঘটতে দেননি। মুঘল বাদশাহ আকবর এমনকি এই ধর্মীয় যোগসূত্রও ছিন্ন করেছিলেন।

এবিষয়ে সন্দেহ নেই শাসকশ্রেণীর স্বার্থেই এদেশে ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তনের সূচনা হয় এবং প্রথম দিকে সরকারি উদ্যোগে এদেশে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ঘটে এমন সাক্ষ্যও যথেষ্ট পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে একথাও ঠিক যে বিরাট-সংখ্যক ভারতবাসী ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করায় তাদের চাহিদা মেটাতে স্বাভাবিকভাবেই এদেশে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ঘটেছিল। এই ইসলামী শিক্ষা কিন্তু দেশে প্রচলিত অন্য শিক্ষাধারাগুলির পাশাপাশিই চলেছিল। মুসলমান শাসকরা প্রচলিত স্থানীয় শিক্ষার উপর কোন জোরজবরদস্তি করার চেষ্টা করেনি। বরঞ্চ কালে এদেশে প্রচলিত ইসলামী শিক্ষা কিছু কিছু দেশীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। আবার মুসলমান শাসনকালেই বাংলায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ও বাংলা শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার ঘটে। শিক্ষার উপর সরকারের সরাসরি কোন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল না। প্রধানত বেসরকারি উদ্যোগেই শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তার ঘটত। দেশীয় মুসলমানের চাহিদায় তাদের উদ্যোগে স্বাভাবিকভাবে যে ইসলামী শিক্ষা এদেশে গড়ে উঠেছিল তাকে দেশজ শিক্ষা বলাই সঙ্গত।

এদেশে ব্রিটিশ শিক্ষার ভূমিকা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। এদেশের উপর ব্রিটিশ অধিকার কায়েম রাখার জন্যই ব্রিটিশ শিক্ষা ও শাসনপ্রথা এদেশে চালু করা হয়। সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন কেন্দ্রীয় কাঠামোর আওতায় একক ধারার এমন এক সর্বময় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় যার দাপটে দেশজ শিক্ষার অপমৃত্যু ঘটে। সবচাইতে বড় ক্ষতি হয় দেশজ সাধারণ শিক্ষাধারার। দেশজ সাধারণ ব্যবহারিক শিক্ষাধারার পরিবর্তে একক শিক্ষাধারার প্রারম্ভিক স্তর হিসাবে কেতাবী শিক্ষার যে প্রাথমিক স্কুল গড়ে ওঠে তার সঙ্গে গতরখাটা সাধারণ

মানুষের জীবনের কোন যোগ থাকে না ফলে তাদের অচিরেই শিক্ষার আঙিনা থেকে বিদায় নিতে হয়।

ইংরেজ অধিকারের পরও বহুকাল বাংলায় ও বাংলার বাইরে এই দেশজ শিক্ষাধারা চালু ছিল। উনিশ শতকের গোড়ায়ই ইংরেজ শাসকরা এদেশীয় লোকের শিক্ষাবিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন মনে করে। ইংরেজ শাসনের স্বার্থেই এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন জরুরি হয়ে উঠে। এবিষয়ে প্রথম পরিকল্পনা হাজির করেন চার্লস গ্রাণ্ট আঠার শতকের শেষে। উনিশ শতকের গোড়ায় মেকলের মিনিট ও বেণ্টিঙ্কের শিক্ষানীতি গ্রাণ্টের পরিকল্পনাকে সরকারি অনুমোদন দেয় এবং কার্যকর করার প্রথম পদক্ষেপ নেয়। আর এটা সম্ভব হয় মূলত পশ্চিমী ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত দেশীয় উঁচুশ্রেণীর একদল লোকের আগ্রহে ও সক্রিয় সমর্থনে। এঁদের মধ্যে তথাকথিত 'বাংলার নবজাগরণে'র পুরোধা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও ছিলেন। ইতিমধ্যে অবশ্য খ্রীস্টান মিশনারিরা, প্রধানত ধর্মীয় উদ্দেশ্যে, দেশীয় লোকদের শিক্ষিত করার উদ্যোগ নেয়। তবে মিশনারিরা প্রথম দিকে মূলত নিচুশ্রেণীর দেশীয় লোকদের মধ্যেই শিক্ষাপ্রসারের চেষ্টা করে। ফলে দেশজ পাঠশালা শিক্ষার ধারাকে কাজে লাগানোর চেষ্টাও দেখা যায় এদের কাজকর্মের মধ্যে। শ্রীরামপুরের তিন মিশনারি, মিশনারি মে-র কাজকর্ম বা জেমস লঙের শিক্ষা বিষয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে এঁরা দেশজ পাঠশালা শিক্ষার সুবিধাগুলি বজায় রেখে পশ্চিমী ধাঁচের শিক্ষাপ্রসারের পরিকল্পনা করেছিলেন। অর্থাৎ বহিরঙ্গে এবং পদ্ধতিগতভাবে এঁরা দেশজ প্রাথমিক শিক্ষার ধারা বজায় রেখে চলতে চেয়েছিলেন। যদিও শিক্ষার বিষয়ের বিশেষ পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন।[৬] অ্যাডাম রিপোর্টেও মূলত এই রকম প্রাথমিক শিক্ষার সুপারিশ করা হয়েছিল। গ্রাণ্ট, মেকলে, রামমোহন বা বিদ্যাসাগর কিন্তু একেবারে খোলনলচে পাল্টে পুরোপুরি পশ্চিমী মডেলে এদেশে শিক্ষার প্রসার চেয়েছিলেন। তাঁরা দেশজ শিক্ষাধারাকে সবদিক দিয়েই অকেজো মনে করতেন। কারণ এঁরা প্রধানত দেশের উপরতলার লোকের শিক্ষা বিষয়েই বেশি মনোযোগী ছিলেন।

গ্রাণ্ট আর মেকলে চেয়েছিলেন ইংরেজিভাবে ভাবিত ও অনুগত এক শ্রেণীর প্রজা তৈরি করতে যারা এদেশে ইংলণ্ডের স্বার্থ বজায় রাখতে বিশেষ ভূমিকা নেবে। রামমোহন-বিদ্যাসাগর ইংলণ্ডীয় প্রজার সমকক্ষ ইংরেজি

শিক্ষায় শিক্ষিত এক দেশীয় শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কার্যত এই দুই উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। উনিশ শতকের তথাকথিত 'বাংলার নবজাগরণে'র হোতারা প্রায় সকলেই মেকলে ও বেন্টিঙ্কের শিক্ষা-নীতিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। যদিও গ্রাণ্ট ও মেকলের মিনিটে এই শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেই বলা ছিল। এবং এঁরা সে সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন। দেশীয় উঁচুশ্রেণীর সাগ্রহ সমর্থনেই উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষার অবাধগতি প্রসার সম্ভব হয়েছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নেই।[৭] আর এই ইংরেজি শিক্ষার দাপটে দেশজ শিক্ষাধারা নিভুনিভু হয়ে কিছুদিন টিকে থাকলেও অচিরেই লোপ পায়। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু লোক আর বাকি আপামর জনসাধারণের মধ্যে গড়ে ওঠে এক দুস্তর ব্যবধান। আজও সেই ব্যবধান অটুট। আজও ইংরেজি জানা লোকের দাপট অবাধ। আজও ইংরেজি না জানলে শিক্ষিত বলে গণ্য হওয়া যায় না। আজও দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ইংরেজি শিক্ষিত গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকারে। মাতৃভাষা না জানলেও চলে ; এমনকি মাতৃভাষা জানাটা অনেক ক্ষেত্রে লজ্জার বিষয় কিংবা না জানাটা গর্বের। আসলে ভারতবাসী বুদ্ধিজীবী এখনো গ্রাণ্ট আর মেকলের নাবালক মানসপুত্রই থেকে গেছে।

ইংরেজি শিক্ষা আমাদের এতখানি অভিভূত করেছে যে, আমাদের যে একটা দেশজ শিক্ষাধারা ছিল সেকথাই আমরা ভুলতে বসেছি। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাতে কি আমাদের কোন ক্ষতি হয়েছে? ক্ষতি যে হয়েছে তাতে বোধ করি কোন সন্দেহ নেই। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই ক্ষতি-বোধটাও আমাদের চেতনার স্তরে জেগে ওঠেনি। দেশজ শিক্ষাধারাকে অবজ্ঞা করে, পুরোপুরি অস্বীকার করে যে কোন জাতীয় শিক্ষানীতি রচনা করা যায় না এই মামুলি সত্যকেও আমরা মানতে রাজি নই। আসলে এই ক্ষতির সঠিক মূল্যায়ন বা এই অবহেলার তাৎপর্য বুঝতে হলে ইংরেজি শিক্ষার ফলে ভারতের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে যে জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটেছিল তার চরিত্র এবং তাদের সৃষ্টিশীলতার রুদ্ধগতির হদিশ পেতে হবে। এই বিরাট বিষয়ের সুষ্ঠু আলোচনার অবকাশ আপাতত আমাদের নেই।

যাইহোক, দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে বাংলার দেশজ শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা জরুরি বলে মনে করি। একটি সঠিক জাতীয় শিক্ষা-

নীতি রচনার প্রয়োজন, আর অন্যটি বাঙালির পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ইতিহাস রচনার তাগিদ।

আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতির ব্যর্থতা যে অনেকখানি দেশজ শিক্ষার ঐতিহ্যের প্রতি অবহেলার জন্য সেকথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের পর একাধিক শিক্ষা কমিশন তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করেছেন। এইসব প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষানীতিও রচিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ আজও সেই তিমিরে। হালে দুটো আত্যন্তিক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। একদিকে দেশজ শিক্ষার ঐতিহ্য বিষয়ে গবেষণা, অন্যদিকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের প্রতি উৎকেন্দ্রিক আগ্রহ। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি এরকম আগ্রহই কিন্তু আমাদের গতিশীল দেশজ শিক্ষার অবলুপ্তি ঘটায় অথচ সৃজনশীলতার নিরিখে আমরা আজও পশ্চিমী দেশগুলির সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারিনি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে মধ্যযুগের বাংলায় সৃজনশীলতার স্বাভাবিক স্ফুরণের সাক্ষী হয়ে আছে নব্যন্যায়, নব্যস্মৃতি আর জনগণ-আদৃত বাংলা কাব্য-সাহিত্য। আসলে একটা দেশের মানুষের মেধার স্বাভাবিক স্ফুরণের জন্য দরকার সঙ্গতিপূর্ণ গতিশীল শিক্ষা আর স্বাভাবিক প্রকাশমাধ্যম।

আর এক কথা। দেশজ শিক্ষার ঐতিহ্যকে স্বীকার করেই যদি জাতীয় শিক্ষানীতি রচনা করা সাব্যস্ত হয় তবে প্রশ্ন ওঠে, ভারতে কি এক এবং অভিন্ন দেশজ শিক্ষাধারা চালু ছিল। এবিষয়ে বোধকরি সন্দেহের অবকাশ নেই যে ভারতীয় সংস্কৃতি বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের যোগফলমাত্র। ফলে অঞ্চলভেদে দেশজ শিক্ষার বিশিষ্টতাও স্বীকৃতি দাবি করে। আর তাই দেশজ শিক্ষার আঞ্চলিক ইতিহাস আলোচনাও জরুরি হয়ে ওঠে। দেশজ শিক্ষার এই আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রতি গবেষকদের তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। অন্তত বাংলার দেশজ শিক্ষার উল্লেখযোগ্য ইতিহাস রচিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই, যদিও ভারতের দেশজ শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। আসলে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা বা সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা অপেক্ষাকৃত সহজ। সাধারণত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও শিক্ষার সঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও শিক্ষাধারা যোগ করে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাস লেখা হয়। দেশকালের বিশাল সীমায় রচিত এই ইতিহাসে উপাদানগুলির স্থান-কালের নির্দিষ্ট পরিচয়

অনেক সময় ততটা গুরুত্ব পায় না। আঞ্চলিক ইতিহাসের বেলায় কিন্তু উপাদানগুলির স্থান-কালের নির্দিষ্ট পরিচয়ের গুরুত্ব খুব বেশি। আসলে অঞ্চলবিশেষে এই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষাধারাও বিশিষ্ট হয়ে ওঠে আর তাই দেশজ শিক্ষার আঞ্চলিক ইতিহাসের উপর নির্ভর করেই ভারতের দেশজ শিক্ষার গোটা ইতিহাস রচিত হতে পারে। তাছাড়া প্রাচীন ভারতের দেশজ শিক্ষার লিখিত ইতিহাসগুলির অনেক তথ্য ও সিদ্ধান্তের নতুন করে বিচার ও মূল্যায়নও দরকার। এইসব ইতিহাস লেখাও হয়েছে ইংরেজি ভাষায়। ফলে সাধারণ মানুষের পক্ষে এগুলি পড়ে ওঠার জো নেই। সব চাইতে বড় কথা আঞ্চলিক ভাষায় দেশজ শিক্ষার আঞ্চলিক ইতিহাস আজও লেখা হল না। এই অভাব অন্তত খানিকটা মেটানোর চেষ্টায় এই বইয়ের অবতারণা।

দেশজ শিক্ষার আঞ্চলিক ইতিহাস আলোচনা করতে হলে সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমা ও মানুষের পরিচয় সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করে নেওয়া দরকার, সন্দেহ নেই। তবে তার আগে প্রাচীন ভারতের লিখিত ইতিহাস-গুলি সম্পর্কে কিছু কথা বলে নেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

দেশজ শিক্ষার ইতিহাস প্রসঙ্গে

বিশ শতকের গোড়ার দিকেই দেশজ শিক্ষার ই'িহাস সম্পর্কে আগ্রহ দেখা দেয়। এই সময়েই প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাসগুলিও লেখা হতে থাকে। নগেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'A History of Education in Ancient India' সম্ভবত প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাস বিষয়ে প্রথম প্রকাশিত বই। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। নগেন্দ্রনাথ মজুমদার ঢাকা ট্রেনিং কলেজে পড়ানোর সময় ছাত্রদের জন্য যেসব বক্তৃতা তৈরি করেছিলেন তারই ভিত্তিতে এই বই লেখেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ ডিগ্রির গবেষণাপত্র হিসাবে রচিত এফ. ই. কীর 'Ancient Indian Education' ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে বই হিসাবে প্রকাশিত হয়। এই বইটিই প্রাচীন ভারতের শিক্ষার প্রথম পূর্ণাঙ্গ এবং অনেকখানি নিরপেক্ষ ইতিহাস। এস. সি. সরকারের 'Educational Ideas and Institutions in Ancient India'

প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে। লেখক এই বইটিকে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি মূলত অথর্ববেদ ও রামায়ণের ঐতিহ্যে কী কী উপাদান পাওয়া যাচ্ছে তাই আলোচনা করেছেন। অথর্ববেদের মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা তিনি করেছেন সে সম্পর্কে সকলেই একমত নাও হতে পারেন। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার উপর বহুদিনের গবেষণার ফল সন্তোষকুমার দাসের 'The Educational System of the Hindus' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে। এই বইটিকে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাসের একটি আকরগ্রন্থ হিসাবেই ধরা যায়। প্রায় কাছাকাছি সময়ে ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় এ. এস. আলটেকারের সুলিখিত বই 'Education in Ancient India'। রাধাকুমুদ মুখার্জির তথ্যসমৃদ্ধ 'Ancient Indian Education' প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে। যদিও অনেককাল ধরেই তিনি এবিষয়ে কাজ করছিলেন। জে. এম. সেনের 'History of Elementary Education' প্রকাশিত হয় ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে। এটি অবশ্য শুধু প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাস নয়।

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে নরেন্দ্রনাথ লাহার 'Promotion of Learning in India During Muhammadan Rule' এবং 'Promotion of Learning in India by Early European Settlers' বই দুটি ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। মুসলমান অধিকারের পর আরবী-ফারসী শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষার আদিযুগের ইতিহাস বিষয়ে এই বই দুটিকেও আকর-গ্রন্থ হিসাবে গণ্য করা হয়। মুসলমান আমলের শিক্ষার আর একটি উল্লেখযোগ্য ইতিহাস এস. এম. জাফরের 'Education in Muslim India Being an Inquiry into the State of Education During Muslim Period of Indian History' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে। জাফরের বইটি বহু উপাদানই নরেন্দ্রনাথ লাহার বই থেকে নেওয়া। আসলে এবিষয়ে যাঁরাই লিখেছেন তাঁরাই নরেন্দ্রনাথ লাহার বইয়ের উপর অনেকখানি নির্ভর করেছেন। এখন অবশ্য আরো অনেক নতুন তথ্য জানা গেছে। হাল আমলে প্রকাশিত এম. এ. কুরেশীর "Muslim Education and Learning in Gujrat' বইটির মুসলমান আমলের শিক্ষার আঞ্চলিক ইতিহাস হিসাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বইগুলিও সবই কিন্তু ইংরেজিতে লেখা। বিশ শতকের গোড়া থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিক্ষার ইতিহাসচর্চার জোয়ার দেখা

যায়। অথচ দেশজ শিক্ষার আঞ্চলিক ইতিহাস নেই বললেই চলে। পরেও কিন্তু শিক্ষার আঞ্চলিক ইতিহাস লেখার বিশেষ কোন চেষ্টা হয়েছে বলে জানা যায় না।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অবশ্য তাঁর 'হিন্দুজাতি ও শিক্ষা' নামে 'ইংরেজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষার কাহিনী' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড বাংলা ভাষায় লেখেন। এই বইটি সম্ভবত ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। একই বিষয়ের উপর লেখা গোপালচন্দ্র সরকারের 'বঙ্গদেশে বর্ত্তমান শিক্ষা বিস্তার' বইটি বাংলা ১৩৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই বই দুটির বিষয় ইংরেজ আমলের শিক্ষার ইতিহাস, কাজেই আমাদের আলোচনার বাইরে। পরে এই বিষয়ে যাঁরা ইংরেজি বই লিখেছেন তাঁরা কিন্তু এই বই দুটির উল্লেখ বড় একটা করেননি। বাংলায় লেখা বলেই কি এই অবজ্ঞা! যাইহোক, ভারতীয় ভাষায় লেখা প্রাচীন ভারতের বা বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষার প্রামাণ্য ইতিহাস নেই বললেই চলে।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষার এই ইতিহাসগুলিতে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধযুগের শিক্ষার যে-ইতিহাস আমরা পাই তা ভারতের সব অঞ্চলের শিক্ষার যথাযথ চিত্র একথা বোধহয় হলফ করে বলা যায় না। আমার মনে হয় ভারতের শিক্ষার ইতিহাস রচনার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা শিক্ষার আঞ্চলিক ইতিহাসের অভাব। ভারত বলতে যে দেশ বা যে সংস্কৃতির ধারা আমরা বুঝি তা আসলে অনেক আঞ্চলিক বিশিষ্টতার যোগফলমাত্র। একথা হয়ত ঠিক যে ধর্মই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধান সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ছিল প্রাচীনকালে। সেদিক দিয়ে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষার ইতিহাস নিশ্চয়ই খানিকটা প্রতিনিধিত্বমূলক। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ভাবধারা কমবেশি ভারতের সব অঞ্চলের ভাবধারাকে প্রভাবিত করেছিল, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। আবার একথাও ঠিক যে অঞ্চল-বিশেষের দেশজ প্রথা ও ঐতিহ্য সেই অঞ্চলে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ ধর্মীয় আচারগুলিকেও অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল। বাংলায় প্রচলিত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম কতটা বৌদ্ধ ও লৌকিক ধর্মের মেশালে তৈরি তা অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়। মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনকে অনেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাবগত ঐক্যের সবচাইতে কার্যকর আন্দোলন বলে মনে করেন। মুসলমান শাসন ও সুফী ভাবধারাও হয়ত এই আন্দোলনকে অনেকটা প্রভাবিত করেছিল। তা সত্ত্বেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভক্তি আন্দোলনের মধ্যেকার

তফাতও অনেক। তাছাড়া প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাও একই রকম ছিল না। বিশেষ করে ভাষা, সাহিত্য ও ধর্মীয় আচরণে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য যেখানে যারপরনাই পরিস্ফুট সেখানে ভারতের সব অঞ্চলে পুরোপুরি একই রকম শিক্ষাধারা প্রচলিত ছিল, এরকম ভাবার কারণ দেখি না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের সংস্কৃত শিক্ষার যে ধারা বাংলায় গড়ে উঠেছিল তা উত্তর ভারতের নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাধারা থেকে অনেক আলাদা। বাংলায় বেদচর্চার অভাব বিষয়ে যে বিতর্ক তা বাংলার সংস্কৃতচর্চার স্বতন্ত্র ধারার একটি নজিরমাত্র।[৮] প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাসগুলিতে কিন্তু এই আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বড় একটা পাওয়া যায় না।

সবচাইতে বড় কথা, লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার সাধারণ শিক্ষাধারার উৎসও ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় খুঁজে পেয়েছেন বেশির ভাগ দেশজ শিক্ষার ইতিহাস-লেখক। এঁরা প্রায় সকলেই এবিষয়ে প্রাচীন উপাদানের অভাবের কথা বলেছেন। অথচ প্রাচীন ভারতেই এই ধরনের শিক্ষাধারা প্রচলিত ছিল এরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছতেও খুব একটা দ্বিধা করেননি। আসলে প্রাচীন ভারতের প্রাক্-উপনয়ন শিক্ষার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষায় লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার সাধারণ শিক্ষাধারার সম্পর্ক নির্ধারণে এঁরা অনেকেই হিন্দুজাতীয়তা-বোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলেই মনে হয়। লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার এই দেশজ শিক্ষার আঞ্চলিক ইতিহাস খুঁজে না দেখে এবিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় না বলেই আমার বিশ্বাস।

দেশজ শিক্ষার ইতিহাস রচনার সবচাইতে বড় বাধা নির্দিষ্ট উপাদানের অপ্রতুলতা। দেশজ শিক্ষার উৎস সন্ধানে আমাদের যেতে হবে সেই প্রাচীন যুগে। মূলত সংস্কৃত সাহিত্য, তাম্রশাসন, লেখমালা, মুদ্রা এইসব উপাদানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে যেসব সাক্ষ্য তারই ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে দেশজ শিক্ষার গোড়ার ইতিহাস। কাজটা খুবই কঠিন। বিশেষ করে উপাদানগুলির দেশকালের পরিচয় যেখানে সবসময় নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত নয়। তুলনামূলকভাবে মধ্যযুগের শিক্ষার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা অনেকখানি সহজ। আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্য, সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও বিদেশী ভ্রমণকারীদের বিবরণে বহু তথ্য পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট দেশকালের পরিচয়ে চিহ্নিত উপাদানের অভাব বড়

একটা হয় না। আমরা এইসব নানা উপাদানের সাহায্যে দেশজ শিক্ষার আঞ্চলিক ইতিহাস আলোচনা করব।

বঙ্গ, বাঙালি ও বাংলা ভাষা

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার দেশজ শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করতে হলে অবশ্যই আগে বাংলার ভৌগোলিক সীমা ও বাঙালির পরিচয় সম্পর্কে কিছু কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। প্রাচীন বঙ্গ বা বাংলাদেশ ও বাঙালির পরিচয় নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। এবং অবশ্যই আরো গবেষণার অবকাশ আছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়, প্রমোদলাল পাল, আবদুল করিম, আবদুর রহিম এবং আরো অনেকেই এবিষয়ে আলোচনা করেছেন। এঁদের কিছু কিছু লেখা থেকে এবিষয়ে কতটা হদিস পাওয়া যায়, তা দেখা দরকার।

হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁর 'বঙ্গ কোন্ দেশ?' প্রবন্ধে 'শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে'র সাক্ষ্যে লিখছেন, "সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডই বঙ্গ বলিয়া কথিত। এই শ্লোকে বঙ্গ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বভাগে কি পশ্চিমভাগে অবস্থিত তাহা ঠিক বুঝা গেল না।"[৯] পরে লিখছেন, "মহাভারত-রচনার যুগে বঙ্গ যে লৌহিত্যের পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল ইহা সুনিশ্চিত।"[১০] তাঁর মতে, "মহাভারত, রঘুবংশ, প্রজ্ঞাপনা এবং যশোধর-কৃত জয়মঙ্গলা' প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে মনে হয় যে "বঙ্গ" দুই অর্থে ব্যবহৃত হইত, একটি ব্যাপক, অপরটি সঙ্কীর্ণ। ব্যাপক অর্থে বঙ্গ বলিতে সময়ে সময়ে লৌহিত্যের পূর্ব্ব হইতে কপিশা (কাঁসাই) পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বুঝাইত।"[১১] তিনি আরো জানাচ্ছেন, "এই সকল উক্তির সহিত লক্ষ্মণ সেন দেবের তাম্রশাসন ও যশোধরের টীকা মিলাইয়া লইলে মনে হয় যে, বিক্রমপুর ও লৌহিত্যের পূর্ব্বতীরস্থিত ভূখণ্ডই সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত 'বঙ্গ' বা হরিকেল নামে প্রসিদ্ধ ছিল।"[১২] বোঝাই যাচ্ছে তের শতক পর্যন্ত বঙ্গের কোন একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা ছিল না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল।

মুসলমান অধিকারের পরই যে অখণ্ড বাংলাদেশ একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমায় বাঁধা পড়েছে সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে, রাজেন্দ্রচোলদেবের তিরুমলয় লিপি ও চেদিপতি কর্ণদেবের গোহর লিপিতে 'বঙ্গাল' নামক দেশের উল্লেখ থাকলেও এই নামটি কোন্ সময় সৃষ্টি হয়েছে তা বলা দুরূহ।[১৩] রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতেও, "প্রাচীন হিন্দু যুগে সমগ্র বাংলা দেশের কোন একটি বিশিষ্ট নাম ছিল না। ইহার বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল ··মুসলমান যুগেই সর্বপ্রথম এই সমুদয় দেশ একত্রে বাংলা অথবা বাঙ্গালা এই নামে পরিচিত হয়।"[১৪] এবিষয়ে সন্দেহ নেই মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচনায়ই বাংলা বা বাঙ্গালা নামের নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'তবকাত-ই-নাসিরি'তে 'বং' নামই পাওয়া যায়।[১৫] ইবন বতুতা চৌদ্দ শতকে বাংলায় আসেন। তিনি 'বাঙ্গালা' এই নাম ব্যবহার করেছেন।[১৬] পনের শতকে আসেন মাহুয়ান। চৈনিক উচ্চারণে তিনি লেখেন 'পাঙ্গকোলা' বা বাঙ্গালা। তিনি এও বলেন যে এখানকার লোকেদের ভাষা বাঙ্গলা।[১৭] আবুল ফজল লিখেছেন 'বাঙ্গালা'র আসল নাম 'বং'।[১৮] আকবরের আমলের 'সুবে বাঙ্গালা'র বড় অংশ এখনকার পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ।

বাঙালির জাতিগত পরিচয় নিয়েও অনেক বিতর্ক আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, "ঋগ্বেদে বাংলা দেশের নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় আরণ্যকে' তিনটি জাতির নাম পাওয়া যায়।···একটির নাম বঙ্গ, একটির নাম বগধ এবং আর একটির নাম চের।"[১৯] তিনি আরো জানাচ্ছেন, "কোন কোন anthropologist বলেন, বঙ্গ বা বং নামে এক দ্রাবিড় জাতি বাংলা দেশে বাস করিত।'[২০] ভাষাবিদ্ বিজয়চন্দ্র মজুমদারও মনে করেন বাঙালিরা মূলত অনার্য 'বং' জাতিগোষ্ঠী; তিনি চৈনিক সাক্ষ্যের উল্লেখ করে জানাচ্ছেন, আর্যাবর্তের বাইরে 'বংলং' দেশে 'বং জাতিগোষ্ঠী' বাস করত। তাঁর মতে, 'বংলং' থেকে বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি হয়েছে।[২১] তিনি মনে করেন প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যে উল্লিখিত 'বঙ্গ' কথা এই 'বং জাতিগোষ্ঠী'কেই নির্দেশ করে।[২২] তিনি আরো বলেন, এই 'বং' জাতির রাজারা খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতক পর্যন্ত 'বংলং' দেশে রাজত্ব করেন।[২৩] সে যাইহোক, বাঙালি যে একটি স্বতন্ত্র জাতি সে-কথা না মেনে উপায় নেই। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, "আসল কথাটা কি জান, বাঙ্গালী আর্য্যাবর্তের আর্য্যগণ হইতে একটা সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতি। বৈদিক যুগের সময় হইতে বাঙ্গালায় এক স্বতন্ত্র সভ্যতা ও মনুষ্য সমাজ বিদ্যমান ছিল···

বাঙ্গালায় বৈদিক ধর্ম, সভ্যতা, আচার ব্যবহার, কিছুই শিকড় গাড়িয়া বসিতে পারে নাই। যুগে যুগে, বারে বারে পশ্চিম দেশ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি আমদানি করিয়াও বাঙ্গালায় যাগযজ্ঞাদির তেমন প্রচলন হয় নাই।'[২৪] বাঙালির আর্যামি দেখে তাই তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, 'আমরা বাঙ্গালী হইয়াও বাঙ্গালার শ্লাঘায় আর শ্লাঘাবোধ করি না।'[২৫] রমেশচন্দ্র মজুমদারও লিখছেন, 'বাংলার আদিম অধিবাসীগণ আর্যজাতির বংশসম্ভূত নহেন।'[২৬] পরবর্তীকালে অবশ্যই তথাকথিত আর্য বা আর্যাবর্তের লোকের সঙ্গে মিলনে বাংলার আদি অধিবাসীদের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। কিন্তু তাই বলে বাঙালি তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়েছিল একথা বলা যায় না।

বাংলা ভাষাও যে একটি স্বতন্ত্র ভাষা এবং এই ভাষা যে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার সন্তান নয় একথা আজ আর অজানা নেই। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, হেমন্তকুমার সরকার প্রভৃতি যাঁরা বাংলাকে মূলত আর্যগোষ্ঠীর ভাষা বলেই চিহ্নিত করেছেন তাঁরাও একথা মানেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙালি জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে বলেন, 'বাঙলার অধিবাসীদের মূল উৎপত্তি যে ভিন্ন জাতি থেকেই হোক্‌, যতটুকু খবর আমাদের জানা গিয়েছে তা' থেকে তারা (উত্তর-ভারত থেকে আর্য ভাষা আগমনের পূর্বে) অনার্য্য-ভাষী ছিল বলেই অনুমান হয়।'[২৭] তাঁর মতে এই অনার্যভাষী লোকের মুখে বৈদিক কথিত ভাষা যে পরিবর্তিত রূপ নেয় তাই আধুনিক বাংলা।[২৮] এ সম্পর্কে অবশ্য বিতর্কের অবকাশ আছে। কারো কারো মতে প্রাচ্যভারতে যে আর্যভাষা বিস্তারলাভ করেছিল তা অবৈদিক আর্যভাষা।[২৯] হেমন্তকুমার সরকার ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলাকে আর্যগোষ্ঠীর ভাষা হিসাবে স্বীকার করলেও দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার কথাও বেশ জোর দিয়েই বলেছেন। হেমন্তকুমার সরকার বলেন, 'আমরা আর্যভাষা বলি কিন্তু ঠিক প্রাচীন আর্য ধরনে ভাবি না, আমরা ভাবি দ্রাবিড় ভাবে।'[৩০]

প্রত্নতত্ত্ববারিধি সতীশচন্দ্র ঘোষ বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি হর্নলি ও কল্ডওয়েলের মতবাদ স্বীকার করেন না। তিনি লিখছেন, '...কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ডাক্তার হর্নলি বিজেতা নর্ম্মানগণ ইংলণ্ডে, আরব ও তুর্কীরা আর্য্যাবর্তে এবং ফরাসীরা গলে বিজিতদিগের ভাষাগ্রহণের তথ্য স্বীকার করিয়াও নিজেদের কথা স্মরণ করিয়া আর্য্যগণের পক্ষে বিজিত অনার্য্যদিগের ভাষাগ্রহণের কথা বিশ্বাস করেন নাই। পক্ষান্তরে ডাক্তার

কল্ডওয়েল যে আর্য্যগণের আর্য্যাবর্ত্ত জয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনার্য্য ভাষা সমুদয় সংস্কৃত শব্দৈশ্বর্য্য দ্বারা সমলঙ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহাও মানিয়া লইতে সম্মত নহি।'[৩১] তাঁর মতে প্রাকৃত সংস্কৃতজাত ভাষা নয়। এবিষয়ে তিনি লিখছেন, 'তাই আমরা প্রাকৃত কথাটিকে প্রকৃতিপুঞ্জের সাধারণ (common) ভাষা বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতেছি···এস্থলে ইহাও বলা বাহুল্য যে 'যোজনান্তর ভাষা' বলিয়া এই ভারতবর্ষেই আর্য্যগণের আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতে বহুসংখ্যক প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার ছিল, বর্ত্তমানেও ৪৭টির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই সকল বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষা আবার বিভিন্ন অভিধায় অভিহিত ছিল, যেমন—বাঙ্গালা, উড়িয়া, মাগধী, পাঞ্জাবী ইত্যাদি।'[৩২]

আমরা এই বিতর্কের গভীরে প্রবেশ না করেও নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি যে বাঙালি ও বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য সকলেই স্বীকার করেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবিষয়ে লিখছেন, '···আর যে ধর্মভাব পরবর্তী যুগে সহজিয়া, বাউল, বৌদ্ধ, শাক্ত আর বৈষ্ণব, আর মুসলমান-সুফী মতকে অবলম্বন করে এমন সুন্দর দর্শন আর সাহিত্য সৃষ্টি করেছিল, আর যে কুশাগ্র বুদ্ধিদ্বারা নব্য-ন্যায়ের মত দর্শনের চরম বিকাশ বাঙলা দেশের মাটীতেই সম্ভব হয়েছিল, তারও মূল যে এই আদি অনার্য্য বাঙালীর মধ্যেই ছিল, এটা অনুমান করা অন্যায় হবে না।'[৩৩] তাঁর মতে, 'খৃষ্টীয় সপ্তম শতক নাগাদ বাঙালী জাতীয়ত্বের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা' হয় এবং 'মাগধী প্রাকৃতকে অবলম্বন করে বাঙলা ভাষার বুনিয়াদ' স্থাপিত হয়।[৩৪] তিনি অনুমান করেন পালরাজাদের আমলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পত্তন হয়।[৩৫] তবে এখনও পর্যন্ত যেসব সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় চৌদ্দ-পনের শতক নাগাদই বাংলা সাহিত্য পরিণত রূপ নিয়েছিল।

যাইহোক, বাংলার দেশজ শিক্ষা বলতে আমি বাংলাভাষী লোকের প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিক্ষার কথাই বলছি। তবে এত কথা বলার কারণ বাংলাদেশ ও বাঙালির স্বাতন্ত্র্যের প্রতি পাঠকের নজর কাড়া। কেননা এই স্বাতন্ত্র্যের তাগিদেই বাংলায় দেশজ শিক্ষার ইতিহাসের আলোচনার এই প্রয়াস। এই দেশজ শিক্ষাধারা, বিশেষ করে বাংলা লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার পাঠশালা শিক্ষা, কবে কিভাবে গড়ে উঠল অর্থাৎ এর উৎস কী? কখন কোন্ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় কিভাবে এই শিক্ষাধারা বিকাশলাভ করল? এ শিক্ষায় সমাজের কোন্ শ্রেণীর মানুষ অংশ নিত? কেন নিত? এই শিক্ষার

আনুষ্ঠানিক রূপ কী ছিল? এইসব অতি জরুরি প্রশ্নগুলি সামনে রেখেই আমরা আমাদের শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করব।

আমরা আমাদের আলোচনাকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। প্রথম ভাগে সকলের দেশজ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাঠশালা ও মখতব আর বিশেষ শ্রেণীর ফারসি শিক্ষাধারার আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় ভাগে আমরা মূলত টোল-চতুষ্পাঠী ও মাদ্রাসার দেশজ উচ্চ শিক্ষার আলোচনা করেছি। বোঝার সুবিধার জন্য পাঠশালা ও মখতবের শিক্ষাধারাকে দেশজ প্রাথমিক শিক্ষা নামেও অভিহিত করা হয়েছে। তবে পশ্চিমী গোটা শিক্ষা-ধারার প্রাথমিক স্তর হিসাবে পরিচিত ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গে এগুলিকে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। মনে রাখতে হবে পাঠশালা, মখতব বা ফারসি স্কুলের সঙ্গে দেশজ উচ্চ শিক্ষার টোল বা মাদ্রাসার কোন নির্দিষ্ট সম্পর্ক ছিল না। এগুলি দেশজ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। তবে পাঠশালাতেও পশ্চিমী 'থ্রি আর' স্কুলের মতই লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখানো হত।

যাইহোক, প্রথম খণ্ডে 'গোড়ায় কিছু কথা'র পর আমরা লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার দেশজ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উৎসসন্ধানে প্রাচীন ভারতের প্রাক্-উপনয়ন শিক্ষা ও বৌদ্ধ শিক্ষাধারার আলোচনা করেছি। ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ শিক্ষাধারায় লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার দেশজ শিক্ষার উৎস খোঁজাই এ অধ্যায়ে আমাদের উদ্দেশ্য। এবিষয়ে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাসগুলিতে যেসব উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে আমরা সেগুলিকে আবার পরীক্ষা করেছি। কিছু আরো অন্য উপাদানও ব্যবহার করেছি। আমাদের আলোচনার পদ্ধতিও আলাদা। প্রত্যক্ষ উপাদানগুলির সঠিক মূল্যায়নের জন্য পরোক্ষ যেমন বিদ্যারম্ভ বা হাতেখড়ি সংস্কারের ইতিহাসের সাহায্যও নিয়েছি।

পরের অধ্যায়ে দেশজ বাংলা পাঠশালার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করেছি। প্রধানত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিউতি খুঁজে আমরা এবিষয়ে সাক্ষ্যপ্রমাণ যোগাড় করেছি। বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ, বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি নথি, সমকালীন ঐতিহাসিকদের লেখা, স্মৃতিশাস্ত্র, মুদ্রা, তাম্রশাসন এইসব নানা উপাদান কাজে লাগিয়েছি। প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক সীমা বা বাংলাভাষী লোকের সামাজিক ইতিহাসের উপাদান বিরল হলেও মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালি সম্পর্কে উপাদানের অভাব বড় একটা

নেই। এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচনা তাই বলতে গেলে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই করা সম্ভব হয়েছে। এই অধ্যায়ই আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

তারপর আমরা ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মখতবের কথা আলোচনা করেছি। মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মখতবের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ এবং মুসলমান শাসনাধিকারে বাংলায় মখতব শিক্ষার ধারা আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়। বাংলার মখতব সম্পর্কে আবদুল করিম ও আবদুর রহিম এবং আরো কেউ কেউ কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। আমরা এঁদের লেখা থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তার প্রসঙ্গ টেনে আরো অন্যান্য উপাদানের ভিত্তিতে আমাদের আলোচনা গড়ে তুলেছি। বিশেষ করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে, বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি নথিতে এবং কিছু আত্মজীবনীতে এ বিষয়ে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তার বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে মাদ্রাসা সম্পর্কে তথ্যের বিশেষ অভাব না থাকলেও মখতব সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য উপাদানের বড় অভাব দেখা যায়। এবিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয়নি বলেই মনে হয়। মধ্যযুগের বাংলা প্রাথমিক শিক্ষায় মখতবের ভূমিকা এবং মখতব ও পাঠশালার সম্পর্ক, এইসব নানা প্রশ্নের জবাব খুঁজে আমরা মখতবের ভূমিকার মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছি। এইসঙ্গে দেশজ শিক্ষার তৃতীয় একটি ধারা ফারসি স্কুল সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ের শেষে বাংলার দেশজ শিক্ষার তিনটি ধারা পাঠশালা, মখতব ও ফারসি স্কুলের একটি তুলনামূলক মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে আমরা বাংলার টোল ও চতুষ্পাঠীর সংস্কৃত শিক্ষার বিশেষ ধারা বা স্বতন্ত্র ধারার আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি। টোল-চতুষ্পাঠীর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ, শিক্ষার বিষয়সূচির বিশেষত্ব এবং পড়ুয়াদের সামাজিক অবস্থানই আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয়। বাংলার সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার সঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের সম্পর্ক বিষয়েও কিছু আলোচনার ইচ্ছা রাখি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলার মাদ্রাসা শিক্ষা আমাদের আলোচনার বিষয়। নরেন্দ্রনাথ লাহাই সম্ভবত প্রথম ভারতের মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাস লেখেন। তিনি বাংলার মাদ্রাসা সম্পর্কেও একটি অধ্যায় লিখেছেন। এস. এম. জাফর, আবদুল করিম, আবদুর রহিমের লেখায়ও এ বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়।

এঁরা সকলেই আবার আবু উমর মিনহাজের তবকত-ই-নাসিরি ও ফেরিস্তার ইতিহাসের সাক্ষ্যের উপর অনেকটাই নির্ভর করেছেন। হালে আবদুল কাদির ও আরো কেউ কেউ প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের সাহায্যে কিছু নতুন কথা জানিয়েছেন। আমরাও প্রধানত এঁদের লেখার উপর ভিত্তি করেই আমাদের আলোচনা করব। সেইসঙ্গে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও অন্যান্য কিছু উপাদানও ব্যবহার করব।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলার দেশজ শিক্ষার একটা সামগ্রিক চিত্র এবং কিভাবে এই শিক্ষাধারা শুকিয়ে গেল সেবিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল। সেই সঙ্গে এই দেশজ শিক্ষার ইতিহাস আমাদের কী শিক্ষা দেয় সেপ্রসঙ্গে দু-এক কথা বলার ইচ্ছা রাখি।

এই দুই খণ্ডের বিভিন্ন অধ্যায়ে বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের দেশজ শিক্ষার একটা গোটা ছবি মিলবে বলেই আশা করি। তবে একথা ঠিক যে বাংলা লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার সাধারণ দেশজ শিক্ষাধারার আলোচনার উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

দেশজ শিক্ষার উৎস সন্ধানে

আলোচনার বিষয়

প্রাচীনকালে ভারতে পৈতে বা উপনয়নের আগে কী ধরনের শিক্ষাধারা প্রচলিত ছিল তাই আমাদের আলোচনার বিষয়। ধরন বলতে শিক্ষার বিষয়, ব্যাপকতা ও বৈশিষ্ট্য সবই বোঝাচ্ছে। আসলে শিক্ষার বিষয় ও বিষয়গত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা অনেকটা সহজ, কেননা কম হলেও এ বিষয়ে নির্ভর-যোগ্য সাক্ষ্য হয়ত কিছু পাওয়া যেতেও পারে। কিন্তু প্রাক্-উপনয়ন শিক্ষার কোনো প্রথাবদ্ধ ধারা চালু ছিল কিনা, এ শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ কী ছিল, এ শিক্ষার প্রচলন কতটা ব্যাপক ছিল বা সমাজের বিভিন্ন স্তরের বা বর্ণের মানুষের মধ্যে এ শিক্ষার ধারা কতটা প্রচলিত ছিল সে সম্পর্কে সাক্ষ্যের বড় অভাব। প্রাচীন উপাদানগুলি এ বিষয়ে আমাদের খুব একটা সাহায্য করে না। এই অল্প উপাদানের ভিত্তিতেই অবশ্য অনেক ঐতিহাসিক এ বিষয়ে বেশ বড় বড় সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

প্রধানত স্মৃতি, পুরাণ, জাতকের গল্প, সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য, পালি সাহিত্য, শিলালেখ ও পর্যটকদের বিবরণ থেকেই এ বিষয়ে তথ্য যোগাড় করা হয়। প্রাচীন যুগের শিক্ষার ইতিহাস যাঁরা লিখেছেন তাঁরা এইসব উপাদানের ভিত্তিতেই সে যুগেও লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার প্রাক্-উপনয়ন প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ প্রচলন ছিল একথা নানাভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।[১] এঁরা যে সব প্রমাণ হাজির করেছেন, তা থেকে নিশ্চিত করে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না বলেই আমার মনে হয়। প্রচলিত শিক্ষার ইতিহাসগুলিতে যে সব সাক্ষ্য হাজির করা হয়েছে তা থেকে শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে যে প্রাচীনকালেও এক ধরনের প্রাক্-উপনয়ন শিক্ষার প্রচলন ছিল, যদিও খুবই সীমাবদ্ধভাবে। মধ্যযুগের বাংলা পাঠশালার মতো কোন প্রথাবদ্ধ প্রাথমিক শিক্ষাধারা প্রাচীনকালেও প্রচলিত ছিল কিনা বা প্রাচীন ভারতে প্রচলিত কোন শিক্ষাধারা থেকেই মধ্যযুগের পাঠশালাশিক্ষার উৎপত্তি কিনা এইসব ঐতিহাসিক প্রশ্নের উত্তর প্রাচীন উপাদানগুলিতে বড় একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে শিক্ষার বিষয় সম্পর্কে কিছু তথ্য অবশ্যই পাওয়া যায়। শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক রূপের কথা পাই একমাত্র

গৌতম বুদ্ধের জীবনী ললিত-বিস্তরে। ললিত-বিস্তরে লিপিশালার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাকে পাঠশালার সঙ্গে এক পর্যায়ে ফেলা যায় না। আসলে এ বিষয়ে কাঠামোগত সবিস্তার বিবরণের (structural details) বড় অভাব। যাই হোক, আমরা প্রধান প্রধান সাক্ষ্যগুলি সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর আলোচনার চেষ্টা করব।

আলোচনার পদ্ধতি

প্রাক্-উপনয়ন শিক্ষার প্রচলন কতটা ব্যাপক ছিল তা প্রধানত দু'ভাবে আন্দাজ করা যায়। শিক্ষার বিষয়গুলি কোন্ বর্ণের, শ্রেণীর বা পেশার লোকের প্রয়োজনীয় ছিল তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে কারা এই শিক্ষা নিত। আর প্রাক্-উপনয়ন শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত আচরণীয় সংস্কারের ইতিহাস থেকেও এর প্রচলন সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে। একটা সংস্কার সাধারণত তখনই চালু হয় যখন তার একটা সামাজিক ভিত্তি থাকে। প্রাচীনকালে বেদবাদী ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সমাজ ছিল সংস্কারে বাঁধা। প্রতিটি বহুলপ্রচলিত অনুষ্ঠান আচরণীয় সংস্কারে বেঁধে দেওয়া হত। কাজেই আশা করা যায়, প্রাক্-উপনয়ন শিক্ষা যখন বহুলপ্রচলিত হল তখন সে সম্পর্কে কোন সংস্কারও চালু হয়েছিল। আবার একটু ঘুরিয়ে বলা যায়, সংস্কারে বাঁধা সমাজে প্রাক্-উপনয়ন শিক্ষা বিষয়ে কোন সংস্কারের অভাব ঐ শিক্ষার অপ্রচলন বা সীমিত প্রচলনই সূচিত করে, যদি না এর বিরুদ্ধে আর কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন উপাদানগুলিতে পাওয়া তথ্য, সংস্কারের ইতিহাসের পটভূমিতে যাচাই করে নিলে হয়ত আমরা সঠিক সিদ্ধান্তের কাছাকাছি পৌছতে পারব। অবশ্য বেদবাদী জনগোষ্ঠীর বাইরে এ শিক্ষাধারা কতটা প্রচলিত ছিল সে সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসার কোন উপায় নেই বললেই চলে।

স্মৃতি, পুরাণ ও বিদ্যারম্ভ-সংস্কার

স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন পালনীয় সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রে জাতকের পালনীয় সংস্কারের যে বিবরণ পাই তাতে এক বা তিন বছর বয়সে চূড়াকরণ বা ক্ষুর ছোঁয়ানোর কথা বলা আছে।[২] তারপরই উপনয়নের কথা। প্রাক্-উপনয়ন শিক্ষা সম্পর্কে কোন সংস্কারের উল্লেখ সেখানে

দেখা যায় না। বিদ্যারম্ভ বা হাতেখড়ির মতো কোন প্রাক্-উপনয়ন সংস্কারের উল্লেখ প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে বা প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে কোথাও নেই। তাহলে এই সংস্কারগুলি কখন চালু হল, কেন চালু হল তারও খোঁজ নেওয়া দরকার। বিদ্যারম্ভ বা হাতেখড়ি সংস্কার যখন চালু হল, ধরে নেওয়া যায় তখন প্রাক্-উপনয়ন শিক্ষারও বহুল প্রচলন হয়েছিল। তা নাহলে এই সংস্কারের কোন প্রয়োজন হত না। আসলে প্রাচীন স্মৃতি, শাস্ত্র বা সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে পাঠশালার বা হাতেখড়ির মতো কোন সংস্কারের উল্লেখ না পাওয়া গেলেও পরবর্তী স্মৃতি এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ও ভ্রমণবিবরণে হাতেখড়ি ও পাঠশালার বিস্তর উল্লেখ দেখা যায়। প্রাসঙ্গিক অন্যান্য সাক্ষ্য ও অবস্থার বিচারে এর থেকে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় কিনা তাও আমাদের চেষ্টা করে দেখতে হবে।

আগেই বলা হয়েছে প্রাচীন স্মৃতিতে বা ধর্মশাস্ত্রে বিদ্যারম্ভ বা হাতেখড়ির মতো কোন সংস্কারের উল্লেখ নেই। এই অনুল্লেখ সম্পর্কে পি. ভি. কানে তাঁর ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসে লিখছেন, "কিছু সংস্কার যেমন কর্ণবেধ বা বিদ্যারম্ভ অদ্ভুতভাবে অনুপস্থিত গৃহ্যসূত্রগুলিতে, যদিও পরবর্তী স্মৃতি ও পুরাণে এদের উল্লেখ আছে।"[৩] তিনি আরও বলেন যে অপরার্ক 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বিদ্যারম্ভ সংস্কারের উল্লেখ করেছেন। আর এর উল্লেখ আছে 'স্মৃতি-চন্দ্রিকা'য়। কানে নিজে 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে' এই সংস্কারের উল্লেখ দেখেছেন তা কিন্তু বলেননি। কানে 'কৌটিল্য', 'রঘুবংশ' ও 'উত্তর রামচরিতের' উল্লেখ করে বলেছেন, এগুলিও এ বিষয়ে সামান্য কিছু আলোকপাত করে। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাস লেখকরাও এগুলিকে সাক্ষ্য হিসাবে হাজির করেছেন। কানে অবশ্য মনে করেন যে গোড়ার দিকের খ্রীষ্টীয় শতাব্দীগুলিতেই বিদ্যারম্ভ সংস্কার পালিত হত।[৪] এখন গোড়ার দিকে (early centuries) বলতে একশ থেকে বারশ সবই হতে পারে। আসলে গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও সংহিতাগুলিকেই প্রাচীন স্মৃতি বলে আর নিবন্ধগুলিকে পরবর্তী স্মৃতি বলা হয়। সাধারণত বার শতকের পরেই পরবর্তী স্মৃতি বা নব্যস্মৃতির কাল ধরা হয়। বাংলায় শূলপাণিকে নব্যস্মৃতির প্রবর্তক ধরলে বলতে হয় বাংলায় নব্যস্মৃতির শুরু পনের শতকে মুসলমান অধিকারের পর। আর ভবদেব ভট্ট বা জীমূতবাহনকে বাংলার প্রথম পরবর্তী স্মৃতিকার হিসাবে ধরলে পরবর্তী স্মৃতির শুরু বলতে হয় এগার বা বার শতকে।[৫] অবশ্য ভবদেব ভট্ট বা

জীমূতবাহনের কাল সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। আর অপরার্ক বা অপরাদিত্য যে বার শতকের আগের লোক এমন কথাও জানা যায় না। কানের মতে অপরার্ক ১১১৫ থেকে ১১৩০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে জন্মেছিলেন।[৬]

সে যাইহোক, পরবর্তী স্মৃতি যা বার শতকে বা পরে রচিত হয়েছিল তাতে বিদ্যারম্ভ-সংস্কারের উল্লেখ দেখা যায়। অপরার্কের যাজ্ঞবল্কীয় ধর্মশাস্ত্র নিবন্ধের কথা আগেই বলা হয়েছে। অপরার্কের আগে কোন ধর্মশাস্ত্রকার বা নিবন্ধকার এই সংস্কারের উল্লেখ করেছেন বলে জানা যায় না। স্মার্ত রঘুনন্দন তাঁর 'জ্যোতিস্তত্ত্বম্'-এ বিষ্ণুধর্মোত্তরের সাক্ষ্যে বিদ্যারম্ভ-সংস্কারের কথা বলেছেন।[৭] 'স্মৃতিচন্দ্রিকা' আর 'সংস্কার রত্নমালা'য় মার্কণ্ডেয়র উল্লেখ করে বিদ্যারম্ভ-সংস্কার বিষয়ে বলা হয়েছে।[৮] অপরার্কও মার্কণ্ডেয়কে সাক্ষী মেনেছেন। লক্ষ করার বিষয়, পরবর্তী স্মৃতিকারেরা বিদ্যারম্ভ সংস্কার প্রসঙ্গে সংহিতা বা গৃহ্যসূত্রের উল্লেখ না করে পুরাণ থেকে প্রমাণ হাজির করেছেন।

এখন পুরাণে স্মৃতি বিষয়গুলি পরবর্তী যোগ। পুরাণের মূল বিষয় পাঁচটি: সেগুলি হচ্ছে: সর্গ, প্রতিসর্গ, দেবতাদের বংশাবলী, মন্বন্তর ও রাজবংশচরিত।[৯] আর. সি. হাজরার মতে হিন্দু আচার ও সংস্কারগুলি পুরাণে যোগ হতে আরম্ভ হয়েছে চতুর্থ শতাব্দী থেকে। এগার শতকের আগে থেকেই বিভিন্ন স্মৃতি এবং অন্য পুরাণের বিষয় আর এক পুরাণে জায়গা নিতে শুরু করেছে।[১০] এই যোগবিয়োগ এমনকি তের-চোদ্দ শতকেও ঘটেছে। হাজরা এবং পারজিটার দুজনেই অবশ্য মনে করেন যে, নবম শতাব্দী নাগাদই পুরাণগুলি বর্তমান রূপ নিয়ে নিয়েছে।[১১] কিন্তু সমস্যা হলো, ধর্মশাস্ত্রে নেই এমন সংস্কারগুলি কখন কীভাবে পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হলো সেবিষয়ে কোন ধারণা করা যাচ্ছে না। যদি ধরে নেওয়া যায় সমাজে প্রচলিত প্রথা বা সংস্কারগুলি পরে পরে পুরাণে যুক্ত হচ্ছিল তাহলে এগার শতকের পরে বা সমসময়ে প্রচলিত সংস্কারগুলিরও পুরাণে জায়গা পেতে কোন অসুবিধা দেখি না। হাজরার মতে বায়ুপুরাণে গয়ামাহাত্ম্য চোদ্দ শতাব্দীর আগে যোগ করা হয়েছে।[১২] আসলে বার শতকের আগে কপি-করা কোনো পুরাণের পুঁথিতে বিদ্যারম্ভ-সংস্কারের উল্লেখ না পাওয়া পর্যন্ত এ-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণের সব ছাপা সংস্করণেও বিদ্যারম্ভ-সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। হাজরা লিখছেন, 'কিন্তু বেশির ভাগ পুরাণই তাদের প্রথম দিককার পরিবর্তিত রূপে আমরা পাই না, কারণ সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে এগুলি নতুন করে সম্পাদিত হত

নিজেদের প্রামাণিকতা বজায় রাখার তাগিদে।[১৩] পারজিটারও মনে করেন ছয় শতকের আগেই পুরাণগুলি রচিত হলেও পরে পরে নতুন সংযোজনের বা পরিবর্তনের সম্ভাবনা থেকেই গেছে।

সবচাইতে বড় কথা, গৃহ্যসূত্রে, ধর্মসূত্রে বা সংহিতায় প্রাক্-উপনয়ন শিক্ষা-সম্পর্কীয় কোন সংস্কারের উল্লেখ নেই। সেকালে ব্রাহ্মণদের উপনয়নের পর ত্রয়ী বিদ্যা বা তিন বেদ পাঠ করতে হত যজ্ঞরক্ষক হিসাবে।[১৪] উপনয়নের আগের যে সংস্কার তার নাম চৌলকর্ম বা চূড়াকরণ। মনু তিন বছর বয়সে চূড়াকরণের কথা বলেছেন। রঘুনন্দন প্রভৃতি পরবর্তী নিবন্ধকাররাও তিন বছর বয়সে চূড়াকরণের কথা বলেছেন।[১৫] গৃহ্যসূত্রগুলিতেও তাই বলা আছে। শাঙ্খ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে এক বা তিন বছরে চূড়াকরণের কথা আছে। আরো কেউ কেউ এক বা তিন বছরের কথা বলেছেন।[১৬] যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় বলা হয়েছে, 'কুলাচার অনুসারে কাহারও এক বৎসরে, কাহারও তিন বৎসরে এই দুই মুখ্য-কালে বা পাঁচ বৎসরে প্রভৃতি গৌণকালে চূড়াকরণ হইয়া থাকে।[১৭] উনিশটি সংহিতায় বিভিন্ন সংস্কারের যে তালিকা পাওয়া যায় তাতে চূড়াকরণের পর উপনয়নের উল্লেখ আছে, কিন্তু বিদ্যারম্ভের কোন উল্লেখ নেই। গৃহ্যসূত্রে চূড়াকরণকে প্রথম ক্ষুর ছোঁয়ানো সংস্কার হিসাবেই বর্ণনা করা হয়েছে।[১৮] এর সঙ্গে বিদ্যারম্ভের কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্যাস সংহিতায় কর্ণবেধ সংস্কারের উল্লেখ আছে, কিন্তু বিদ্যারম্ভের উল্লেখ নেই।[১৯]

প্রাচীন স্মৃতিতে চূড়াকরণের পর উপনয়নের কথা বলা হয়েছে। উপনয়নের পরই বিদ্যারম্ভ হত। ব্রাহ্মণের উপনয়ন বা পৈতা সাধারণত আট বছর বয়সে হয়ে থাকে। বিশেষ ক্ষেত্রে পাঁচ বছর বয়সেও এই সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়। রঘুনন্দনের মতে ব্রাহ্মণের উপনয়ন হবে সাধারণত আট বছর বয়সে, কিন্তু 'ব্রহ্ম তেজস্কামী ব্রাহ্মণের পঞ্চমবর্ষে উপনয়ন করা উচিত।'[২০] মনুতেও বিশেষ ক্ষেত্রে পাঁচ বছরে ব্রাহ্মণের উপনয়নের বিধি আছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়নের বয়স যথাক্রমে এগার ও বার। বিশেষ ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ের ছয় বছরে আর বৈশ্যের আট বছরে উপনয়নের বিধিও আছে।[২১] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মেয়েদের চূড়াকরণের বিধি থাকলেও উপনয়ন-সংস্কার হত না। শূদ্রেরও উপনয়ন হত না।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র

তিন বছর বয়সে চূড়াকরণের সঙ্গে লেখাপড়ার কোন সম্পর্ক ধর্মশাস্ত্রে খুঁজে না পাওয়া গেলেও কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' বা আরো অনেক সাহিত্যে রাজপুত্র বা ক্ষত্রিয়ের লেখাপড়া বা বেদ ছাড়া অন্য বিদ্যা শেখার শুরু বলা হয়েছে চূড়াকরণের পর। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আছে, "চৌলকর্ম (মুণ্ডনসংস্কার) সম্পাদিত হইলে (রাজা বা পুত্র) লিপি (অক্ষর লেখা) ও সংখ্যান (অঙ্কগণনা) নিয়মপূর্বক অভ্যাস করিবেন। উপনয়ন (বা গায়ত্রীর উপদেশ) প্রাপ্ত হওয়ার পর (তিনি) ত্রয়ী ও আন্বীক্ষিকী বিদ্যা শিষ্টগণ (অর্থাৎ তৎতদ্বিদ্যাভিজ্ঞ আচার্যগণ) হইতে, বার্তা বিদ্যা (সীতাধ্যক্ষাদি) বড় বড় অধ্যক্ষগণ হইতে এবং দণ্ডনীতি প্রবচনকুশল ও প্রয়োগকুশল নীতিবিৎ আচার্যগণ হইতে নিয়মপূর্বক শিক্ষা করিবেন।"[২২] দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও মনুস্মৃতি প্রায় সমসময়ে বর্তমান আকারে সংকলিত হয়েছে। তাঁর মতে, অর্থশাস্ত্র খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী নাগাদ বর্তমান আকারে সংকলিত হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সরকারের এই মত মেনে নিলে, অর্থশাস্ত্রে প্রাক্-উপনয়ন শিক্ষার উল্লেখ আর মনুসংহিতায় প্রাক্-উপনয়ন কোন শিক্ষা-সংস্কারের অনুল্লেখ, সেই আমলে প্রাক্-উপনয়ন শিক্ষার সীমিত প্রচলনই সূচিত করে। যাইহোক, দেখা যাচ্ছে কৌটিল্যের সময়ে রাজপুত্ররা অল্প বয়সেই উপনয়নের আগে লিখতে আর অঙ্ক করতে শিখত। 'রঘুবংশ', 'উত্তররামচরিত' বা 'দশকুমারচরিতে' রাজপুত্রদের শিক্ষার যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে অর্থশাস্ত্রের বর্ণনার কিছু মিল থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ অমিলও দেখা যায়। বিশেষ করে রাজপুত্রদের অঙ্ক শেখার কথা বড় একটা দেখা যায় না। 'সংখ্যান' কথাটি অর্থশাস্ত্রে কবে থেকে পাওয়া যাচ্ছে তা জানার কোন উপায় দেখি না।

রঘুবংশ

কালিদাসের রঘুবংশে তৃতীয় সর্গের আঠাশ সংখ্যক শ্লোকে চূড়াকরণের পর রঘু সমবয়সী মন্ত্রীপুত্রদের সঙ্গে লিপিশিক্ষা করেন, এরকম বলা হয়েছে। টীকাকার মল্লিনাথ তাঁর টীকায় 'প্রাপ্তে তু পঞ্চমে বর্ষে বিদ্যারম্ভং চ কারয়েত্' এই বিখ্যাত বাক্যটি লেখেন। কালিদাস কিন্তু পাঁচ বছর বয়সে বিদ্যারম্ভের কথা কিছু বলেননি। বলা হয়েছে চূড়াকরণের পর রঘু লিপিশিক্ষা করেন। আর

উপনয়নের পর চার বেদ ও অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। কালিদাসের বর্ণনার সঙ্গে এ বিষয়ে কৌটিল্যের বর্ণনার মিল দেখা যায়। টীকাকার মল্লিনাথ অনেক পরের লোক। তাঁর কথায় বোঝা যায়, পরবর্তীকালে পাঁচ বছর বয়সে বিদ্যারম্ভ-সংস্কারের পর লেখাপড়া হত।[২৩] রঘু অঙ্ক শিখেছিল এমন কোন উল্লেখ নেই।

দশকুমারচরিত

'দশকুমারচরিতে'র প্রথম উচ্ছ্বাসে দণ্ডি কুমারদের শিক্ষার যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় 'চৌলউপনয়নাদি' সংস্কারের পর তাদের শিক্ষা শুরু হয়েছিল। উপনয়নের পরই কুমারেরা সকল লিপিজ্ঞান, সকল দেশের ভাষা শিখে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, বেদ, মীমাংসা, কাব্য, নাটক, ইতিহাস, পুরাণ, রাজনীতি এমনকি চুরিবিদ্যা ও জুয়াখেলায় দক্ষতা অর্জন করেছিল। চুরিবিদ্যা বা জুয়াখেলা বাদ দিলে অন্যান্য বিদ্যা রঘুও শিখেছিল।[২৪] তবে রঘু লিপিশিক্ষা করেছিল চূড়াকরণের পর উপনয়নের আগে। দশকুমার চরিতে যাবতীয় বিদ্যার উল্লেখ থাকলেও অঙ্কের কথা নেই।

উত্তররামচরিত

আর একটি উদাহরণ যা প্রমাণ হিসাবে হাজির করা হয় তা হল ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে' লবকুশের শিক্ষার বিবরণ। 'উত্তররামচরিতের' দ্বিতীয় অঙ্কে আত্রেয়ী লবকুশের শিক্ষা সম্পর্কে বলছেন যে, চৌলকর্ম বা চূড়াকরণের পর 'ত্রয়ীবর্জম' অর্থাৎ তিন বেদ বাদে, ইতরা বা তিস্রো বিদ্যা অর্থাৎ 'অক্ষরাভ্যাস' 'খুরলীবিহার' ও 'বাহনায়ুধ' সাবধানে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। 'খুরলীবিহার' হচ্ছে অস্ত্রবিদ্যা আর 'বাহনায়ুধ' হচ্ছে রথচালনা বিদ্যা। এগুলি সবই ক্ষত্রিয়ের শেখার বিষয়। তারপর এগার বছর বয়সে ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুযায়ী তাদের পৈতে দিয়ে তিন বেদ শিক্ষা দেওয়া হয়।[২৫] 'উত্তররামচরিতে'র এই শ্লোকটির আর একটি পাঠও দেখা যায়। তাতে 'ত্রয়ীবর্জমইতরা বিদ্যাঃ সাবধানেন পরিনিষ্ঠাপিতাঃ'[২৬] অর্থাৎ তিন বেদ বাদে ইতরা বিদ্যা শিক্ষার কথা আছে। এখন ইতরা বিদ্যার টীকা নানাজনে নানারকম করেছেন। কোন কোন মতে ইতরা বিদ্যা বলতে 'অন্বীক্ষিক', 'বার্তা' 'দণ্ডনীতি', এই তিনটি ;[২৭] কারো মতে

চতুর্দশ বিদ্যার মধ্যে ত্রয়ী বা তিন বেদ বাদ দিয়ে বাকী এগারটি। এগুলি হচ্ছে ষড় বেদাঙ্গ, মীমাংসা, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি।[২৮] কৌটিল্য এসব বিদ্যা উপনয়নের পর শেখার কথা বলেছেন। এমনকি খুরলীবিহার ও বাহনায়ুধও চূড়াকরণের পর শেখার কথা, কৌটিল্য বা কালিদাস বলেননি। রঘু এবং কুমারেরা উপনয়নের পরই অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিল। অথচ লবকুশ উপনয়নের আগেই শিখেছে। আবার এই উদাহরণগুলির কোনটাতেই বিদ্যারম্ভ-সংস্কারের কথা নেই। আর সবগুলি উদাহরণই রাজার ছেলেদের বা ক্ষত্রিয়ের প্রাক্-উপনয়ন শিক্ষার কথা। বিদ্যারম্ভ-সংস্কারের অনুল্লেখ থেকে বোঝা যায়, তখনো এই সংস্কার চালু হয়নি। ভবভূতিকে আট শতকের লোক বলেই ধরা হয়।[২৯] তাহলে ধরে নেওয়া যায় তখনো উপনয়নের আগে লেখাপড়া আর অঙ্ক শেখার সাধারণ প্রথা চালু হয়নি। যদিও রাজ-রাজড়াদের ঘরে প্রাক্-উপনয়ন এক ধরনের শিক্ষা চালু ছিল। আবার টীকাকারদের লেখায় বিদ্যারম্ভ-সংস্কারের উল্লেখ দেখে বলা যায় তাদের কালে এই প্রথা চালু ছিল। অর্থশাস্ত্র ছাড়া অঙ্ক শেখার কথা আর কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। অনুমান করি 'সংখ্যান' কথাটি পরবর্তীকালে অর্থশাস্ত্রে যুক্ত হয়েছে।

ললিত-বিস্তর ও জাতক

আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ দাখিল করা হয় ললিত-বিস্তর আর জাতকের গল্প থেকে। দেশীবিদেশী অনেক ঐতিহাসিকই ললিত আর জাতকের গল্পকে প্রাচীন ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার দলিল হিসাবে দাখিল করেছেন। ললিত-বিস্তরে রাজপুত্র শাক্যসিংহের লিপিশালায় গিয়ে লিপি-শিক্ষার বর্ণনা আছে। দশহাজার শিশুসঙ্গে দশহাজার রথ-ভর্তি খাদ্যদ্রব্য ও সোনাদানা নিয়ে কুমার লিপিশালায় হাজির হলেন। লিপিশালার শিক্ষক বা দারকাচার্য বিশ্বামিত্র তো বুদ্ধকে দেখে প্রায় মূর্চ্ছা যায় আর কি! শুভাঙ্গ নামে দেবপুত্র বিশ্বামিত্রকে সময়মত ধরে ফেলেন এবং বলেন যে—কোটি কল্প বছর আগেই ইনি সর্বশাস্ত্র, লিপি, সংখ্যা, গণনা প্রভৃতি সবই শিখেছেন তবে লোকশিক্ষার্থে তিনি আবার সব শিখতে এসেছেন। তখন কুমার কাঠের ফলক বাগিয়ে ধরে বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করেন—'ব্রাহ্মীং', 'খরোষ্ট্রীং', 'পুষ্করসারীং', 'অঙ্গলিপিং', 'বঙ্গলিপিং' ইত্যাদি চৌষট্টি লিপির কোনটি তিনি শেখাবেন।[৩০] বিশ্বামিত্র

নিজে এত লিপির নামই জানেন না, কাজেই তাঁর অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। যাইহোক, লিপিশালা নামে স্কুলের এবং দারকাচার্য নামে শিক্ষকের অস্তিত্বের কথা জানা গেল। আরো জানা গেল লিপি, সংখ্যা ও গণনা শেখার রেওয়াজ ছিল, অন্তত রাজপুত্র বা ক্ষত্রিয়দের মধ্যে। লিপিশালা নামে স্কুলের উল্লেখ কিন্তু বড় একটা আর কোথাও পাওয়া যায় না। আর রাজপরিবারের বাইরে এ ধরনের শিক্ষা কতটা চালু ছিল তাও ভালো জানা যায় না। যদিও দশহাজার শিশুসঙ্গে বুদ্ধ লিপিশালায় হাজির হয়েছিলেন। সংখ্যাটায় বড় বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। তাছাড়া এই চৌষট্টি লিপির উল্লেখও কেমন গোলমেলে। বঙ্গলিপি বলে কোন লিপি তখন চালু ছিল তারও আর কোন প্রমাণ নেই। আলবেরুনী লিখেছেন, পূর্বদেশে গৌড়ী অক্ষর চালু ছিল।[৩১] তিনি বঙ্গলিপির কোন উল্লেখ করেননি। বাংলা অক্ষরের যে ইতিহাস আমরা জানি তাতে ললিত-বিস্তরের কালে বঙ্গাক্ষর বা বঙ্গলিপির অস্তিত্ব ভাবাই যায় না। ছাপা ললিত-বিস্তরের আদর্শ পুঁথি বিশেষ পুরনো নয়। প্রাচীন পুঁথির অভাবে এবিষয়ে ললিত-বিস্তরের সাক্ষ্য খুব নির্ভরযোগ্য নয়। যাই হোক, জাতকের গল্পে আমরা লেখা আর অঙ্ক শেখা সম্পর্কে কিছু হদিশ পেতে পারি কিনা দেখা যাক।

জাতক

জাতকের গল্পগুলি থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন প্রায় সব ঐতিহাসিক। বিমলাচরণ লাহা এক প্রবন্ধে জাতকের গল্পের শিক্ষাবিষয়ক উপাদানগুলিকে একসঙ্গে জড়ো করেছেন।[৩২] কিন্তু এই উপাদানগুলির শ্রেণীভিত্তিক বিশ্লেষণ বড় একটা কেউ করেননি। লিপিশিক্ষা যে উঁচু শ্রেণীগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় জাতকের গল্পে। উচ্চশিক্ষায় শূদ্র এবং নিচু শ্রেণীর যে কোন অধিকার ছিল না তা তো স্পষ্ট করেই বলা আছে। 'করণদিয়া' জাতকে আছে, পৃথিবীর সর্বত্র মাটি যেমন সমান নয় তেমনি সকলে শিক্ষার যোগ্য নয়।[৩৩] আবার 'চিত্তসম্ভূতি' জাতকে দেখা যায়, লেখাপড়ার অধিকারহীন দুই চণ্ডাল ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তক্ষশিলায় গিয়েছিল পড়াশুনা করার আশায়। শেষে ধরা পড়ে যায় আর তাদের তক্ষশিলা থেকে বার করে দেওয়া হয়।[৩৪] 'মুখি' জাতকে দেখা যাচ্ছে, যে-ছাত্র বেতন দিতে

পারে সে ছেলের মতো থাকে গুরুগৃহে আর যে তা পারে না সে চাকরের মতো থাকে।[৩৫] জাতপাত আর ধনী-দরিদ্রের ফারাক শিক্ষাক্ষেত্রেও সমান প্রবল ছিল। বৌদ্ধযুগেও তার অন্যথা হয়নি, রকমফের হয়েছিল মাত্র।

'কতাহক' জাতকে আছে, বোধিসত্ত্ব একদা বেনারসের এক বেশ ধনী মহাজন ছিলেন। একই সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও এক দাসী পুত্রসন্তান প্রসব করে। বয়সকালে ধনী মহাজনপুত্র লেখা শিখতে গেল। সঙ্গে গেল দাসীপুত্র তার লেখার কাঠের ফলকবহনকারী হিসাবে। প্রভুপুত্রের লেখা শেখা দেখতে দেখতে দাসীপুত্র লেখা শিখে ফেলল সকলের অজান্তে। পরে তার আর প্রভুপুত্রের সেবাদাস হয়ে থাকতে ইচ্ছে হল না। দেখে শেখা বিদ্যা কাজে লাগিয়ে উন্নতির সুযোগ খুঁজতে লাগল। উচ্চাশাবশে পরিচয়পত্র জাল করে এক শ্রেষ্ঠীর মেয়েকে করল বিয়ে। পরিচয়পত্র জাল না করে উপায় ছিল না, কেননা দাসীপুত্রের অধিকার সীমিত। যাইহোক, শেষে পড়ল বিপাকে। শ্রেষ্ঠী বোধিসত্ত্ব খোঁজখবর করে মেয়ের বাপের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। দাসীপুত্র কতাহকের কারচুপি ধরা পড়ে যায় আর কি! নিরুপায় কতাহক মাঝপথে বোধিসত্ত্বের হাতেপায়ে ধরে কোনরকমে শেষরক্ষা করল। বোধিসত্ত্ব কতাহকের আসল পরিচয় ফাঁস করে দিলেন না। তবে কতাহকের বউয়ের উপর তম্বি করা বন্ধ করতে হল। বোধিসত্ত্ব বউটিকে একটি শ্লোক মুখস্থ করিয়ে বলে দিলেন যে, বর তম্বি করলেই এই শ্লোকটি আউড়ে দেবে। বউটি শ্লোকের ভাষা জানত না, কাজেই অর্থও জানত না। শ্লোকটিতে বলা ছিল—

'যদি অপরিচিতদের সামনে বেশি বাকতাল্লা কর
তবে সেই অতিথি আবার ফিরে এসে তোমায় টিট করবে
অতএব কতাহক মুখটি বুজে খেয়ে নাও।'[৩৬]

বেচারী কতাহক আর কী করে! এর থেকে এ-ও বোঝা যাচ্ছে যে আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় লেখাপড়া শেখা হত না। আর মেয়েরা লেখাপড়া করত না। জাতকের গল্পে মেয়েদের লেখাপড়ার কোন খবর বড় একটা পাওয়া যায় না।

এই জাতকের গল্পকে অনেকেই জাতপাত ধনীদরিদ্র-নির্বিশেষে সকলের শিক্ষার প্রমাণ হিসাবে দাখিল করেন। এতে কিন্তু এই প্রমাণ হয় যে শ্রেষ্ঠীপুত্রদের লেখা শেখার রেওয়াজ থাকলেও সকলের সে অধিকার ছিল না।

এসব উদাহরণ থেকে কিন্তু মধ্যযুগের পাঠশালা শিক্ষার মতো কোন শিক্ষা-ধারার অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না। এই গল্প থেকে শুধু এটাই প্রমাণ হয় যে সেকালে শ্রেষ্ঠী-মহাজনদের মধ্যে লেখা শেখার প্রথা চালু ছিল। তাছাড়া লেখা শেখার এইধরনের বর্ণনা অন্য জাতকের গল্পে বড় একটা পাওয়া যায় না। যদিও বহু জাতকেই ব্রাহ্মণ বা ধনীসন্তানদের উচ্চশিক্ষার কথা পাওয়া যায়। এমনকি পারিবারিক বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথাও জানা যায়।[৩৭] ব্রাহ্মণদের প্রাক্-উপনয়ন শিক্ষা সম্পর্কেও কোন উল্লেখ দেখা যায় না। যদিও বয়সকালে শিক্ষালাভের কথা পাওয়া যায়। সাধারণত ষোল বছর বয়সে শিক্ষা শেষ হত। তিন বেদ মুখস্থ করতে হত, এবং অন্য আঠার বিদ্যা শিখতে হত এরকম উল্লেখ দেখা যায়। সাধারণত সাত বছর বয়সে শিক্ষা শুরু হত, এরকম দেখা যায়।[৩৮] আবার ব্রাহ্মণসন্তান লেখাপড়া না করে দিনমজুরি করছে, মাংস বিক্রি করছে বা কৃষিকাজ করছে, এরকম উদাহরণও পাওয়া যায়। উরগ জাতকের গল্প থেকে বোঝা যায় খেতমজুরের সন্তান ব্রাহ্মণ হলেও লেখাপড়ার সুযোগ পায় না। তাকে পারিবারিক বৃত্তিই শিখতে হয়।[৩৯]

কৌটিল্য ও অন্যান্য সংস্কৃত সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, রাজপুত্ররা লেখা শিখত, অস্ত্রবিদ্যা শিখত, হয়ত কেউ কেউ অঙ্কও শিখত। অঙ্ক শেখার কথা কৌটিল্যে এবং ললিত-বিস্তরে পাই, কিন্তু রঘুবংশে, উত্তররামচরিতে বা দশকুমারচরিতে অঙ্কের কোন উল্লেখ নেই। জাতকে লেখার উল্লেখ পাই। কিন্তু অঙ্ক শেখার উল্লেখ পাই না। তক্ষশিলায় শাস্ত্রশিক্ষার কথা পাই। কিন্তু অস্ত্রবিদ্যা শেখার তেমন উল্লেখ পাই না। এটাই স্বাভাবিক। কেননা এখানে প্রধানত শ্রেষ্ঠী-মহাজনদের বা ব্রাহ্মণদের শিক্ষার কথাই বলা হয়েছে। আর বলা হয়েছে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত পরিবারের সন্তানদের পারিবারিক বৃত্তি শেখার কথা। উচ্চশিক্ষার, বিশেষ করে তক্ষশিলার উল্লেখ এত বেশি যে মনে হয় তখন উচ্চশিক্ষা একটা প্রথাবদ্ধ রূপ নিয়েছিল। প্রাক্-উপনয়ন শিক্ষার তেমন কোন প্রথাবদ্ধ ধারার সন্ধান কিন্তু পাওয়া যায় না।

গুরুমুখী শুনে শেখার ঐতিহ্য

আসলে ভারতীয় লিপিগুলি যথেষ্ট বিকশিত হলে যখন বিভিন্ন শাস্ত্রগুলি লিপিবদ্ধ হতে আরম্ভ করল তখন লেখার অভ্যাস বা লেখা শেখার প্রথা চালু

হয়েছিল নিশ্চয়ই। পাণিনি 'লিপিকার' ও 'গ্রন্থের' উল্লেখ করেছেন, যদিও তখনো মুখেমুখেই পড়াশুনা হত।[৪০] গুরুর মুখে শুনে বেদ কণ্ঠস্থ করার মধ্যেই যতদিন শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন অবশ্যই অন্তত ব্রাহ্মণদের প্রাক্-উপনয়ন শিক্ষার তেমন দরকার ছিল না। বেদের এবং শাস্ত্রের অর্থবোধে বিপত্তি দেখা দিলে ব্যাকরণ ও গ্রন্থের প্রয়োজন নিশ্চয়ই অনুভূত হচ্ছিল। শিক্ষার সীমা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে লেখার ও গ্রন্থের গুরুত্ব অবশ্যই বাড়তে লাগল। ক্রমে বেদ ছাড়াও অন্যান্য বিষয় শিক্ষার অঙ্গীভূত হলে লিখিত বিষয়ের অধ্যয়ন ও চর্চা চালু হয়। সেইসঙ্গে প্রাক্-উপনয়ন লেখাপড়ার রেওয়াজ সীমাবদ্ধভাবে হলেও চালু হয়েছিল বলেই মনে হয়। কৌটিল্য ও ললিত-বিস্তরের সাক্ষ্য থেকে মনে হয় সেসময়, বিশেষ করে, রাজপুত্রদের মধ্যে লেখা শেখার প্রচলন ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে ক্ষত্রিয় ছাড়া অন্য বর্ণের প্রাক্-উপনয়ন শিক্ষার কোন উল্লেখ চোখে পড়ে না। সে উল্লেখ পাওয়া যায় জাতকের গল্পে। বৈশ্য বা শ্রেষ্ঠী-মহাজনদের শিক্ষার কথা পাই সেখানে। প্রাচীন স্মৃতির যুগে লেখার যথেষ্ট প্রচলন ছিল সন্দেহ নেই। তবে তা রাজ-কার্যেই বেশি প্রচলিত ছিল। শাস্ত্রচর্চায় সম্ভবত লেখার প্রচলন তেমন ছিল না। কারণ বেদ কণ্ঠস্থ করতে হত এবং তা-ও গুরুর মুখে শুনে। ধর্মসূত্র এবং গৃহ্যসূত্রের সাক্ষ্যে মনে হয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে লেখা শেখার রেওয়াজ বিশেষ ছিল না। লেখা বই পড়ে বেদ মুখস্থ করা চলত না। জোর গলায় পাঠ করা এবং বেদবর্ণ কর্ণগোচর করা বেদ-অধ্যয়নের অঙ্গ। এবং গুরুর মুখে শুনেই বেদ পাঠ করতে হত। বৌদ্ধযুগেও একই ধারা প্রচলিত ছিল।[৪১] গুরুমুখী শুনে শেখার ঐতিহ্যে প্রাক্-উপনয়ন লেখা আর অঙ্ক শেখার বড় একটা প্রয়োজন ছিল না। ফলে সে ধরনের কোন প্রথাও বহুকাল গড়ে ওঠেনি।

লিপি, পুঁথি ও আদি ভারতীয় সাহিত্য

উইনটারনিট্‌জের মতে, ভারতীয় সাহিত্যের আদিযুগে লিখিত সাহিত্যের কোন নজির মেলে না। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে লেখা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমনকি বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র, যা খ্রীস্টপূর্ব ২৪০ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছিল, তাতে কোথাও পুঁথির উল্লেখ নেই। যদিও তখন লেখার বহুল প্রচলন ছিল এমন প্রমাণ যথেষ্টই পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের

সারাদিনের কাজের যে খুঁটিনাটি ফিরিস্তি পাওয়া যায় তাতে পুঁথি লেখা বা লিপি করার কোন কথা পাওয়া যায় না। এইসব বিবেচনায় তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রাচীনকালে ভারতে কোন লিখিত বই ছিল না।[৪২] অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন—"ভিক্ষুদের নিত্যব্যবহার্য জিনিষগুলির মধ্যে কোন পুঁথিপত্র বা লেখার উপকরণের উল্লেখ পাওয়া যায় না।"[৪৩] আসলে পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকের আগের কোন ভারতীয় পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে বলেও জানা যায় না।[৪৪] এগার বা বার শতকের আগের পুঁথি মাত্র দু'একটিই পাওয়া গেছে। বেশির ভাগ পুঁথি যা পাওয়া গেছে তা বার শতকের পর লিপি করা। বুহ্‌লারের মতে, বানিয়ারাই প্রথম সেমেটিক অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থে লেখার তাগিদ তারাই বেশি করে অনুভব করে। ব্রাহ্মণরা লেখার প্রয়োজন তেমন বোধ করেনি, কারণ গুরুর মুখে শুনে অধ্যয়নই ছিল তাদের ঐতিহ্য।[৪৫] পরবর্তীকালে পাঠশালা বা লেখাপড়া আর অঙ্ক শেখার প্রাক্-উপনয়ন দেশজ শিক্ষাব্যবস্থায় কায়স্থের প্রাধান্যের কারণও হয়ত এখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, রঘুনন্দন তাঁর জ্যোতিস্তত্ত্বম্-এ চূড়াকর্ম ও উপনয়ন সম্পর্কে দ্বিজাতির উল্লেখ করলেও কর্ণবেধ এবং বিদ্যারম্ভ বিষয়ে দ্বিজাতির উল্লেখ করেননি। আবার উপনয়নের আগেই বেদাঙ্গ ও স্মৃতিশাস্ত্র পড়ার বিধান দিয়েছেন। উপনয়নের আগে বেদ পাঠ করা যায় না, এরকম বলেছেন। বোঝা যাচ্ছে, রঘুনন্দনের কালে শূদ্রের বিদ্যারম্ভে বাধা ছিল না। এখানে উল্লেখ করা যায় হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বম্'-এ বিদ্যারম্ভ-সংস্কারের উল্লেখ নেই।[৪৬]

ছান্দোগ্য উপনিষদ, উপনয়ন ও শিক্ষিতের হার

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ছান্দোগ্য উপনিষদে রাজা অশ্বপতি দাবি করেছিলেন যে তাঁর রাজ্যে কোন 'অবিদ্বান' লোক নেই।[৪৭] উপনিষদের কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়ন-সংস্কার বাধ্যতামূলক ছিল—এই যুক্তি ও অশ্বপতির উক্তির উপর নির্ভর করে রাধাকুমুদ মুখার্জি সিদ্ধান্ত করেন যে, সেই সময় 'ভারতীয় আর্যদের মধ্যে কার্যত সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা' প্রচলিত ছিল।[৪৮] আলটেকরও একই সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে দাবি করেন যে, সেই প্রাচীনকালেও আর্য জনগোষ্ঠীর শতকরা ৭৫ ভাগ লোক

লেখাপড়া জানত বা শিক্ষিত ছিল। তাঁর মতে পরবর্তীকালে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মধ্যে উপনয়ন-সংস্কার ক্রমে লোপ পেতে থাকে। ফলে প্রাথমিক-শিক্ষার প্রসার ঘটলেও শিক্ষিত (literate) লোকের হার কমে যায়।[৪৯] আলটেকর এই ধরনের যুক্তির অবতারণা করে মত প্রকাশ করেছেন যে মুসলমান অধিকারের আগে শতকরা ৪০ ভাগ স্কুলের বয়সী শিশু লেখাপড়া শিখত আর প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে সে হার নেমে দাঁড়ায় মাত্র শতকরা ১৫ ভাগে।[৫০]

এ ধরনের দলছুট নজির থেকে কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা কিন্তু বড়ই বিপজ্জনক। তাই বিষয়টা একটু খতিয়ে দেখা দরকার। প্রাচীন স্মৃতির সাক্ষ্য ধরে বলা যায়, উপনিষদের কালে শূদ্রের শিক্ষা ছিল অসম্ভব। কাজেই রাজা অশ্বপতির দাবি সত্যি হলে বলতে হয় তাঁর রাজ্যে শূদ্র কেউ বাস করত না বা তিনি শূদ্রদের নাগরিক বলে ধরেননি। আলটেকরও শূদ্রের শিক্ষার দাবি করেননি। তাই তিনি শিক্ষিতের হার শতকরা ৭৫ ভাগ ধরেছেন। বাকী ২৫ ভাগ নিশ্চয়ই অশিক্ষিত শূদ্র। তবে তিন দ্বিজবর্ণের উপনয়ন-সংস্কারও কিন্তু একরকম ছিল না। তাদের উপনয়ন-সংস্কার হত বিভিন্ন বয়সে। বৈশ্যের উপনয়ন হত ১২ বছর বয়সে। আর ২৪ বছর বয়স পর্যন্ত তাদের উপনয়ন-সংস্কার করা যেত।[৫১] অতএব ধরে নেওয়া যায়, বৈশ্যরা ১২ বছর থেকে ২৪ বছর বয়সে পড়াশুনা শুরু করত। বৈশ্যের শাস্ত্রসম্মত জীবিকা ছিল পশুপালন, ব্যবসা ও কৃষি।[৫২] এখন উপনয়ন-সংস্কার ও পড়াশুনা বাধ্যতামূলক হলে তাদের পক্ষে এত বয়স পর্যন্ত কোন জীবিকা ছাড়াই থাকতে হত। বাস্তব অবস্থা বিচারে এটা কতখানি সম্ভব সেবিষয়ে সন্দেহ আছে। মনে রাখতে হবে, ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যরা যজন-যাজন বা অধ্যাপনা করার অধিকারী ছিল না। মনুস্মৃতিতে দেখা যায় তিন দ্বিজবর্ণের কাজের ফিরিস্তিতে ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রথমেই অধ্যয়ন, তার পরে অধ্যাপনের উল্লেখ আর বাকী দুই দ্বিজ-বর্ণের বেলায় অধ্যয়নের উল্লেখ চার নম্বরে, অধ্যাপন তো নিষিদ্ধ।[৫৩] বোঝাই যাচ্ছে অধ্যয়নের গুরুত্ব তিন বর্ণের বেলায় সমান নয়। সেক্ষেত্রে তিন বর্ণের বাধ্যতামূলক পড়াশুনা কেমন খাপছাড়া লাগে। তাছাড়া উপনয়ন-সংস্কার কোন্ সময় পর্যন্ত তিন উচ্চবর্ণের বাধ্যতামূলক ছিল তা জানারও কোন উপায় নেই। অন্তত জাতকের আমলে যে বাধ্যতামূলক ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যায়। জাতকের গল্পে ব্রাহ্মণ পড়াশুনা না করে খেতমজুরের কাজ করছে এ খবরও আছে। এইসঙ্গে মনে রাখতে হবে,

আদিযুগে লেখা বা পুঁথির সঙ্গে বেদবাদী জনগোষ্ঠীর খুব একটা পরিচয় ছিল না। আর পড়াশুনা ও লেখাপড়া বা সাক্ষরতা এক বিষয় নয়। তখন প্রাক্-উপনয়ন লেখাপড়ার প্রশ্নই ছিল না। এরকম অবস্থায় উপনয়ন-সংস্কার বাধ্যতামূলক হলেও তা আমাদের আলোচনার আওতায় আসে না। যেমন শূদ্ররা বাড়িতে বংশ-পরম্পরায় যে প্রশিক্ষণ পেত বা জাতকে পারিবারিক বৃত্তিমূলক শিক্ষার যে বর্ণনা আছে তাকে লেখাপড়ার মধ্যে ফেলা যায় না। স্মৃতির বিধান অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যের উপনয়ন বাধ্যতামূলক ছিল বলেই এরা সকলেই পৈতে নিয়ে বেদ পড়ত, এরকম ভাবারও কারণ নেই। স্মৃতির বিধানগুলি থেকে বোঝা যায় সেই সমাজে আদর্শ আচারগুলি কী ছিল। তার অর্থ এই নয় যে সবাই সেসব আচার মেনে চলত। তবে বেশির ভাগ মানুষই স্মৃতির বিধান মেনে চলত, এরকম অনুমান সঙ্গত।

তাছাড়া রাজা অশ্বপতির উক্তি সঠিক পটভূমিতে বিচার করা দরকার। আসলে, প্রাচীন শাল, সত্যযজ্ঞ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, জয় ও বুড়িল এই পাঁচজন মহাশ্রোত্রিয় ও মহাগৃহস্থ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, "কে আমাদের আত্মা, কে ব্রহ্ম?" এঁরা ঠিক করলেন, অরুণপুত্র উদ্দালকের কাছে গিয়ে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। উদ্দালক নিজে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবেন না ভেবে তাঁদেরকে কেকয়পুত্র রাজা অশ্বপতির কাছে নিয়ে গেলেন। রাজা অশ্বপতি এই ছয় ব্রাহ্মণকে যথোচিত অভ্যর্থনা করলেন এবং এঁরা কিছু ধনলাভের আশায় এসেছেন ভেবে দান দিতে গেলেন। এঁরা দান-গ্রহণ না করায় অশ্বপতি ভাবলেন তাঁর রাজ্য ধর্মরাজ্য কিনা এ বিষয়ে এঁদের সন্দেহ আছে, তাই এঁরা দান নিচ্ছেন না। তখন এঁদের সন্দেহ দূর করার জন্য রাজা বললেন—'আমার রাজ্যে কোন চোর নাই, মদ্যপায়ী নাই, এমন ব্রাহ্মণ নাই যিনি অনাহিতাগ্নি, অবিদ্বান নাই, ব্যভিচারী নাই কাজেই ব্যভিচারিণী থাকবে কীভাবে।'[৩৪] অতএব আমার দান কেন গ্রহণ করবেন না?

এতে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে অধার্মিক এবং অবিদ্বান লোক বাস করে এমন রাজ্যও তখন ছিল। তা নাহলে ব্রাহ্মণদের দান গ্রহণের আপত্তির এই কারণ ভেবে রাজা এই উক্তি করতেন না। আবার 'অনাহিতাগ্নি' ও 'অবিদ্বান' কথা দুটি যুক্ত শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে। যুক্ত শব্দটি হচ্ছে—'নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্', তার পরেই 'স্বৈরী স্বৈরিণী কুতো'। শব্দটি ভাঙলে দাঁড়ায় ন, অনাহিতাগ্নিঃ, ন, অবিদ্বান, ন, স্বৈরী ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ অগ্নিহোত্রী হতে পারে না

ধরে যদি 'এমন ব্রাহ্মণ নেই যিনি অনাহিতাগ্নি' এই অর্থ করা হয় তবে অবিদ্বান কথাটি এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় 'এমন ব্রাহ্মণ নেই যিনি অবিদ্বান' এই অর্থও করা যায়। অবশ্য বিদ্বান কথাটি কী অর্থে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সেটাই সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন। আবার বিদ্যা বলতে কী বোঝায় তার উপরই এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে।

অথর্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদে এ বিষয়ের আলোচনা আছে। গৃহস্থপ্রধান শৌনক অঙ্গিরাকে প্রশ্ন করেছিলেন—'কি জানিলে সবকিছু জানা হয়'। উত্তরে অঙ্গিরা বলেছিলেন—ব্রহ্মবিদেরা বা বেদার্থবিদেরা বলেন যে পরা ও অপরা এই দুই বিদ্যা অবশ্য জানতে হয়।[৫৫] অপরা বিদ্যা বলতে বোঝাচ্ছে—'ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্পসূত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃশাস্ত্র ও জ্যোতিষ।'[৫৬] আর পরা বিদ্যা হচ্ছে সেই বিদ্যা যার দ্বারা 'সেই অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, নীরূপ, চক্ষু-কর্ণ-পদ-বিহীন, নিত্য, বিভু, সর্ব্বব্যাপী, অতি সূক্ষ্ম সর্বকারণ অক্ষর ব্রহ্মকে পাওয়া যায় বা জানা যায়।'[৫৭] এই দুঃখময় সংসারের উপশম বা অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ যে মোক্ষ তাই পরা বিদ্যার বিষয়। আসলে 'যাগ-যজ্ঞ-পূজা' এসবই অপরা বিদ্যার বিষয়। এই অপরা বিদ্যা বিষয়ে জ্ঞান হলেই অনিত্য সংসার আর ধর্ম-কর্ম-বিষয়ে বৈরাগ্য আসে। আর এই বৈরাগ্য বা নির্বেদ অবস্থা পেলেই ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর আশ্রয়ে পরা বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে পারে।[৫৮]

মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের বার নম্বর শ্লোকে সবকিছু ত্যাগ করে ব্রহ্মবিদ্যা লাভে ব্রাহ্মণেরই বিশেষ অধিকার, এরকমই বলা আছে।[৫৯] শঙ্কর ভাষ্যেও তাই বলা আছে। আবার অগ্নিহোত্রীও ব্রাহ্মণ। কিন্তু অগ্নিহোত্রীর কাজ অপরা বিদ্যার বিষয়। ব্রাহ্মণই অপরা বিদ্যা জেনে অর্থাৎ কর্মমাত্রই অনিত্য ফলের সাধক আর কর্মের সঙ্গে আত্মজ্ঞানের বিরোধ বুঝে কর্মবৈরাগ্যের পথে ব্রহ্মজ্ঞানের পথিক হয়। অন্তত মুণ্ডকোপনিষদে ব্রাহ্মণের বিশেষ অধিকার স্বীকৃত সন্দেহ নেই। কাজেই বিদ্বান বলতে ব্রহ্মবিদ্যাবিদ বা পরা বিদ্যাবিদ বোঝালে রাজা অশ্বপতির রাজ্যে এমন ব্রাহ্মণ নেই যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী নন, এরকম অর্থও হয়।

আবার সাধারণভাবে বলা যায়, রাজা অশ্বপতি সমাগত ব্রাহ্মণদের জানাতে চাইছেন যে তাঁর রাজ্যে সকল বর্ণের লোকই নিজ নিজ ধর্মীয় আচরণ-সম্পর্কে জ্ঞাত এবং সেই মত আচরণ করে থাকেন। অতএব তাঁর দান-গ্রহণে আপত্তি করার কারণ নেই। এ প্রসঙ্গে রামায়ণের সেই বিখ্যাত ব্রাহ্মণপুত্রের অকাল-

মৃত্যু ও শূদ্র-মুনি শম্বুকের মাথা কাটা যাওয়ার গল্পটি উল্লেখ করা যায়। শূদ্রের পক্ষে তপস্যা অধর্ম, কাজেই রামরাজ্যে পাপ ঢুকেছিল এবং ব্রাহ্মণের ছেলে অকালে মারা গিয়েছিল। 'ধার্মিক' রাজা রামচন্দ্র তরবারির এক কোপে শূদ্র-মুনির মাথা কেটে ফেললেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের ছেলে বেঁচে উঠল। সেই বিদ্বান যার বর্ণধর্মের জ্ঞান আছে এই অর্থেও অশ্বপতি কথাটি বলে থাকতে পারেন। নিখিলানন্দ স্বামী ন, অবিদ্বানের ইংরেজি করেছেন—'No Ignorant Person' আর ব্যাখ্যা করেছেন 'In accordance with his own class'[৩০] বোঝাই যাচ্ছে, জনপদের প্রতিটি নাগরিক নিজবর্ণ অনুযায়ী ধর্মীয় কর্তব্যবিষয়ে জ্ঞাত, এটাই বলা হচ্ছে। রাধাকুমুদ মুখার্জিও কিন্তু 'No Ignorant Person' এই অনুবাদই করেছেন। যাইহোক, বিদ্বান বলতে ইংরেজি 'literate' বা 'educated' এ-ধরনের অর্থ করার কোন সঙ্গত কারণ দেখি না। সবদিক বিচার করে বলা যায় রাজা অশ্বপতির উক্তিকে শিক্ষা-প্রসারের দলিল হিসাবে দাখিল করা যায় না।

শূদ্রের লেখাপড়া

এ ত গেল একদিক। অন্যদিকে রামশরণ শর্মা মনে করেন যে, গুপ্ত-সাম্রাজ্যে শূদ্রের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হয়েছিল।[৩১] বৈদিক যুগে শূদ্রদের কাজ ছিল মূলত দ্বিজদের সেবা করা। মনুস্মৃতি মতে, 'প্রভু প্রজাপতি শূদ্রের জন্য একটি কর্মই ঠিক করিয়া দিয়াছেন—তাহা হইতেছে কোনরূপ অসূয়া না করিয়া এই বর্ণ-ত্রয়ের সেবা করা।'[৩২] রামশরণ শর্মার মতে মৌর্য আমলে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হলেও গুপ্ত আমলেই শূদ্রদের অনেককে কৃষিকাজ, বাণিজ্য ও শিল্পকর্ম করতে দেখা যায়। প্রাচীন স্মৃতির মতে এগুলি বৈশ্যের করণীয় কাজ।[৩৩] গুপ্ত আমলে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করে অনেক শূদ্র বেশ ধনী হয়ে ওঠে। এমনকি অনেক ব্রাহ্মণ এইসব ধনী শূদ্রদের বেশ সমীহ করত। শূদ্রের শিক্ষা-সম্পর্কে সমাজ অনেকটা উদারনীতি নিতে থাকে। ফলে শূদ্রের মধ্যে লেখাপড়া শেখার রেওয়াজ দেখা দেয়।[৩৪] সুখময় ভট্টাচার্য শূদ্রা-গর্ভজাত বিদুরের পাণ্ডিত্য এবং সূতজাতীয় সঞ্জয় ও সৌতির জ্ঞানগম্যি দেখে সিদ্ধান্ত করেন, মহাভারতের সমাজে 'জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে শিক্ষার' প্রচলন ছিল। এতটা ভাবা হয়ত

যাই হোক, মহাভারতের শান্তিপর্বে তিনজন শূদ্রমন্ত্রী নিয়োগের উল্লেখ থেকে ভট্টাচার্য ও শর্মা দুজনেই শূদ্রের অবস্থানের উন্নতি লক্ষ করেন।[৬৬] তখন সমাজে জাতপাতের মধ্যে একটা গতিশীলতা দেখা দেয়, একথা বোধহয় ঠিক। ব্রাহ্মণরা জমিদান গ্রহণ করে ক্রমেই কৃষিজমির মালিক হতে থাকে। গুপ্ত ও সেন আমলের বহু তাম্রশাসনে ব্রাহ্মণকে জমিদানের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬৭] কৃষির প্রসার কৃষিমজুর বা কৃষকের সংখ্যা বাড়ায়। বৈশ্য ও শূদ্ররা এই পেশায় যোগ দিতে থাকে। একটা পেশাগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সমাজের এই গতিশীলতার অবস্থায় লেখাপড়া শেখার হার কমে যাওয়া যেন কিছুটা অস্বাভাবিক। যেখানে তলার শূদ্ররা লেখাপড়া শিখছে সেখানে উপরের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মধ্যে উপনয়ন-সংস্কার লোপ পাচ্ছে এবং তাদের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা এতই কমে যাচ্ছে যে মোট লেখাপড়া জানা লোকের হার কমে যাচ্ছে, এধরনের অনুমানের ভিত বড়ই কাঁচা। আসলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মধ্যে উপনয়ন-সংস্কার লোপ পাচ্ছিল তখনই যখন উপনয়ন-সংস্কার শুধুমাত্র দ্বিজ-সংস্কারে পরিণত হচ্ছিল। আর তা হচ্ছিল প্রাক্-উপনয়ন লেখাপড়া শুরু হওয়ার পরই। আবার প্রাক্-উপনয়ন লেখাপড়ার প্রচলনের সঙ্গে সকল বর্ণের পালনীয় বিদ্যারম্ভ-সংস্কারের একটা কার্যকারণ-সম্পর্ক ছিল বলেই মনে হয়।

বৌদ্ধ প্রভাব ও পার্থিব শিক্ষা

বিভিন্ন প্রাচীন উপাদান থেকে যেটুকু বোঝা যায়, তাতে মনে হয় বৌদ্ধযুগেই লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার রেওয়াজ কিছুটা চালু হয়। বৌদ্ধযুগে শ্রেষ্ঠী মহাজন ও বণিকদের মধ্যে যোগাযোগ ও হিসেব কেতাব রাখার তাগিদে লেখা আর গোনা শেখার প্রথা চালু ছিল বলেই ধারণা হয়। জাতকে অঙ্ক শেখার সাক্ষ্যের অভাবে এবিষয়ে জোর দিয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়। কিন্তু তাকে কোনভাবেই আনুষ্ঠানিক লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার সাধারণ শিক্ষাধারার পর্যায়ে ফেলা যায় না। তবে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের প্রাক্-উপনয়ন শিক্ষার সঙ্গে শ্রেষ্ঠী-মহাজনদের লেখা আর অঙ্ক শেখার একটা মৌলিক প্রভেদ ছিল। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের প্রাক্ উপনয়ন শিক্ষা ছিল তাদের শাস্ত্রীয় বা উচ্চশিক্ষার প্রাথমিক ধাপ। অন্যদিকে শ্রেষ্ঠী-মহাজনদের লেখা আর অঙ্ক শেখা ছিল সম্পূর্ণ ব্যবহারিক শিক্ষা। তা ছিল শাস্ত্রনিরপেক্ষ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

অনেক ঐতিহাসিক আবার বৌদ্ধ মঠগুলিতে শিক্ষানবিশ শিশুর নজির তুলে বৌদ্ধযুগেই ধর্মনিরপেক্ষ বা শাস্ত্রনিরপেক্ষ প্রাথমিক-শিক্ষার সূত্রপাত ঘটেছিল এরকম সিদ্ধান্ত করেছেন। বিশেষ করে, মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার চাহিদা বাড়িয়ে তুলছিল বলেই মনে করা হয়।[৬৮] অশোকের আমলে এই সাধারণ শিক্ষাধারা যথেষ্ট বিস্তারলাভ করেছিল বলে মনে করেন অনেকেই। মৌর্য আমলে এ ধরনের শিক্ষার চাহিদা বাড়ছিল একথা হয়ত ঠিক। তাই বলে আঞ্চলিক ভাষায় লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার প্রথাবদ্ধ শিক্ষাধারা গড়ে উঠেছিল এবং শিক্ষিতের হার ছিল খুব বেশি, এরকম সিদ্ধান্ত করার মত প্রমাণ কিন্তু পাওয়া যায় না। আসলে অশোকের শিলালেখগুলি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় লেখা হয়েছিল সাধারণ নাগরিকদের পড়ার জন্য, একথা ধরে নিয়ে অনেকেই সিদ্ধান্ত করেছেন যে তখন সাক্ষরতার বেশ প্রসার ঘটেছিল।[৬৯] একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে, এই শিলালেখগুলি প্রধানত অঞ্চল-প্রশাসকদের জন্যই লেখা। সাধারণ মানুষ এগুলি পড়ে রাজ-আজ্ঞা জানবে এবং সেই মতো আচরণ করবে ভেবে এগুলি লেখা হয়েছিল, এরকম ধারণা করার যথেষ্ট কারণ নেই। বহু শিলালেখে বলা আছে, রাজ-আজ্ঞা জনগণকে শুনিয়ে দিতে হবে বা জনগণ শুনবে।[৭০] তাছাড়া এই শিলালেখগুলি যেসব দেশে পাওয়া গেছে সেইসব দেশের ভাষায়ই এগুলি লেখা হয়েছিল, একথা জোর দিয়ে বলা যায় না।[৭১] এগুলিকে তাই জনগণের মধ্যে সাক্ষরতা প্রসারের বা শিক্ষাবিস্তারের অকাট্য প্রমাণ হিসাবে মেনে নিতে অসুবিধা হয়। তবে লিপিকার বা কায়স্থরা যে একটা পেশাগত গোষ্ঠী হিসাবে গড়ে উঠেছিল, তা বোঝা যায়।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে বুহ্‌লার, ওবোয়াইয়ে বা আরো অনেকে বৌদ্ধযুগে লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার সাধারণ স্কুলের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে যেসব নজির হাজির করেছেন তার কোনটাই যুক্তির ধোপে টেঁকে না।[৭২] এরা 'ললিত-বিস্তর' 'মহাভাগ' আর 'কতাহক জাতকের' সাক্ষ্যের উপর বড় বেশি জোর দিয়েছেন। 'ললিত-বিস্তর' আর 'কতাহক' জাতকের সাক্ষ্য সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। কাজেই সে প্রসঙ্গ আর তুলব না।

মহাভাগ

মহাভাগের যে ঘটনাটি উল্লেখ করা হয় তা এইরকম—রাজগৃহে উপালি নামে একটি বালকের বাবা মা ছেলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবছিলেন যে ছেলে 'লেখা' শিখলে তাদের মৃত্যুর পর ছেলেকে কষ্ট পেতে হবে না। পরে ভাবলেন লেখা শিখতে গেলে আঙুলে ঘা হতে পারে। তার চাইতে গণনা শিখলে আর দুঃখ থাকবে না। আবার ভাবলেন গণনা শিখতে গেলে বুকের অসুখ করতে পারে। তার চেয়ে 'রূপ' বা মুদ্রার ব্যবসা করুক। অমনি তাদের মনে হল এতে ছেলের চোখ খারাপ হতে পারে। শেষে ঠিক করলেন যে উপালি সন্ন্যাসী হয়ে সংঘে যোগ দেবে।[৭৩] মহাভাগে 'লেখা' 'গণনা' আর 'রূপ' এই তিন বিষয়ের উল্লেখ বা হাতিগুম্ফার শিলালেখে কলিঙ্গ রাজা খারবেল শৈশবে এই তিন বিদ্যা শিখেছিলেন এমন উল্লেখ সত্ত্বেও প্রমাণ হয় না যে পাঠশালার মত সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার ধারা তখন প্রচলিত ছিল। ক্ষত্রিয়ের এই তিন বিদ্যা শেখার উল্লেখ আমরা আগেও দেখেছি। কাজেই এ থেকে নতুন খবর কিছু পাই না। উপালির গল্প থেকে বরঞ্চ মনে হয় লিপিকার, গণক ও রূপকার এই তিন পেশার শিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। এতে সাধারণভাবে লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার ব্যবস্থা বোঝায় না। তাছাড়া সমাজের উঁচুশ্রেণীর মধ্যে বিশেষ করে রাজা-রাজড়া বা শ্রেষ্ঠী মহাজনদের মধ্যে প্রাক্-উপনয়ন লেখা, পড়া আর হয়ত কিছু সংখ্যা শেখার প্রথা চালু ছিল, সেকথা আমরা আগেই জেনেছি। জাতকের গল্পে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের বহু উদাহরণ পাই। মহাভাগে তিনটি পেশার প্রশিক্ষণের উল্লেখ পাই। এর চেয়ে বেশি কোন খবর পাই না। এ প্রসঙ্গে বিদেশী পর্যটকদের বিবরণে কোন নতুন খবর পাওয়া যায় কিনা তাও দেখা দরকার।

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ

ফা হিয়েন

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী থেকেও আমরা খুব একটা বেশি কিছু খবর পাই না। মেগাস্থেনিসের বিবরণে আছে যে, ভারতে লিখিত আইন ছিল না। আর এখানকার লোকেরা লিখতে জানত না।[৭৪] মেগাস্থেনিসের বিবরণ খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয় ,বলেই পণ্ডিতরা মনে করেন। ফা হিয়েন ভারত ভ্রমণ করেন

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে। তখনো মুখে মুখে শুনে শাস্ত্র শেখার রেওয়াজ ছিল বলেই জানা যায় তাঁর বিবরণ থেকে। ফা হিয়েন সারা উত্তর ও মধ্যভারতের বিভিন্ন সংঘারাম ঘুরেও বিনয়পিটকের কোন পুঁথি সংগ্রহ করতে পারেননি। শেষে পাটনায় এসে বিনয়ের একটা পুঁথি হাতে পান।[৭৫] স্যামুয়েল বিল যিনি ফা-হিয়েনের বিবরণ চীনা ভাষা থেকে তর্জমা করেন তিনি পাদটীকায় এই খবরটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন।[৭৬] এর থেকে বোঝা যায়, পুঁথি লেখা এবং লেখা পুঁথির সাহায্যে শিক্ষার প্রথা তখনো তেমন চালু ছিল না। বরঞ্চ গুরুমুখে শুনে কণ্ঠস্থ করার রেওয়াজ তখনো চলছে। লিপিশালা বা লেখার প্রথা যদি ব্যাপক প্রসারলাভ করত তবে নিশ্চয়ই বিনয়ের মতো ধর্মগ্রন্থের পুঁথির এমন অভাব দেখা যেত না। ফা হিয়েনের বিবরণে লেখা, পড়া বা অঙ্ক শেখার প্রথাবদ্ধ ধারার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই বিবরণে দেখা যায়, মগধে শ্রেষ্ঠীরা দাতব্য হাসপাতাল তৈরি করেছে গরিব, বিধবা, বিকলাঙ্গ ও অসহায় শিশুদের চিকিৎসার জন্য। অনেক বিহার ও মঠের উল্লেখও পাওয়া যায়, কিন্তু লিপিশালা বা পাঠশালার উল্লেখ পাওয়া যায় না।[৭৭] আর মঠগুলিতেই প্রাথমিকশিক্ষা হত তার কোন প্রমাণ ফা হিয়েনের বিবরণে পাওয়া যায় না।

হিউয়েন সান্

ফা হিয়েনের পর সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে আসেন হিউয়েন সান্। হিউয়েন-সান্ জানাচ্ছেন যে—"ইনতুর (ভারত) লোকেরা অঞ্চলভেদে তাদের দেশকে বিভিন্ন নামে ডাকে। প্রত্যেক অঞ্চলের আচার-ব্যবহার ও প্রথা (Customs) আলাদা। সবচেয়ে ভালো শোনায় এরকম একটা সাধারণ নাম খুঁজে নেওয়ার জন্য আমরা একে 'ইনতু' বলে ডাকব···"।[৭৮] তিনি চার বর্ণের লোক এবং ব্রাহ্মণের প্রাধান্যের কথা বলেছেন। ব্রাহ্মণদের সাতচল্লিশ অক্ষর এবং এইসব অক্ষরের যোগে বিভিন্ন শব্দের গঠনের কথা বলেছেন। প্রত্যেক প্রদেশের প্রশাসকরা সমস্ত ঘটনার লিখিত নথি রাখত বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন। শিশুরা সাত বছর বয়সের আগেই বার অধ্যায়ের সিদ্ধবাস্ত পাঠ করত। বলা হয়ে থাকে যে, সিদ্ধবাস্ত বা সিদ্ধিরস্ত মহেশ্বর প্রথম শিখিয়েছিলেন এবং শিশুরা এটা ছয় মাসে মুখস্থ করে।[৭৯] ছয় বছর বয়সে শিশুরা সিদ্ধবাস্ত মুখস্থ করত। সাত বছর বয়সের পর তারা পঞ্চবিদ্যা শিখত। হিউয়েন সানের মতে এই পাঁচটি বিদ্যা হচ্ছে—শব্দ

বিদ্যা, শিল্পস্থান বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, হেতু বিদ্যা ও আধ্যাত্ম বিদ্যা। আর ব্রাহ্মণেরা এর উপর আবার চার বেদ পড়ত। এদের শিক্ষা শেষ হত ত্রিশ বছর বয়সে।[৮০] হিউয়েন সান্ নালন্দা প্রভৃতি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিবরণও দিয়েছেন। হিউয়েন সানের বিবরণ থেকেও লিপিশালা, পাঠশালা বা লেখা, পড়া, আর অঙ্ক শেখার সাধারণ ধারা সম্পর্কে খুব একটা নতুন কিছু খবর পাওয়া গেল না। সিদ্ধিরস্তু ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায় মাত্র। ছয় বছর বয়সে লেখা শেখানো হত এমন কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সিদ্ধিরস্তু মুখস্থ করা হত বলেই উল্লেখ আছে।

আই সিন্

এরপর ৬৭১ থেকে ৬৯৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ভারতে আসেন আই সিন্। হিউয়েন সান্ ও আই সিন্ এই দুই পর্যটকের বিবরণে অনেক মিল আছে। আই-সিন্ দু'ধরনের শিক্ষকের উল্লেখ করেছেন। এরা হল উপাধ্যায় আর আচার্য। উপাধ্যায় পড়াশুনা করান আর আচার্য শেখান নীতি ও ধর্ম।[৮১] হিউয়েন-সানের মতই আই সিন্ও পঞ্চবিদ্যার উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁর বিবরণে ব্যাকরণ শেখার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হত, দেখা যায়। পড়ুয়াদের প্রথমে ব্যাকরণ শিখতে হত। ব্যাকরণের আবার পাঁচটি ভাগ ছিল। ছয় বছর বয়সে পড়া শুরু হত। প্রথম ছয় মাসে সিদ্ধিরস্তু শেষ করতে হত। আই সিন্ উনপঞ্চাশটি অক্ষরের উল্লেখ করেছেন। সিদ্ধিরস্তুতে এইসব অক্ষর যোগে তিনশ' শ্লোক থাকত যা মুখস্থ করতে হত। চারটি পদে তৈরি একটি শ্লোকে বত্রিশটি শব্দাংশ (syllables) থাকত। এরপর আট বছর বয়সে আট মাস ধরে ব্যাকরণের মূল সূত্রগুলি মুখস্থ করতে হত। মাঝে এক বছর ছয় মাস পড়ুয়া কী করত, তা অবশ্য বলা নেই। সূত্রপাঠের পর ধাতুপাঠ তারপর খিল শেষ করে কাশিকাবৃত্তি শিখতে হত।[৮২] কাশিকাবৃত্তি আসলে পাণিনি সূত্র-প্রকাশিকা বা পাণিনি সূত্রের ভাষ্য বা ব্যাখ্যা। পনের বছর বয়সে এগুলি পড়তে হত পাঁচ বছর ধরে। ফলে ২০ বছর বয়সে ব্যাকরণ পড়া শেষ হত। আই সিন্ জানাচ্ছেন যে, এগুলি সবই মুখস্থ করতে হত। ফলে পড়ুয়াকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হত। ফাঁকি দেওয়ার যো ছিল না। বোঝা যায়, লেখা বা লিখিত পুঁথির সাহায্যে মানসচর্চা দ্বারা পড়াশুনা বড় একটা প্রচলিত ছিল না। এ

অবস্থায় লিপিশালা বা পাঠশালার মত প্রাতিষ্ঠানিক প্রথার প্রাধান্য আশা করা যায় না। বৌদ্ধ মঠগুলিতে লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার ব্যবস্থা ছিল বলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

হিউয়েন সান্‌ ও আই সিনের বিবরণে উচ্চশিক্ষার খবর অনেক থাকলেও প্রাথমিক শিক্ষার কথা খুবই কম। আই সিন্‌ জানাচ্ছেন যে, সাদা পোশাকের শিক্ষানবিশরা প্রধানত বৌদ্ধশাস্ত্র পড়তে মঠে আসত। এরা ভবিষ্যতে সংসারত্যাগী মঠধারী হওয়ার ইচ্ছা রাখত। এদের 'মানব' বলা হত। এরা ছোটবেলা থেকেই মঠে থাকত। জাতকের গল্পেও সাত বছর বয়সে নবিশ হিসাবে মঠে প্রবেশ, পরে সন্ন্যাসী হওয়ার উল্লেখ আছে। আই সিনের বিবরণে দেখা যায়, এ ছাড়াও আর এক ধরণের পড়ুয়া ছিল। এরা মূলত পার্থিব বিষয় পড়তেই মঠে আসত। এদের সংসারত্যাগের কোন বাসনা ছিল না। এদেরকে 'ব্রহ্মচারী' বলা হত। এই দুই দলের সকলকেই মঠে থেকে পড়াশুনা করতে হত এবং নিজেদের খরচ নিজেদের বইতে হত।[৮৩] অনেকে পরবর্তী পাঠশালা শিক্ষার উৎস খোঁজেন এই দ্বিতীয় দলের পড়ুয়াদের মধ্যে। একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন—"এটা একেবারে যুক্তিহীন মনে হয় না যে বৌদ্ধ বিহারগুলি সে যুগে বহুপরিমাণে সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদা পূরণ করছিল। বৌদ্ধধর্মের ভাঁটার সঙ্গে সঙ্গে এইসব মঠ ও বিহারগুলি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদা মেটাবার জন্য নতুন উপায়ের খোঁজ চলে। আর এই তাগিদ থেকেই পরবর্তী দেশজ প্রাথমিক শিক্ষার স্কুলগুলির উদ্ভব ও বিস্তার ঘটে।"[৮৪] বার্মা ও সিংহলে বৌদ্ধ মঠ ও বিহারগুলিতে সেদিনও যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা দেখা যেত তা থেকেই এরকম একটা সিদ্ধান্তে এসেছেন অনেকে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, সিংহলে লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার দেশজ স্কুলকে বলা হয় 'পানশাল' আর বাংলায় তাকে বলা হত 'পাঠশালা'। বার্মার প্রাক্‌-ব্রিটিশ বৌদ্ধ মঠকেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় অঙ্ক শেখার যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল বাংলার পাঠশালাগুলিতেও সেই একই পদ্ধতিতে অঙ্ক শেখানো হত। বার্মায় অঙ্ক কষা হত হয় মাটিতে বা ধুলোয় বা কালো 'পরবাইক' নামে একরকম মোটা অমসৃণ দেশজ কাগজে। এই কাগজে একরকম নরম খড়ি দিয়ে লেখা হত যা সহজেই মুছে ফেলা যেত।[৮৫] এইসব পরোক্ষ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে একথা হয়ত বলা যায় যে, বাংলা পাঠশালা শিক্ষা, হয়ত টোল-শিক্ষাও বহুল পরিমাণে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবেই গড়ে উঠেছিল। পার্থিব

বিষয়ের পড়াশুনা এবং ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যদের পড়ার সুযোগ নিশ্চয়ই বৌদ্ধযুগে অনেক বেশি প্রসারিত হয়েছিল প্রাক্-বৌদ্ধযুগের তুলনায়। তাই বলে প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ মঠগুলি গ্রাম্য পাঠশালার ভূমিকা পালন করত এই সিদ্ধান্তে আসার মত যথেষ্ট তথ্য কিন্তু পাওয়া যায় না। অন্তত প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ মঠে লেখা, পড়া এবং অঙ্ক শেখানো হত, এরকম নজির কোথাও নেই। বার্মা ও সিংহলের বৌদ্ধ মঠগুলিতে পরবর্তী কোন এক সময় লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার প্রথা চালু হয়ে থাকতে পারে।

দণ্ডমানব ও অন্তেবাসী

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে পাণিনির আমলেও দু'ধরনের পড়ুয়া ছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। আগ্রওয়ালা লিখছেন যে, তখন 'দণ্ডমানব' ও 'অন্তেবাসী' এই দুই শ্রেণীর ছাত্র ছিল।[৮৩] দণ্ডমানবদের ছোট করে শুধু 'মানব'ও বলা হত। পতঞ্জলির মতে এরা শিক্ষানবিশ এবং বেদপাঠের জন্য উপনীত নয়। পরবর্তী ভাষ্য তত্ত্ববোধিনীর মতে উপনয়ন হয়নি এমন ছাত্রদের 'দণ্ডমানব' বলে।[৮৪] মাতঙ্গ জাতকে 'মানব'দের কমবয়সী 'বালা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 'অন্তেবাসী' হচ্ছে আচার্যের দ্বারা উপনীত ছাত্র। পড়ুয়া অর্থে 'ছাত্র' কথাটা পাণিনিই প্রয়োগ করেন। গুরুর ছত্রবিশেষ বলে শিষ্য ছাত্র। এখন গুরুগৃহে বাস অর্থে 'অন্তেবাসী' বোঝালে দেখা যাচ্ছে সে আমলেও দু'ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল।

এদিকে আই সিনের বিবরণে দেখি, 'মানব' বলা হচ্ছে তাদের যারা শ্রমণ হওয়ার বাসনায় ধর্মীয় শিক্ষা নিচ্ছে। আর ব্রহ্মচারী বলা হচ্ছে তাদের যারা পার্থিব বিষয় শিক্ষা করছে। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার যে ছবি আমরা বিভিন্ন প্রাচীন উপাদান থেকে পাই তার সঙ্গে কিন্তু আই সিনের বিবরণ মিলছে না। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় ব্রহ্মচারী বলা হয় তাদের যারা উপনয়নের পর সংসারধর্ম পালনের আগে পর্যন্ত গুরুগৃহে থেকে পড়াশুনা করে, বিশেষ করে বেদপাঠ করে। আগ্রওয়ালা পাণিনি, পতঞ্জলি ও তত্ত্ববোধিনী থেকে যে ছবি এঁকেছেন তাতে দেখি 'দণ্ডমানব' হচ্ছে উপনয়ন ছাড়া যারা পড়াশুনা করছে অর্থাৎ যারা ধর্মীয় শিক্ষা নিচ্ছে না, তারা। আর 'ব্রহ্মচারী' হচ্ছে 'অন্তেবাসী' যারা গুরুগৃহে থেকে

ধর্মীয় শিক্ষা নিচ্ছে। মন্ডেলিকারা অচ্যুথন অবশ্য পাণিনীয় দণ্ডমানবের কোন উল্লেখ করেননি। তিনি শুধু অন্তেবাসীর কথাই বলেছেন।[৮৮]

এই গরমিলের একটা সুরাহা হয়ত এভাবে করা যায়। ধর্মসূত্র ও গৃহ্যসূত্রের সাক্ষ্যে দেখা যায়, সূত্রযুগে উপনয়নের আগে বা বেদ অধ্যয়নের আগে অন্য শাস্ত্র পড়া ছিল নিষিদ্ধ। মনুতে দেখি, "যে ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্রে পরিশ্রম করে সে অতি শীঘ্র জীবিত অবস্থাতেই সন্তান-সন্ততিসমেত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।"[৮৯] মেধাতিথি, যিনি অনেক পরের লোক, তিনি তাঁর ভাষ্যে লিখছেন, "আর দ্বিজ···এইরূপ বলায় উপনয়ন হইয়াছে তাহারই অধ্যয়ন সম্বন্ধে এইপ্রকার ক্রমসম্বন্ধীয় নিয়ম। কাজেই উপনয়নের পূর্বে যদি কেহ শিক্ষা, ব্যাকরণ প্রভৃতি বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করে যাহাতে বেদবাক্য মিশ্রিত নাই তবে তাহা নিষিদ্ধ নহে।"[৯০] তত্ত্ববোধিনীও অনেক পরের রচনা। সেখানেও যদি দণ্ডমানবকে উপনয়নহীন ছাত্র বলা হয়ে থাকে তাহলে অনুমান হয় প্রাক্-উপনয়ন ব্যাকরণ ইত্যাদি শিক্ষা তখন সমাজে চালু ছিল। আর বেদপাঠের জন্য এগুলি শিখতে হত। ফলে পরবর্তী ভাষ্যকার আর টীকাকাররা প্রাক্-উপনয়ন সংস্কৃত শিক্ষাকে বৈধ করার তাগিদে স্মৃতির ঐরকম ভাষ্য বা টীকা করেছেন। মনুর আমলে যে বেদ মুখস্থ না করে বেদাঙ্গ পড়া যেত না সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। অথচ রঘুনন্দন বিদ্যারম্ভের পরই বেদাঙ্গ পড়ার বিধান দিয়েছেন। পরবর্তী টোল-চতুষ্পাঠীর শিক্ষার যে বর্ণনা মধ্যযুগের সাহিত্যে পাই, তাতে মনে হয় এই পরিবর্তন প্রাচীন স্মৃতিযুগের পরই শুরু হয়েছিল।

এইসব নানা দিক বিবেচনা করে মনে হয় আই সিনের দেওয়া বিবরণ ও বৌদ্ধ আমলের পার্থিব শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পরবর্তী টোল-চতুষ্পাঠীর উৎস খোজার চেষ্টা করা যায়। গুরুগৃহ বা তপোবন আশ্রম থেকে টোল-চতুষ্পাঠীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাধারার রূপান্তরের পথে হয়ত বৌদ্ধ মঠের শিক্ষাধারা একটা ধাপ। টোল-চতুষ্পাঠীর শিক্ষায়ও দেখা যায় কাব্য-ব্যাকরণের প্রাধান্য। পঞ্চবিদ্যার বিষয়গুলি টোলের শিক্ষারও বিষয়। আর গুরুগৃহে বেদপাঠের যে প্রাধান্য তা টোলের শিক্ষায় নেই বললেই চলে। বিশেষ করে বাংলার টোলগুলি সম্পর্কে একথা খুবই ঠিক। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গেই অবশ্য শিক্ষার এই পরিবর্তন ঘটেছে। তবে এখানে সে আলোচনার অবকাশ নেই। বৌদ্ধ মঠের শিক্ষাধারার সঙ্গে পাঠশালা শিক্ষার মিল কিন্তু বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। পাঠশালা শিক্ষার উৎস বৌদ্ধ মঠের শিক্ষাধারায় খুঁজে

পাওয়া যায় না বলেই আমার মনে হয়। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন আলাদা কোন শিক্ষাধারা সে আমলে গড়ে উঠেছিল, এমন তথ্যের বড়ই অভাব দেখা যায়। বরঞ্চ গৃহশিক্ষক বা কোন গুরুর কাছে উঁচুশ্রেণীর লোকের সাধারণ লেখা আর অঙ্ক শেখার উদাহরণ পাওয়া যায়।

রাজতরঙ্গিণী ও শূদ্রের লেখাপড়া

আমাদের আলোচনায় দেখা গেছে এমনকি সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতেও লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার প্রাক্‌-উপনয়ন শিক্ষাধারা কোন প্রথাবদ্ধ সাধারণ রূপ নেয়নি। যদিও সীমাবদ্ধভাবে বিভিন্ন বর্ণ বা শ্রেণীর লোকের মধ্যে, বিশেষ করে, রাজা-রাজড়া আর শ্রেষ্ঠী-মহাজনদের মধ্যে এধরনের শিক্ষা কিছুটা চালু ছিল। ব্রাহ্মণরা এধরনের শিক্ষায় অংশ নিত এমন কোন নজির চোখে পড়ে না। স্মৃতির উপাদানগুলিও এরকম সিদ্ধান্তকেই জোরদার করে। বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যে যে লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার রেওয়াজ কিছুটা চালু হচ্ছিল তার নজির অবশ্য সামান্য হলেও পাওয়া যায়।

এপ্রসঙ্গে কলহনের রাজতরঙ্গিণীর একটি ঘটনা আলোচনার দাবি রাখে। কলহনের বিবরণে দেখি, পথে পাওয়া একটি বাচ্চাকে শূদ্রা-ধাত্রী মানুষ করে। লেখাপড়া শিখে সে কোন এক গৃহস্থের বাড়ীতে বাচ্চাদের শিক্ষক নিযুক্ত হয়।[৮১] দু'দিক দিয়ে ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। এক, শূদ্রা-ধাত্রীর কাছে মানুষ হয়েও সে লেখাপড়া শিখেছে। দুই, সে গৃহশিক্ষকের কাজ করে। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে, তখন শূদ্রের লেখাপড়া শেখা একেবারে অসম্ভব ছিল না। বরঞ্চ তার শিক্ষকতা করা থেকে অনুমান হয়, সমাজে শূদ্রের লেখাপড়া শেখা স্বীকৃত ছিল। এখানেও কিন্তু পাঠশালা বা লিপিশালার মত কোন প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ নেই। তবে সে সময় লেখাপড়া শেখার ধারা যে বেশ চালু হয়েছিল, তা বোঝা যায়। কলহন ১২ শতকের লোক। ঘটনাটি ঘটেছিল অবন্তী বর্মণের আমলে। অবন্তী বর্মণের রাজত্বকাল ধরা হয় খ্রীস্টীয় ৮৫৫-৫৬ থেকে ৮৮৩ সাল পর্যন্ত।[৮২] রাজতরঙ্গিণীর সাক্ষ্য অনুযায়ী বলতে হয় খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীতে লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার ধারা প্রচলিত ছিল। তবে নয় শতকের ঘটনা বার শতকে লেখা, কাজেই সময়ের একটু এদিক ওদিক হতেই পারে। বার শতকে যদি হাতেখড়ি বা বিদ্যারম্ভ সংস্কারের

উল্লেখ পাওয়া যায় তাহলে দশ, এগার শতকে প্রাক্-উপনয়ন লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার রেওয়াজ বেশ চালু হয়েছিল এরকম সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই করা যায়। রাজতরঙ্গিণীর নজির আমাদের এই সিদ্ধান্তকেই জোরদার করে।

আলবেরুণী এগার শতকের ভারত-সম্পর্কে যে বিবরণ লিখেছেন তাতেও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়। আলবেরুণী ভারতের বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষার অক্ষরের উল্লেখ করেছেন যার অনেকগুলি সেই নামেই এখনো পরিচিত। তিনি 'সিদ্ধমাতৃকা', 'নাগর', 'অর্দ্ধনাগরী', 'মালওয়ারী', 'সৈন্ধভ', 'কর্ণাট', 'কানাড়া', 'আন্ধ্রী', 'দ্রাভিদি', 'লারদেশ, 'গৌড়ী', 'ভৈক্ষুকী', প্রভৃতি নানা আঞ্চলিক অক্ষরের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে পূর্বদেশে গৌড়ী অক্ষর প্রচলিত ছিল।[১৩] এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, ললিত-বিস্তরে বঙ্গলিপির উল্লেখ থাকলেও গৌড়ীলিপির কোন উল্লেখ নেই। আলবেরুণী কিন্তু বঙ্গলিপির উল্লেখ করেননি। আলবেরুণী হিন্দু অঙ্কের কথা উল্লেখ করেছেন এবং হিন্দুরা এ-বিষয়ে আলবেরুণীর দেশের চেয়ে এগিয়ে ছিল সেকথাও স্বীকার করেছেন।[১৪] তিনি আরো জানাচ্ছেন যে, হিন্দুরা বই লেখা শুরু করে ওম বা ॐ এই চিহ্ন দিয়ে। শিশুরা স্কুলে শ্লেটে লিখত সেকথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।[১৫] বোঝা যায়, সে সময় লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার রেওয়াজ বেশ চালু ছিল।

মৌর্য আমলেও লেখা আর অঙ্ক শেখার কিছুটা চল ছিল হয়ত। তবে তা ছিল সম্ভবত অব্রাহ্মণ অল্পকিছু উঁচুশ্রেণীর লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর তা সাধারণ প্রথাবদ্ধ রূপ নিয়েছিল অনেক পরে। লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার প্রথাবদ্ধ ধারায় অব্রাহ্মণের প্রাধান্যও খুবই স্বাভাবিক।

প্রাক্-উপনয়ন শিক্ষার দুই ধারা

গুপ্তযুগে বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে লেখাপড়ার রেওয়াজ যে বাড়ছিল সে বিষয়ে বোধ করি সন্দেহ নেই। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বেদবাদী বর্ণভেদ কিছুটা শিথিল হয়ে পড়েছিল বলেই মনে হয়। বিশেষ করে বৌদ্ধ তার্কিকদের আক্রমণে যজ্ঞাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্যধর্মও পরিবর্তিত হচ্ছিল। বৌদ্ধমত খণ্ডনের তাগিদে ন্যায় ও অন্যান্য বিদ্যার চর্চা প্রাধান্য পাচ্ছিল। ফলে ব্রাহ্মণদের পক্ষে আর বেদ মুখস্থ করার মধ্যেই পড়াশুনাকে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব ছিল না। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার এই পরিবর্তন কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা খাতে বইছিল। এর সঙ্গে শূদ্রের বা বৈশ্যের

লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার বিশেষ সম্পর্ক দেখা যায় না। তবে মৌর্য ও গুপ্ত যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির প্রসার, মুদ্রার প্রচলন ও উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন যে এই দুই শিক্ষাধারার পরিবর্তনেরই কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মৌর্যযুগেই লিপিকার ও করণিক হিসাবে কায়স্থের উদ্ভব হয়েছিল। অশোকের শিলালেখে পশুহত্যা বন্ধ করার অনুজ্ঞা দেখে বোঝা যায় যজ্ঞের দাপট কমছিল। ব্রাহ্মণের যজ্ঞরক্ষকের ভূমিকা থেকে অধ্যাপক, নৈয়ায়িক ও কৃষিজমির মালিকের ভূমিকাই কালে কালে বড় হয়ে উঠছিল।[৯৩] যজন যাজনের অর্থও পাল্টে যাচ্ছিল। যজ্ঞ থেকে পূজা প্রাধান্য পাচ্ছিল। পূজার মন্ত্রে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাবও লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে হিসেব রাখা, নথিপত্র, দানপত্র, শিলালেখ, তাম্রশাসন ইত্যাদির লিপিকার হিসাবে কায়স্থ ও করণিক প্রভৃতি পেশা ছিল বৈশ্য ও শূদ্রের একচেটিয়া। ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখায় তাদেরই ছিল প্রাধান্য। ব্রাহ্মণ্যশিক্ষা বেদের আঙ্গিনা ডিঙ্গিয়ে গেলে ব্রাহ্মণদের মধ্যেও লেখা ও পুঁথির ব্যবহার শুরু হয়। প্রাক্‌-উপনয়ন শিক্ষারও প্রচলন দেখা দেয়। তবে তা সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার প্রাথমিক ধাপ হিসাবে আলাদা ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে।

মীমাংসা

এ পর্যন্ত যেসব উপাদান আমরা দেখেছি এবং পরীক্ষা করেছি তা থেকে এরকম কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে, প্রাচীন ভারতে প্রাক্‌-উপনয়ন শিক্ষার কোন সাধারণ প্রথাবদ্ধ ধারা গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন উপাদানগুলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রাক্‌-উপনয়ন লেখা ও অঙ্ক শেখার কিছু নজির মিললেও ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের প্রাক্‌-উপনয়ন লেখাপড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমনকি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মধ্যেও লেখাপড়া শেখার কোন সাধারণ প্রথাবদ্ধ ধারা চালু ছিল এরকম কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাচীন উপাদানগুলিতে পাওয়া সামান্য সাক্ষ্যের স্বপক্ষে যদি যথেষ্ট পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যেত তাহলেও প্রাচীন ভারতে প্রাক্‌-উপনয়ন সাধারণ শিক্ষাধারার অস্তিত্ব মেনে নেওয়া সম্ভব হত। অশোকের শিলালিপি ও বিদ্যারম্ভ সংস্কারের আলোচনায় দেখা গেছে এগুলিকে পরোক্ষ প্রমাণ হিসাবে পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। অন্য কোন পরোক্ষ প্রমাণের হদিশও মেলে না।

আমরা আমাদের আলোচনায় সংস্কারের, বিশেষ করে বিদ্যারম্ভ-সংস্কারের ইতিহাসের উপর বিশেষ জোর দিয়েছি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে প্রাচীন উপাদানগুলি যথেষ্ট নয় বলেই আমাদের সংস্কারের ইতিহাসের উপর এতটা জোর দিতে হয়েছে। এপ্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, স্মৃতির বিধানগুলি সকলে সমানভাবে মেনে চলত তা না-ও হতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে এগুলি যে বেদবাদী জনগোষ্ঠীর সামাজিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করত এবং প্রচলিত বিভিন্ন প্রথাকে বিধিবদ্ধ করে তুলত সেবিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রাচীনকালে সমাজে বিভিন্ন বর্ণের জরুরি এবং বহুলপ্রচলিত পালনীয় কাজগুলি বিশেষ বিশেষ সংস্কারের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়ে প্রথায় পরিণত হত। প্রাচীন সংস্কারগুলি আসলে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে পালনীয় কর্তব্যগুলি চিহ্নিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্যই তৈরি হয়েছিল। প্রাচীন স্মৃতিগুলিতে প্রাক্-উপনয়ন বিদ্যারম্ভ-সংস্কারের অনুপস্থিতি আর পরবর্তী স্মৃতিতে এর উপস্থিতি দেখে মনে হয় প্রাক্-উপনয়ন লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার সাধারণ প্রথাবদ্ধ ধারার উদ্ভব প্রাচীন স্মৃতিযুগের পরে হয়েছিল।

বিভিন্ন সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে শিক্ষাবিষয়ে যেটুকু জানা যায় তাতে অন্য কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। একটা কথা আছে 'যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে'। সেই মহাভারতেও কিন্তু বিদ্যারম্ভ-সংস্কারের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুখময় ভট্টাচার্যের মতে, মহাভারতে উপনয়নের পরই শিক্ষার শুরু, এরকমই জানা যায়।[৪৭] পালি সাহিত্য, শিলালেখ বা বিভিন্ন পর্যটকের বিবরণ থেকে আমরা নিশ্চয়ই অনেক তথ্য জানতে পারি। কিন্তু প্রাক্-উপনয়ন প্রাথমিকশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ বা প্রথাবদ্ধ ধারার কোন সঠিক চিত্র গড়ে তোলার মতো উপাদান পাওয়া যায় না।

সব দিক বিচার করে, প্রাচীন স্মৃতিযুগের শেষে এবং পরবর্তী স্মৃতির ঠিক আগেই যে প্রাক্-উপনয়ন প্রথাবদ্ধ সাধারণ শিক্ষাধারা গড়ে উঠেছিল, এই অনুমানের ভিত বেশ পাকা বলেই ধারণা হয়। মনে রাখতে হবে শিক্ষার বিষয়ে ক্রমজটিলতা, শিক্ষার বিভিন্ন শাখার বিস্তার, ভাষার বিকাশ, লেখার চর্চা, 'পড়াশুনা' বা 'শুনে পড়া'কে 'লেখাপড়ায়' রূপান্তরিত করছিল।

সেইসঙ্গে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, কৃষিজমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা, লিখিত নথির প্রচলন, হিসাবের জটিলতা লেখা আর অঙ্ক শেখার প্রয়োজনকে বাড়িয়ে তুলছিল। আর এই প্রয়োজনের তাগিদেই তৈরি হয়েছিল দেশজ

পাঠশালা শিক্ষাব্যবস্থা, সম্ভবত, বার শতক নাগাদ। সারা ভারতে একই সঙ্গে একই সময়ে প্রাক্-উপনয়ন প্রথাবদ্ধ শিক্ষা চালু হয়েছিল এমন না-ও হতে পারে। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার প্রথাবদ্ধ ধারার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস রচিত হলে তবেই এবিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা পাঠশালার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

বাংলাদেশে মাতৃভাষায় লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার প্রতিষ্ঠান পাঠশালা বলে পরিচিত। পাঠশালা কথাটার ব্যবহার প্রথম কে করেন বা পাঠশালা-শিক্ষার উদ্ভব ঠিক কবে হয়েছিল তার সঠিক উত্তর এখনো খুঁজে পাইনি। তবে বাংলা পাঠশালার উদ্ভব যে বার শতকের আগে হয়নি আর তার পুরো বিকাশ যে আরো অনেক পরে ষোল সতের শতক নাগাদ হয়েছিল তা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়। কোন ভাষার লিপি একটা সুনির্দিষ্ট রূপ না নেওয়া পর্যন্ত সে ভাষার লিপিশিক্ষার কোন প্রথাবদ্ধ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। কাজেই বাংলা পাঠশালার উৎস সন্ধানে আমাদের বাংলা লিপি, অক্ষর, ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের দিকেও তাকাতে হয়। বাংলা পাঠশালার বিশদ বিবরণের জন্য অবশ্য আমাদের মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, ভ্রমণবৃত্তান্ত ও সরকারি নথিপত্রের উপরই নির্ভর করতে হবে।

বাংলা লিপি, ভাষা ও সাহিত্য

'বঙ্গলিপি'র প্রথম উল্লেখ বুঝি আমরা পাই গৌতম বুদ্ধের জীবনী ললিত-বিস্তরে। লিপিশালা নামে লেখা ও গণনা শেখার প্রতিষ্ঠানের উল্লেখও পাই সেখানে। শিক্ষকের নাম দারকাচার্য বিশ্বামিত্র।[১] সে আমলে বঙ্গলিপি বলে কোন লিপির অস্তিত্ব ছিল এমন সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে আর কোন প্রমাণ কিন্তু পাওয়া যায় না। এমনকি একাদশ শতকের আলবেরুণীর বিবরণে গৌড়ী অক্ষরের উল্লেখ থাকলেও বঙ্গলিপির কোন উল্লেখ নেই।[২] তাছাড়া লিপিশালা নামে স্কুলের উল্লেখও আর কোথাও পাওয়া যায় না। বাংলা অক্ষর ও লিপি নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁরাও ললিত-বিস্তরে বঙ্গলিপির উল্লেখকে বড় একটা গুরুত্ব দেননি। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে বার শতক নাগাদ বাংলা লিপির আধুনিক রূপান্তর সম্পূর্ণ হয়।[৩] রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতেও 'দ্বাদশ

শতাব্দীর শেষে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে তাম্রশাসনের অক্ষর সম্পূর্ণ আধুনিক বাংলা অক্ষরে পরিণত হয়েছে।'[৪] বুহ্‌লারও মোটামুটি একই মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে ১০৮০-৯০ খ্রীস্টাব্দের 'দেওপাড়া প্রশস্তি' এবং ১১৪২ খ্রীস্টাব্দের 'বৈদ্যদেবের ভূমিদান পত্রে'র অনেক অক্ষরই খাঁটি আদি বাংলা অক্ষর। তখনো এগুলি পরিবর্তিত হচ্ছে।[৫] ১৪২০ খ্রীস্টাব্দের দনুজমর্দনদেবের মুদ্রায় বাংলা অক্ষর একেবারে আধুনিক রূপ নিয়েছে দেখা যায়।[৬] ললিত-বিস্তর যে সময় রচিত হয় তখন 'বঙ্গলিপির' অস্তিত্ব অসম্ভব। ছাপা ললিত-বিস্তর যে-সব পুঁথির উপর নির্ভর করে সম্পাদিত সেগুলি আধুনিক। বঙ্গলিপি কথাটি প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে হয়।

এ তো গেল অক্ষরের কথা। মুসলমান অধিকারের আগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অবস্থা কি ছিল সে সম্পর্কেও আমরা খুব কমই জানি। দশ-এগার শতকের চর্যাপদের বাংলা থেকে তের-চৌদ্দ শতকের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাংলা পর্যন্ত ভাষার রূপান্তরের সঠিক হদিশ এখনো পাওয়া যায়নি। বাংলা লেখার ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের সুগঠিত রূপ পাই পনের-ষোল শতকে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে পনের শতকে বাংলা সাহিত্যের ভাষা একটা নির্দিষ্ট রূপ নেয় এবং সমগ্র বাংলা জুড়ে প্রচলিত হতে থাকে।[৭] বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রাখা বাংলা পুঁথির বিবরণগুলিতে চোখ বুলালে দেখা যায় সতের শতকের আগে লেখা বাংলা পুঁথির সংখ্যা খুবই কম।[৮] কাশীরাম দাসের মহাভারত আদি পর্বের একটি পুঁথির লিপিকাল দেখা যাচ্ছে ৯৮৫ (?) বাংলা সাল বা ১৫৭৯ খ্রীস্টাব্দ। অন্য একটি কাশীদাসী মহাভারতের কাল দেখা যাচ্ছে ১০০৭ সাল বা ১৬০০ খ্রীস্টাব্দ।[৯] আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের লিপিকাল দেখা যায় ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দ।[১০] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মোট ৪২৬টি রামায়ণ পুঁথির মধ্যে মাত্র ১২টির লিপিকাল বাংলা ১০০০ থেকে ১১০০ সালের মধ্যে, ৮৩৬টি মহাভারতের পুঁথির ৫৭টির লিপিকাল এই সময়ের মধ্যে আর ২৯১টি ভাগবত পুঁথির ৩০টির লিপিকাল ঐ সময়ে।[১১]

বাংলা ১০০০ সালের আগে লিপি করা মঙ্গলকাব্য বা চরিতকাব্যের খোঁজও পাওয়া যায় না। বাংলা ১০০০ থেকে ১১০০ সালের মধ্যে লিপি করা কিছু পুঁথি পাওয়া গেলেও বেশির ভাগ পুঁথিরই লিপিকাল বাংলা ১১০০ সালের পর। আবার 'শুভংকরী' বা অঙ্কের যেসব পুঁথি পাওয়া গেছে সেগুলিরও লিপিকাল বাংলা ১০০০ সালের আগে নয়।[১২] আসলে ইংরেজি সতের

শতকের আগে লিপি করা বাংলা পুঁথি মাত্র কয়েকটিই পাওয়া গেছে। অথচ সতের শতকে বা তারপর লিপি করা মধ্যযুগের বাংলা পুঁথির ছড়াছড়ি—এই ঘটনাটি কিন্তু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মধ্যযুগের বাংলা কাব্য মূলত হাটে-বাজারে সাধারণ মানুষের মধ্যে গাওয়া হত। গায়েনদের এগুলি মুখস্থ ছিল। এগুলির রচনাকাল যাই হোক সতের শতক নাগাদ এগুলি লিখিত আকার পেতে লাগল বলেই মনে হয়। পাঠশালা শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে এই ঘটনার সম্পর্ক আছে এরকম অনুমান অসঙ্গত নয়। পাঠশালা শিক্ষার প্রসারের ফলে লিখতে জানা লোকের সংখ্যা নিশ্চয়ই বাড়ছিল। বাংলা কাব্যগুলি লিপি করার প্রথাও সেই সঙ্গে চালু হয়েছিল বলেই অনুমান করি। আরো দেখা যায় যে, বাংলা কাব্য ও স্মাখতগুলির লিপিকারদের একটা বড় অংশই ব্রাহ্মণ নয় এমন নীচুবর্ণের ও শ্রেণীর মানুষ। এমনকি এগুলির রচনাকারদের একটা বড় অংশ এইসব নীচু-শ্রেণী ও বর্ণের লোক। আবার পাঠশালার গুরুমশায় বা পড়ুয়াও প্রধানত এরাই। তাছাড়া মধ্যযুগের বাংলা পুঁথির মালিকও বলতে গেলে এরাই। ব্রাহ্মণ 'পড়ুয়াদের খুঙ্গিতে থাকিত অমর, জুমর, মাঘ, নৈষধ, রঘু, পিঙ্গল, রামায়ণ প্রভৃতি হাতে লেখা পুঁথি'। আর 'ব্রাহ্মণেতর জাতিদের' পাঠশালার অবলম্বন ছিল বাংলা পুঁথি।[১০] এইসব দেখে পাঠশালা শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে বাংলা পুঁথি লিপি করার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

সতের শতকের আগে লিপি করা কোন বাংলা পুঁথিতে হাতেখড়ি বা পাঠশালার উল্লেখ আছে বলে আমি জানি না। আবার সতের শতকে লিপি করা বাংলা পুঁথিতেও পাঠশালার উল্লেখ বড় একটা পাওয়া যায় না; যদিও হাতেখড়ির উল্লেখ পাওয়া যায়। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে হাতেখড়ির উল্লেখ আছে কিন্তু পাঠশালার উল্লেখ নেই। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে অবশ্য পাঠশালার উল্লেখ আছে। কিন্তু চৈতন্যজীবনীগুলিতে চৈতন্যের লেখাপড়ার যে বর্ণনা পাই তার সঙ্গে বাংলা পাঠশালার খুব একটা মিল নেই। এমনকি মঙ্গলকাব্যগুলিতেও বাল্যশিক্ষার যে বিবরণ পাওয়া যায় তার সঙ্গে পরবর্তী পাঠশালা শিক্ষার অনেক তফাৎ। আবার প্রায় সব মঙ্গলকাব্যেই হাতেখড়ির উল্লেখ আছে কিন্তু পাঠশালার উল্লেখ সবগুলিতে দেখা যায় না। এইসব দেখে সতের শতককে বাংলা পাঠশালা শিক্ষার যুগ-সংক্রান্তি কাল বলেই ধারণা হয়। মধ্যযুগের বাংলা কাব্য-সাহিত্যে হাতেখড়ি ও পাঠশালার বিবরণ তাই বিশদ আলোচনার দাবি রাখে।

হাতেখড়ি ও নব্যস্মৃতি

প্রাচীন ভারতে উপনয়নের পরই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শিক্ষা শুরু হত। শূদ্রের উপনয়নে অধিকার ছিল না কাজেই শিক্ষারও অধিকার ছিল না। উপনয়ন হত সাধারণত ব্রাহ্মণের আট বছর বয়সে, ক্ষত্রিয়ের এগার বছর বয়সে আর বৈশ্যের বার বছর বয়সে।[১৪] প্রাক্-উপনয়ন লিপি বা গণনা-শিক্ষার কিছু নজির পাওয়া গেলেও হাতেখড়ি বা বিদ্যারম্ভ-সংস্কারের কোন উল্লেখ খ্রীস্টীয় বার শতকের আগে পাওয়া যায় না। প্রাক্-উপনয়ন শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে হাতেখড়ি সংস্কারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ধরে নিয়ে বলা যায় হাতেখড়ি সংস্কারের প্রচলনের পরই প্রাক্-উপনয়ন প্রথাবদ্ধ পাঠশালা শিক্ষার উদ্ভব হয়েছিল। এবিষয়ে আমরা আলাদা আলোচনা করেছি, কাজেই এখানে উল্লেখ মাত্র করা হল।

বাংলাদেশে স্মৃতি-চর্চার পুরোধা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য তার 'জ্যোতিস্তত্ত্বম্'-এ বিদ্যারম্ভ-সংস্কারের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। রঘুনন্দন, চৈতন্যের সমসাময়িক ষোল শতকের লোক বলেই জানা যায়।[১৫] তাহলে বিদ্যারম্ভ বা হাতেখড়ি-সংস্কার তার কিছু আগে থেকে বাংলায় প্রচলিত ছিল বলেই ধরে নেওয়া যায়। রঘুনন্দনের আগের কোন বাঙালি স্মৃতিকার বিদ্যারম্ভ-সংস্কারের উল্লেখ করেছেন বলে আমার জানা নেই। আবার বার শতকের আগের কোন স্মৃতি বা নিবন্ধে বিদ্যারম্ভ-সংস্কারের উল্লেখ আছে বলেও জানা যায় না। বার শতকে অপরার্ক মার্কণ্ডেয় পুরাণকে সাক্ষী মেনে বিদ্যারম্ভ-সংস্কারের উল্লেখ করেছেন।[১৬] অপরার্ক অবশ্য বাংলার লোক নন। বাংলায় সাধারণত রঘুনন্দনের বিধানই মেনে চলা হয়। দেখা যাচ্ছে রঘুনন্দন ও চৈতন্যের সময় বাংলায় হাতেখড়ি বা বিদ্যারম্ভ-সংস্কার বিশেষ প্রচলিত ছিল। পাঁচ বছর বয়সে হাতেখড়ি বা বিদ্যারম্ভ-সংস্কারের পর শিশুদের লেখাপড়া শুরু হত। মুসলমানদের মধ্যেও এ ধরনের সংস্কার প্রচলিত ছিল। মুসলমান শিশুদের বার বছর চার মাস চার দিন বয়সে বিসমিল্লা-সংস্কার হত।[১৭] আর তারপরই তাদের লেখাপড়া শুরু হত।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হাতেখড়ি বা বিদ্যারম্ভের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে 'বিদ্যারম্ভ' কবে থেকে 'হাতেখড়ি' হল সেবিষয়ে সঠিক জানা যায় না। ধারণা হয় বাংলা লেখাপড়ার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গেই হাতেখড়ি কথাটা চালু হয়েছিল। অনুমান করি বাংলা লেখাপড়ায় অব্রাহ্মণের প্রাধান্যই বাংলা 'হাতেখড়ি' কথাটির প্রচলনের কারণ। ব্রাহ্মণ স্মৃতিকাররা সংস্কৃত 'বিদ্যারম্ভ'

কথাটিই ব্যবহার করেছেন। হাতেখড়ি কথার প্রচলন দেখে বোঝা যায় আগে লেখা পরে পড়ার পদ্ধতিই বাংলা পাঠশালায় চালু ছিল। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত শিক্ষাধারায় কিন্তু আগে পড়া পরে লেখা হত। আসলে 'লেখাপড়া' আর 'পড়াশুনা' কথা দুটির তাৎপর্য অনেক গভীর। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, রঘুনন্দনের 'জ্যোতিস্তত্ত্বম্'-এ বিদ্যারম্ভ-সংস্কারের বিবরণে এটা দ্বিজের সংস্কার এরকম উল্লেখ নেই; যদিও চূড়াকরণ ও উপনয়ন-সংস্কার দ্বিজাতির সংস্কার বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ্যারম্ভ প্রসঙ্গে এই অনুল্লেখ থেকে বোঝা যায় শূদ্রেরও এই সংস্কার হতে বাধা ছিল না। সঙ্গত কারণেই ধরে নেওয়া যায় শূদ্রের লেখাপড়া তখন অপ্রচলিত ছিল না। এখানে বলে রাখা দরকার যে বার শতকের বাংলার স্মৃতিকার হলায়ুধ তার 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বম্'-এ যে দশটি সংস্কার ব্রাহ্মণের করণীয় বলেছেন তাতে 'বিদ্যারম্ভ'-সংস্কারের উল্লেখ নেই।[১৮] বোঝা যাচ্ছে তখনো বাংলায় ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রাক্-উপনয়ন লেখাপড়া তেমন প্রচলিত ছিল না। বাংলা অক্ষর ও পুঁথির ইতিহাস থেকে বোঝা যায় বাংলা লেখাপড়ার প্রচলনও তেমন ছিল না। এবার দেখা যাক মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হাতেখড়ি ও পাঠশালা শিক্ষার কি খবর পাওয়া যায়।

চৈতন্যজীবনী ও লেখাপড়া

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যের হাতেখড়ি ও লেখাপড়ার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন—

> শুভদিনে শুভক্ষণে মিশ্র পুরন্দর।
> হাতেখড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর॥
> কিছু শেষে মিলিয়া সকল বন্ধুগণ।
> কর্ণবেধ করিলেন শ্রীচূড়াকরণ॥
>
> *　　*　　*
>
> কি মাধুরী করি প্রভু 'ক, খ, গ, ঘ'-বোলে।

পড়িয়া শুনিঞা সর্ব্ব শিশুগণ সঙ্গে।
গঙ্গা স্নানে মধ্যাহ্নে চলেন বহু রঙ্গে ॥
*　　*　　*
লিখন কালীর বিন্দু শোভে গৌর অঙ্গে।[১৯]

এই বিবরণে দেখি হাতেখড়ির পর কর্ণবেধ ও চূড়াকরণ হচ্ছে। সাধারণত তিন বছর বয়সে চূড়াকরণ তারপর কর্ণবেধ এবং পাঁচ বছর বয়সে বিদ্যারম্ভ বা হাতেখড়ি হয়ে থাকে। চূড়াকরণ, কর্ণবেধ ও বিদ্যারম্ভের বিধিসম্মত নিয়ম তাই। রঘুনন্দন এবং অন্যান্য স্মৃতিকাররাও তাই বলেছেন। যদিও পাঁচ বছর বয়সে গৌণকালে চূড়াকরণ করা যেতে পারে এরকমও বলা আছে।[২০] দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীতে দেখি পাঁচ বছর বয়সে ধনপতির কর্ণবেধ ও চূড়াকরণ হয়েছিল।[২১] আরো একটি লক্ষ করার বিষয় চৈতন্য লেখাপড়ার সঙ্গে অঙ্ক শিখেছিলেন কিনা তার কোন উল্লেখ নেই। পাঠশালা কথাটারও বড় একটা উল্লেখ পাই না। তবে লেখার কালীর ব্যবহার ছিল তা দেখা যাচ্ছে। অবশ্য এটা লিপিকারের সময়ের ঘটনাও হতে পারে। এরপর গৌরাঙ্গের পৈতে আর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে শাস্ত্র পড়তে যাওয়া। মনে হয় হাতেখড়ির পর তিনি লিপিশিক্ষাই করেছিলেন। সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার জন্যও লিপির অভ্যাস দরকার হত। অন্তত বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের বিবরণ থেকে পাঠশালা-শিক্ষার যে ধারা আমরা পরবর্তী যুগে দেখি, তার কোন পরিচয় পাই না। তবে হাতেখড়ি সংস্কারের চল দেখে ধারণা হয় ব্রাহ্মণদের মধ্যেও প্রাক্-উপনয়ন লিপিশিক্ষা চালু ছিল। এ প্রসঙ্গে খেয়াল রাখা দরকার যে মধ্যযুগের বাংলায় বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত পুঁথি লেখা হত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে লিখেছেন, 'কথো দিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল। / অল্পদিনে দ্বাদশ কলা অক্ষর শিখিল॥' বৃন্দাবনদাস যে চৈতন্যের বিদ্যাশিক্ষা বিস্তারিয়া বলেছেন তাও কৃষ্ণদাস বললেন। তারপর বললেন, 'গঙ্গাদাস-পণ্ডিত স্থানে পড়ে ব্যাকরণ / শ্রবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ॥ / অল্প কালে হৈল পঞ্জী টীকাতে প্রবীণ। / চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন॥'[২২] চরিতামৃতে কিন্তু পাঠশালার কোন উল্লেখ নেই। আর নতুন কোন বিশেষ খবরও তাতে পাই না। গৌরাঙ্গের উপনয়ন সম্পর্কেও কোন কথা নেই। তবে 'শ্রবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ' পাঠ থেকে মনে হয় চৈতন্যের আমলেও শুনে শেখার চল ছিল। পুঁথির প্রচলন থাকলেও পুরনো গুরুমুখী শুনে

শেখার ঐতিহ্য সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার আঙিনা জুড়ে ছিল। পাঠশালায় সর্দার পড়ুয়ার সঙ্গে সুর করে পাঠ মুখস্থ করার রেওয়াজও সম্ভবত এই ঐতিহ্যের প্রভাবে গড়ে উঠেছিল।

আর একখানি বই চূড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গবিজয়ে নদীয়া সম্পর্কে জানা যায় যে—

জতেক ব্রাহ্মণ পরম শুদ্ধ মন
পণ্ডিত সদাচার অতি
যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন
দান প্রতিগ্রহ নিতি ॥
নদীয়া মহাস্থান গঙ্গা সন্নিধান
বসএ জত জত জাতি।

* * *

বৈদ্য আয়ুর্বেদ চিকীছা মহাভেদ
বিশারদ উপাধ্যায়।
কায়স্থ সদাচার স্থাখত বিচার[২৩]

এখানে 'স্থাখতের' উল্লেখ পাই অথচ পাঠশালার উল্লেখ নেই। তবে কায়স্থরাই যে স্থাখত বিচার করত একথায় বুঝি লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার শিক্ষাধারার সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পরবর্তীকালের অনেক নথিতে পাঠশালায় কায়স্থদের প্রাধান্যের প্রমাণ আছে।[২৪] যাইহোক, গৌরাঙ্গবিজয়ে গৌরাঙ্গের চূড়াকরণের ও কর্ণবেধের খবর পাই কিন্তু হাতেখড়ি বা বিদ্যারম্ভের কথা পাই না। তবে উপনয়নের আগেই গৌরাঙ্গ 'পড়িবারে চলি যাএ হাতে করি পুথী।' 'গঙ্গাদাস চক্রবর্তী স্থানে ছয় মাসের বিদ্যা গৌর পড়ে ছয় দিনে।' কাব্য, স্মৃতি, বেদান্ত সব শেষ করে বিচারে নদীয়ার সব পণ্ডিতকে পরাজিত করে। তারপর 'পীড়াএ বসিয়া মিশ্র গঙ্গাদাসে কএ / দিন করি বিশ্বাম্ভরে দেহ উপনএ'। একটা জিনিস লক্ষ করা যায় যে মধ্যযুগের বাংলায় উপনয়নের সঙ্গে শিক্ষার খুব একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। উপনয়ন ততদিনে শুধুমাত্র সংস্কার হিসাবেই পালিত হচ্ছিল। দীক্ষাগুরু আচার্য আর শিক্ষাগুরু উপাধ্যায় বা অধ্যাপকের ভূমিকা ছিল আলাদা। বেতনের বিনিময়ে যিনি পড়ান তিনি উপাধ্যায়। মনুস্মৃতি মতে আচার্য উপাধ্যায়ের চেয়ে দশ গুণ বেশি সম্মানিত।[২৫] মনে রাখতে হবে গুরুদক্ষিণা আর বেতন এক জিনিস নয়। প্রাচীন স্মৃতিযুগে

শিক্ষা দান করা হত। বেতন নিয়ে শিক্ষা দেওয়া ভালো চোখে দেখা হত না। গৌরাঙ্গবিজয়ে উপাধ্যায়ের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় শিক্ষকতা ব্রাহ্মণদের একটি জীবিকাবিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাইহোক, গৌরাঙ্গবিজয়ে চূড়াকরণের সময় নানা আয়োজনের বর্ণনায় 'পাটশাল মেলা মার্জন করিয়া সুন্দর' এই কথা পাই। এখানে পাটশাল বলতে বসার আসন বা ঠাকুরঘর বোঝাচ্ছে।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীহট্ট এবং নদীয়ার যে বর্ণনা আছে তাতে কিন্তু পাঠশালার উল্লেখ পাই। নদীয়া খণ্ডে শ্রীহট্টের বর্ণনায় দেখি—

> শ্রীহট্ট দেশের মধ্যে জয়পুর গ্রাম।
> সর্ব্ব সুখময় স্থান ক্ষিতি অনুপাম॥
> দীঘি সরোবর কূপ তড়াগ সোপান।
> দেউল দেহারা মঠ নানা পুষ্পোদ্যান॥
> সুতার শঙ্খম ঘর নগর চাত্তর।
> ইষ্টকারচিত দ্বার প্রাচীর ভিতর॥
> নাটশাল পাঠশাল চৌখণ্ডী বাঙ্গালী
> ধ্বজ কল হংস পারাবত করে কেলি॥

আর নদীয়ার বর্ণনায় পাই—

> নাট পাঠশাল দীঘি সরোবর
> কূপ তড়াগ সোপান।[২০]

এই সঙ্গে শচীর কুমারদের লেখাপড়া প্রসঙ্গে যে খবর পাওয়া যায় তা হচ্ছে—

> কর্ণবেধ করাইল শচীর কুমারে
> *   *   *
> চূড়ামঙ্গলিয়া করিল চূড়াকর্ম্ম॥
> বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর দুই শচীপুত্র।
> শুভক্ষণে বিশ্বরূপে দিল যজ্ঞসূত্র॥
> সুন্দর সুবুদ্ধি বিশ্বরূপ মহামতি।
> পড়িয়া শুনিয়া হইলা কণ্ঠে সরস্বতী॥[২১]

বিশ্বরূপের লেখাপড়ার এই বিবরণে হাতেখড়ির উল্লেখ নেই। তবে পৈতের পর বিশ্বরূপ 'পড়িয়া শুনিয়া হইলা কণ্ঠে সরস্বতী'। কিন্তু বিশ্বম্ভর বা চৈতন্যের লেখাপড়ার যে বিবরণ আছে তাতে দেখা যায় পৈতের আগেই সে শাস্ত্রপাঠ করেছে।

আর দিন প্রভাতে ভোজন করি রঙ্গে।
পড়িতে ওঝার বাড়ী গেলা শিশু সঙ্গে ॥
ক খ আঙ্ক আস্থ সিদ্ধি অষ্ট ধাতু পড়ি।
অষ্ট শব্দি পড়িয়া ছাড়িল রাম খড়ি ॥
সুবন্ত জ্ঞান কার পড়িল ষট্‌কারক।
সটীক কলাপ পড়ি সভার ব্যাপক ॥
নবদ্বীপে বিতপত্তি পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
তাহার মন্দিরে কৈল বিদ্যার প্রকাশ ॥
চন্দ্র সারস্বত নব কাব্য নাটকে।
স্মৃতি তর্ক সাহিত্য পড়িল একে একে ॥[২৮]

তারপর 'গর্ভাষ্টমে যজ্ঞসূত্র দিল বিশ্বম্ভরে। / আনন্দিত নবদ্বীপ প্রতি ঘরে ঘরে ॥' গৌরাঙ্গের পৈতে প্রসঙ্গে কয়েকটি নতুন খবর জানা যায়। মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী মন্ত্রগুরু হিসেবে তার পৈতে দেন।

গুরু মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী।
যজ্ঞ সূত্র দিয়া কর্ণে কহিল গায়ত্রী ॥[২৯]

আর পৈতের পর তাঁর দুই শিক্ষাগুরু সুদর্শন পাত্র আর গঙ্গাদাস চক্রবর্তী তাঁকে আশীর্বাদ করেন।

সুদর্শন গঙ্গাদাস দুই বিদ্যাগুরু।
আশীর্ব্বাদ দিতে আইলা রত্নমালা ছিরু ॥
গুরু গুরুপত্নীরে হইলা নমস্কার।
দিব্যমূর্ত্তি দেখি সভার মনে চমৎকার ॥[৩০]

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে নদীয়া খণ্ডে চৈতন্যের হাতেখড়ির উল্লেখ না থাকলেও উত্তর খণ্ডে হাতেখড়ি সম্পর্কে বলা হয়েছে—'সুদর্শন পণ্ডিত হাথে দিল খড়ি। / চৈতন্যের গুতে মারিল পুথি বাড়ি ॥'[৩১] তারপর হল কর্ণবেধ আর শেষে 'শুভক্ষণে চূড়া উপনয়ন করিল'। দেখা যাচ্ছে পৈতের আগেই চৈতন্যের শিক্ষা শুরু হয়। সুদর্শন পাত্র বা ওঝার কাছে ক খ আঙ্ক আস্ক শিক্ষা করেন। আর শাস্ত্রপাঠ করেন গঙ্গাদাস চক্রবর্তীর কাছে। এও দেখা যাচ্ছে পৈতের সঙ্গে লেখাপড়ার কোন সম্পর্ক নেই। মন্ত্রগুরু আর বিদ্যাগুরু আলাদা। আবার প্রাথমিকশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার গুরু ভিন্ন লোক। নদীয়া খণ্ডে পাঠশালার উল্লেখ থাকলেও বিশ্বরূপ বা বিশ্বম্ভর পাঠশালায় গিয়ে লেখাপড়া

করেছেন এরকম কোন কথা নাই। এমনকি টোল চতুষ্পাঠীরও কোন উল্লেখ দেখি না। তবে শিক্ষার যে বর্ণনা পাই তাকে টোলের শিক্ষার সঙ্গেই তুলনা করা যায়।

লোচনদাস তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে হাতেখড়ির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পাঠশালার উল্লেখ দেখা যায় না। লোচনদাসও একাধিক পণ্ডিতের নাম করেছেন—

'শুভদিন শুভক্ষণ তিথি সুনক্ষত্র। / হাতেখড়ি দিল তার সময় বিচিত্র॥ / দিনে দিনে পড়ে সেই জগতের গুরু। / দেখি শচী জগন্নাথ আপনা পাশরু॥ / এই মতে খেলা লীলায় কতদিন গেল। / শচী জগন্নাথ দোহে যুকতি করিল॥ / বিশ্বম্ভর চূড়াকর্ম্ম করি মনে মনে। / ইষ্টকুটুম্ব যত আনিল যতনে॥ / চর্চ্চিল সে শুভক্ষণ তিথি শুভ দিনে। / করিব ত চূড়াকর্ম্ম দঢ়াইল মনে॥ / …চূড়াকর্ম্ম কর্ণবেদ করিল তখন॥ / …নবম বরিষ পুত্র যোগ্য সুসময়। / উপবীত দিব বলি চিন্তিত হৃদয়। / …আজ্ঞা কর দিব বিশ্বম্ভরের পঙ্গৈতা॥ / …সুদর্শন আদি যত পণ্ডিত প্রধান। / একত্র হইয়া সভে করে অনুমান॥ / …একদিন শচীকরে ধরি গৌরহরি। / পড়িতে গৌরাঙ্গ দিল নিয়োজিত করি॥ / …পড়িবারে গেলা বিষ্ণু পণ্ডিতের ঘর॥ / সুদর্শন আদি করি গঙ্গাদাস পণ্ডিত। / পড়িল জগতগুরু তা সভা সহিত॥' ৩২

দেখা যাচ্ছে হাতেখড়ির পর লেখাপড়া শুরু। তারপর চূড়াকরণ, কর্ণবেধ এবং উপনয়ন। উপনয়নের পর বিষ্ণু পণ্ডিত, সুদর্শন ও গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে 'পড়িবারে গেলা'। কিন্তু কি পড়েছিলেন গৌরাঙ্গ তা কিছু বলা নেই। আবার বৃন্দাবনদাসের বিবরণের মতোই হাতেখড়ির পর চূড়াকরণ, কর্ণবেধের উল্লেখ পাচ্ছি। দেখা যাচ্ছে পড়াশুনার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত সংস্কার হচ্ছে হাতেখড়ি বা বিদ্যারম্ভ। চূড়াকরণ, কর্ণবেধ ও উপনয়ন ধর্মীয় সংস্কার হিসাবে পালিত হলেও এরা এদের প্রাথমিক তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছে। পরবর্তীকালে উপনয়নের সঙ্গেই চূড়াকরণ আর কর্ণবেধ করা হত। গুরু-সমীপে উপনীত হওয়ার উপনয়ন, শেষে শুধুমাত্র পৈতে সংস্কার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উপনয়নের সঙ্গে বেদপাঠের যে সম্পর্ক তা আর রইল না। প্রসঙ্গত বলা যায় বাংলায় বেদপাঠের চর্চা কোনদিনই বিশেষ প্রাধান্য পায়নি। অন্তত মধ্যযুগে যে বেদচর্চার বিশেষ প্রচলন ছিল না তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন চৈতন্যজীবনীতে চৈতন্যের লেখাপড়ার যে বিবরণ পাই তা থেকে

কিন্তু পাঠশালা শিক্ষার কোন ধারণা করা যায় না। হাতেখড়ির পর লিপি-শিক্ষা করা ছাড়া শিক্ষার আর যে বিবরণ পাই তা থেকে বরঞ্চ সংস্কৃত উচ্চ-শিক্ষার বিষয় সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যায়। সে আমলের শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ সম্পর্কেও খুব একটা কিছু জানা যায় না। জয়ানন্দ ছাড়া আর কেউ পাঠশালার উল্লেখ করেননি। জয়ানন্দও যেভাবে পাঠশালার উল্লেখ করেছেন তাতে যেন কেমন খটকা লাগে। তিনি সত্যিই 'পাঠশালা' কথাটা ব্যবহার করেছেন না 'পাটশালা' কথাটা ব্যবহার করতে চেয়েছেন এ নিয়ে কেমন সন্দেহ জাগে। 'পাটশালা' লিপি-প্রমাদে 'পাঠশালা' হয়েছে এমন সন্দেহও উঁকি দেয়। 'নাটশাল পাটশাল চৌখণ্ডী বাঙ্গালী / ধ্বজ কলহংস পারাবত করে কেলি।' বা 'নাট-পাঠশালা দীঘি সরোবর কূপ তড়াগ সোপান।' এই বর্ণনায় পাঠশালা যেন খাপ খায় না। নাটশালের সঙ্গে পাটশাল খাপ খায়। পাটশাল বা ঠাকুরঘরের সঙ্গেই নাটশাল বা নাটমন্দির থাকে। নাটশাল যদি নাট্যশালা অর্থে ধরা হয় তবে তার সঙ্গে পাঠশালার অবস্থিতি কেমন যেন বেমানান লাগে। তাছাড়া এই বর্ণনায় যে একটা শুদ্ধ ভাব আছে তা মন্দিরের পরিবেশের পক্ষেই মানানসই। অবশ্য নাটমন্দিরের সঙ্গে পাঠশালা অবস্থিত ছিল এমন অর্থও করা যায়। অন্য কোন চৈতন্যজীবনীতে পাঠশালার উল্লেখ না থাকায় এই অর্থ করতে একটু অসুবিধা হয় যেন। মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস-লেখক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য 'পাঠশালা' পাঠই মেনে নিয়েছেন।[৩৩] আমরাও তাই আপাতত ধরে নিচ্ছি জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে লিপিকার 'পাঠশালা' কথাটিই লিখেছেন। চৈতন্যমঙ্গলের বিভিন্ন পুঁথি মিলিয়ে বিচার না করে এবিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যাবে না।

কৃষ্ণমঙ্গল ও লেখাপড়া

এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণের বাল্যশিক্ষা বিষয়ে কিছু আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের বিদ্যাশিক্ষার প্রাচীন বর্ণনা খুব একটা ভালো পাওয়া যায় না। অন্তত কৃষ্ণ যে হাতেখড়ি নিয়ে 'ক খ' শিখেছিলেন এমন খবর আমার জানা নেই। হরিবংশে সান্দীপনি মুনির কাছে কৃষ্ণের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার কথা আছে।[৩৪] বাংলা পাঠশালার পুরনো পাঠ্যবই 'শিশুবোধকে' সান্দীপনি মুনির পাঠশালার

ছবি দেখা যায়।[৩৫] তাই বলে সান্দীপনি মুনিকে পাঠশালার গুরুমশায় ঠাওরালে ভুল হবে। দেখা যাক মধ্যযুগের কৃষ্ণমঙ্গলে কি খবর পাওয়া যায়।

পরশুরামের 'কৃষ্ণমঙ্গলে' কৃষ্ণ-বলরামের বিদ্যাশিক্ষার কথা আছে। এখানে দেখি যদুবংশের পুরোহিত গর্গ কৃষ্ণ-বলরামের 'দিজ শোমস্কার কৈলা' অর্থাৎ উপনয়ন দিয়ে গায়ত্রী মন্ত্র দিলেন। এখানেও একটু গণ্ডগোল। কৃষ্ণ-বলরাম তো ব্রাহ্মণ ছিলেন না তাহলে গায়ত্রী মন্ত্র দিয়ে তাদের দ্বিজ সংস্কার হল কি ভাবে? তবে দেবতাদের বেলায় সবই সম্ভব। যাই হোক, দ্বিজ সংস্কারের পর 'থাকিয়া গুরুর ঘরে রামরিসিকেস / পড়িলা চৌসষ্টি বিদ্যা অশেষ বিশেষ'।[১] তারপর যমের বাড়ি থেকে গুরুর মরা ছেলেকে জীইয়ে এনে দিলেন গুরু-দক্ষিণা হিসাবে।[৩৬] এখানে কিন্তু হাতেখড়ি বা পাঠশালা কিছুরই উল্লেখ নেই। মালাধর বসুও তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' একই কথা বলেছেন।[৩৭] তবে চূড়াকর্মের কথাও উল্লেখ করেছেন।

অন্য একটি বই কবিশেখরের 'গোপালবিজয়ে' বৃন্দাবন বর্ণনায় দেখি, 'প্রতি পাঠশালে দেখি গোআলা সমাঝে'। আর 'গোশালা পাঠশালা ভিতরে জলহরি'।[৩৮] অর্থাৎ গোশালা পাঠশালার কাছে ছোট পুকুর থাকে।[৩৯] 'গোপালবিজয়ে' পাঠশালার এরকম উল্লেখ দেখে মনে হয় তখন পাঠশালা একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। পুঁথির কাল দেখে অনুমান করি সতের শতকে পাঠশালা শিক্ষা বেশ বিকাশলাভ করেছিল। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিদ্যা-ব্যবসা সম্পর্কে বলা হচ্ছে, 'কলিতে বিদ্যাএ দুহু বাঢ়এ অহঙ্কার / পুথিতে অভ্যাস করে ধন অৰ্জিবার / অশেষ প্রবন্ধ করে লোক ভণ্ডি-বারে / নানা পরকারে পৌসে নিজ পরিবারে।'[৪০] এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় সংস্কৃত শিক্ষা জীবিকা হিসাবেই চালু ছিল সে সময়। সেটা ছিল উপাধ্যায়ের যুগ।

মাধবাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'ও দেখি গর্গমুনি উপনয়ন দেন, তারপর কৃষ্ণ শাস্ত্র শিক্ষা করে 'শান্তিপন' গুরুর ঘরে অবন্তী নগরে। মাধবাচার্য লিখেছেন, 'সবহুঁ সাধন বেদ ধর্ম্ম রাজনীতি। / ন্যায় দর্শন ছয় মীমাংসা প্রভৃতি॥ / একে বারে সর্ব্ব শাস্ত্রে করিলেন দৃষ্টি। / চৌষট্টি দিবসে বিদ্যা পড়িল চৌষট্টি॥'[৪১] শিক্ষা শেষে মরা ছেলে বাঁচিয়ে গুরুদক্ষিণা দেয় 'রামহরি'। 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে' হাতেখড়ি বা প্রাক্-উপনয়ন শিক্ষার কথা নেই। আরো দেখা যায় মন্ত্রগুরু আর শিক্ষাগুরু আলাদা লোক। তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী হিসাবে গুরুগৃহে শাস্ত্র-

পাঠ করেছিলেন যার মধ্যে বেদপাঠও আছে; আবার ধর্ম, রাজনীতি, ন্যায় এসবও আছে। চৌষট্টি বিদ্যা বলতে নাচ, গান, বাজনা, ছবি আঁকা, কাব্য-সাহিত্য, কারুশিল্প, ছলাকলা, তন্ত্র ইত্যাদি বোঝায়।[৪২]

বাংলা রামায়ণ ও মহাভারত

কৃত্তিবাসের 'রামায়ণে' দেখছি রামচন্দ্র এইসব বিদ্যাই শিখেছিলেন হাতে-খড়ির পর।

পঞ্চবর্ষ গত হয় হাতে দিল খড়ি।
পড়িতে পাঠান রাজা বশিষ্ঠের বাড়ী॥
ক খ গ আঠার ফলা বানান প্রভৃতি।
অষ্ট শব্দ পাঠ করিলেন রঘুপতি॥
ব্যাকরণ কাব্যশাস্ত্র পড়িলেন স্মৃতি।
অবশেষে পড়িলেন রাম চতুঃশ্রুতি॥
কোন শাস্ত্র নাহি তার হয় অগোচর।
চৌদ্দ দিনে চতুঃষষ্টি বিদ্যাতে তৎপর॥[৪৩]

কবি সঞ্জয়ের 'মহাভারতে'ও দেখা যাচ্ছে জনমেজয়ের শাস্ত্রশিক্ষা হয়েছিল হাতেখড়ির পর। এবং হাতেখড়ি হয়েছিল পাঁচ বছর বয়সে।

পঞ্চম বরিষে শিশু হইল সুধীর॥
শুভক্ষণ করি রাজা খড়ি দিল হাতে।
পঠিবারে গেল শিশু পণ্ডিতসভাতে॥
নানাশাস্ত্র পঠিয়া হইল বিচক্ষণ।
অস্ত্রগুরুকৃপা হতে শিখে অস্ত্রগণ॥[৪৪]

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে কৃষ্ণ, রামচন্দ্র, জনমেজয় আর চৈতন্যের বিদ্যাশিক্ষার যে বিবরণ পাই তাতে সে যুগের শিক্ষা সম্পর্কে কিছু ধারণা নিশ্চয়ই করা যায়। পরশুরামের 'কৃষ্ণমঙ্গল' আর মাধবাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে' কৃষ্ণের বিদ্যাশিক্ষার যে বিবরণ পাই তাতে দেখি কৃষ্ণের শিক্ষা শুরু হয়েছিল উপনয়নের পর। হাতে-খড়ি বা পাঠশালার কোন খবর নেই। আবার 'গোপালবিজয়ে' পাঠশালার উল্লেখ দেখি কিন্তু কৃষ্ণের বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। আর কৃত্তিবাসের 'রামায়ণে' রামচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষার যে বিবরণ আছে তাতে

উপনয়নের কোন খবর নেই। রামচন্দ্র কৃষ্ণের মতো সব বিদ্যাই শিখেছিলেন, তবে হাতেখড়ির পর। জনমেজয়ের লেখাপড়ার খবরও একই রকম। হাতে-খড়ির পরই তিনি পণ্ডিত সভাতে নানা শাস্ত্র পড়ে বিচক্ষণ হয়েছিলেন।

চৈতন্যের বিদ্যাশিক্ষার বিবরণে দুরকমই দেখি। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবতে দেখি তাঁর হাতেখড়ি এবং উপনয়ন দুইই হয়েছিল। হাতেখড়ির পর চৈতন্যের অক্ষর পরিচয় হয় আর উপনয়নের পরই তিনি গঙ্গাদাস চক্রবর্তীর কাছে শাস্ত্র পড়েন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ উপনয়নের উল্লেখ না করলেও বৃন্দাবনদাসের কথাই মেনে নিয়েছেন। আবার চূড়ামণিদাসের বিবরণে হাতেখড়ির উল্লেখ নেই কিন্তু লেখাপড়া ও শাস্ত্র শেখার পর উপনয়ন হয়েছিল এ খবর পাই। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' আর 'গোপালবিজয়' ছাড়া কোথাও পাঠশালার উল্লেখ পাই না। আর চূড়ামণিদাসে 'স্থাখতের' উল্লেখ পাই। কৃষ্ণ, রামচন্দ্র, জনমেজয়, চৈতন্য এঁরা কেউ অঙ্ক শিখেছিলেন কিনা বা পাঠশালায় পড়েছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। লেখাপড়ার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কের বিচারে হাতেখড়ির প্রাধান্য লক্ষ করার মত। অন্যদিকে উপনয়ন সংস্কার নিয়মমাফিক শুধুমাত্র দ্বিজ সংস্কারে পরিণত হচ্ছিল তাও বোঝা যায়। আর ব্রাহ্মণদের লেখাপড়া সংস্কৃত শিক্ষার গণ্ডিতে আটকে ছিল বলেই মনে হয়। মাতৃভাষা এবং পার্থিব বিষয়ের সঙ্গে সে শিক্ষার কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। একমাত্র 'ক-খ' ও 'আঙ্ক-আস্ক' এই কথা কয়েকটির মধ্যে বাংলা লেখাও শেখা হত এমন আঁচ করা যায় হয়ত। আবার সংস্কৃত শিক্ষার শুরুতেও এই অক্ষরাভ্যাস দরকার হত এমনও বলা যায়। আঙ্ক, আস্ক কথার অর্থ যুক্ত বর্ণমালা। ককারাদি বর্ণের সঙ্গে আনুনাসিক বর্ণের যোগকে আঙ্ক বলা হয়। আর শ, ষ, স, হ যোগকে আস্ক বলে।

যাইহোক, বাংলা পাঠশালা শিক্ষাধারা সম্পর্কে আমরা এখনও খুব একটা ওয়াকিবহাল হতে পারছি না। লেখাপড়ার যেসব খবর পাওয়া গেল তা থেকে সেকালের সংস্কৃত শিক্ষার বিষয় সম্পর্কে বরঞ্চ কিছু ধারণা করা যায়।

মনসামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গলকাব্য ও লেখাপড়া

এবার আর আর মঙ্গলকাব্যগুলি যেমন 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'শীতলামঙ্গল' ও 'ধর্মমঙ্গলে' এবিষয়ে কি খবর আছে তা জানা দরকার। এ পর্যন্ত যাদের লেখাপড়ার বিষয় জেনেছি তারা প্রায় সকলেই অবতার বা উচ্চবর্ণের লোক। কৃষ্ণ গোয়ালা হলেও গায়ত্রীমন্ত্রের অধিকারী এবং দেবতা, কাজেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বাইরে বৈশ্য ও শূদ্রের শিক্ষা বিষয়ে কোন ধারণা হয় না। আর আর মঙ্গলকাব্যগুলিতে আমরা মধ্যযুগে বৈশ্য ও শূদ্রের শিক্ষার অবস্থা কি ছিল তার কোন খবর পাই কিনা দেখব।

মঙ্গলকাব্যে বিশেষ করে মনসামঙ্গলে পাঠশালার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ছাপা বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের আদর্শ পুঁথির লিপিকাল বড় একটা পুরনো নয়। সতের শতকের আগে লিপি করা মঙ্গলকাব্যের পুঁথি পাওয়া গেছে বলে জানি না। যাইহোক, 'মনসামঙ্গলে' চান্দের ছয় পুত্র বধের বিবরণে পাঠশালার উল্লেখ দেখা যায় এইরকম—

ছোট জন নহে চান্দ রাজ ভোগে ভোলা।
লক্ষ লক্ষ লোক যার আছে পাঠশালা॥
নানা দেশে পাঠসব, নানা দেশে ঘর।
সোমাই পণ্ডিত পাঠ পড়ায় নিরন্তর॥
কেহ কাব্য শাস্ত্র পড়ে, কেহ ব্যাকরণ।
সব হইতে যোগ্য চান্দর পুত্র ছয়জন॥
একদিনে ছয় ভাই পড়ে পাঠশালা।
পড়িতে পড়িতে হইল দুপ্রহর বেলা॥[৪৫]

পনের শতকের কবি বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণে' পাই—

পঞ্চ বৎসরের যদি লখিন্দর হইল।
হাতেখড়ি কর্ণভেদ এক কালেতে কইল॥[৪৬]

বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁর 'মনসাবিজয়' কাব্যে আমাদের অনেক খবর দিয়েছেন। বিপ্রদাস পনের শতকের কবি হলেও আদর্শ পুঁথির লিপিকাল আঠার শতকের আগের নয়। ফলে কিছু যোগ-বিয়োগ আর ঘসা-মাজা যে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। 'মনসাবিজয়ে'র সম্পাদক সুকুমার সেনও একথা মানেন।[৪৭] যাইহোক,

'মনসাবিজয়ে' হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের শিক্ষার উল্লেখ দেখা যায়। 'মনসাবিজয়ে' দেখি—

জতেক ছৈয়দ মোল্লা জপয়ে ত বিসমিল্লা
সদা মুখে কলিমা কেতাব।
হিন্দুত কলিমা দিল মুছলমানি শিখাইল
তথা বৈসে জত মুছলমান
শিখাএ নামাজ অজু সদাই মক্তবে রুজু
নিরন্তর খলিপা জোগান।[৪৮]

তখন যে মক্তব শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল তা বেশ বোঝা যায়। মুসলমান শিশুর লেখাপড়ার বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি নেই। সেই হিসেবে 'মনসাবিজয়ে'র এই ছত্রগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা পরে এবিষয়ে আলোচনা করব।

'মনসাবিজয়ে' লখিন্দরের বাল্যশিক্ষা সম্পর্কে কবি লিখেছেন—

লখাইর অনুমতি পায়্যা রাজরানি
সোমাই পণ্ডিত দ্বিজে ডাক দিয়া আনি।
সনকা বলেন দ্বিজ না করিহ হেলা
যত্নে পড়াইহ মোর লখিন্দর বালা।
শুনিয়া হরিষ দ্বিজ রানির বচনে
লখাইর হাতেখড়ি দিল শুভক্ষণে।
ক খ গ ঘ ঙ পড়ে হরিষ অন্তরে
চৌত্রিশ অক্ষর পড়ে বালা লখিন্দরে।
অষ্টদশ ফলা পড়ে হরষিত-মন
চৌত্রিশ অক্ষরে ফলা করিল পঠন।
অষ্ট ধাতু অষ্ট শব্দ পড়িল সত্বরে
সোমাই পণ্ডিত দ্বিজ শুভদিন করে।
শাস্ত্রশাল লইলেক বালা লখিন্দর
প্রথমে পড়ায় সূত্র সুখে দ্বিজবর।
তারপর ব্যাকরণ পড়ে রাজসুতে
ভট্টি রঘু সাহিত্য পড়িল হরষিতে।
অলঙ্কার কুমার পড়িল অভিধান

জ্যোতিষ নাটক কাব্য পড়িল বিধান।
অষ্টদশ পুরাণ পড়িয়া অনিবার
হইল পণ্ডিত বড়ো রাজার কুমার।
সকল সন্ধান শিখে ইঙ্গিতে সকল
লক্ষমাত্র উপাধ্যায় পড়াএ অনুবল।
পড়িল চৌষট্টি বিদ্যা সব একে একে
জানিল সকল বিদ্যা কহিল কৌতুকে।[৪৯]

বিপ্রদাসের এই বর্ণনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বেনের ছেলে লখিন্দরের হাতেখড়ি হয়েছিল। সে অক্ষর, ফলা, ধাতু পড়ে সংস্কৃত কাব্য, নাটক, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, পুরাণ প্রভৃতি চৌষট্টি বিদ্যা শিখেছিল উপাধ্যায়ের কাছে। দেখা যাচ্ছে বেনের ছেলের সংস্কৃত শিক্ষায় বাধা ছিল না। তবে বেদ, বেদান্ত বা স্মৃতির উল্লেখ না থাকায় বোঝা যায় ঐসব শাস্ত্র পড়ার অধিকার বেনের ছেলের ছিল না। এখানে হাতেখড়ির উল্লেখ আছে অথচ কোথাও লেখা শেখার বা অঙ্ক শেখার উল্লেখ নেই। আসলে লখিন্দরের শিক্ষা সংস্কৃত শিক্ষার ধারায় হওয়ায় 'লেখাপড়ার' চাইতে 'পড়াশুনার' উপরই জোর বেশি। এই বর্ণনায় অব্রাহ্মণের সংস্কৃত শিক্ষার বিষয়সূচীর একটি সুন্দর তালিকা পাওয়া যায়। সে যাইহোক, পাঠশালা শিক্ষার বিষয়ে আমরা খুব একটা বেশি অবহিত হতে পারলাম না যদিও 'হাতেখড়ি' ও 'ক খ গ ঘ' পড়ার কথা পেলাম। চৌত্রিশ অক্ষর, অষ্টাদশ ফলা, অষ্টধাতু, অষ্টশব্দ এইসব বিষয়ের কথা শুনলাম। অক্ষর, ফলা, বানান যে পাঠশালা শিক্ষার বিষয় তাও আমরা জানি।

উত্তরবঙ্গের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গলে' লখিন্দরের লেখাপড়া সম্পর্কে এইরকম লেখা আছে—

বানিয়ার নন্দন বাঢ়ে বানিয়ার ঘরে।
পঞ্চ বৎসরে বালা কর্ণবেধ করে ॥
পঢ়িবারে দিল বালা গুরু বিদ্যমানে।[৫০]

জগজ্জীবন সতের শতকের কবি। তবে তাঁর 'মনসামঙ্গলে'র আদর্শ পুঁথি আধুনিক। যাইহোক, তখন যে বাংলার সব অঞ্চলেই লেখাপড়ার বিশেষ প্রচলন ছিল তা বেশ বোঝা যায়। 'পঢ়িবারে দিল বালা গুরু বিদ্যমানে' এই কথায় পাঠশালাই বোঝাচ্ছে মনে হয়। পাঠশালার শিক্ষকদের 'গুরুমশায়' বলা

হত। অবশ্য হাতেখড়ি বা পাঠশালার কোন উল্লেখ দেখা যায় না তার রচনায়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত নারায়ণদেবের 'পদ্মাপুরাণ' বা বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গলে' লখিন্দরের লেখাপড়া সম্পর্কে বিশেষ কোন খবর পাওয়া যায় না।

আঠার শতকের কবি বিষ্ণুপালের 'মনসামঙ্গলে' কিন্তু পাঠশালার উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপাল লিখছেন—

রাজার পুত্র মুনির পুত্র পড়িবারে গেল॥
রাজপুত্র মুনিপুত্র পড়ে পাটশালে।
দৈবের নিবন্ধে দ্বন্দ্ব লাগিল ছাওলে।
জন্মেজয়ের হাথের খড়ি টলিয়া পড়িল॥
মুনির পুত্রকে খড়ি তুলিতে বলিল।[৫১]

বিষ্ণুপালের 'মনসামঙ্গলে' 'পাটশাল' বা 'পাঠশালা'র উল্লেখ আর লেখার খড়ির কথা ছাড়া বিশেষ কোন খবর পাওয়া যায় না। এমনকি হাসান হোসেন কাহিনীতে মখতব বা মুসলমানের শিক্ষার কোন উল্লেখ নেই। তবে 'রাজপুত্র মুনিপুত্র পড়ে পাটশালে' এই কথা থেকে বোঝা যায় তখন পাঠশালা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। আর 'হাথের খড়ি টলিয়া পড়িল' এই উক্তি থেকে বোঝা যায় পাঠশালায় লেখা শেখা হত।

দেখা যাচ্ছে 'মনসামঙ্গলে' পাঠশালা আর মখতবের উল্লেখ আছে। পাঁচ বৎসরে হাতেখড়ির কথাও আছে। লেখা শেখার ইঙ্গিতও আছে। আর আছে অব্রাহ্মণদের সংস্কৃত শিক্ষার বিষয়সূচী। কিন্তু পাঠশালা শিক্ষার কোন বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া পুঁথিগুলিও খুব প্রাচীন নয়।

এবারে দেখা যাক 'শীতলামঙ্গল' আমাদের কোন নতুন কথা শোনায় কিনা। কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর 'শ্রীশ্রীশীতলামঙ্গলে' আছে—

কলাই ব্যাপারী হোয়ে আপনি চলগো ধেয়ে
যথা পাঠ পড়ে শিশুগণে।
* * *
যেখানে বালক সঙ্গে শিশুগণ মহারঙ্গে
পাঠ পড়ে গুরু সন্নিধানে।[৫২]

গ্রাম্য পাঠশালার একটা ছবি যেন ভেসে ওঠে আমাদের চোখে। যদিও

কি পড়ানো হচ্ছে বা কিভাবে পড়াশুনা হচ্ছে তার কথা খুব একটা জানতে পারি না। তবে পাঠশালা যে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছিল তা অনুমান করা যায়; যদিও পাঠশালা কথার উল্লেখ নেই। কবি কৃষ্ণদাসের 'কালিকা-মঙ্গল' ও 'কমলামঙ্গলে' হাতেখড়ির কথা পাই কিন্তু পাঠশালার উল্লেখ বা কোন বিবরণ পাই না।

এরপর আমরা 'চণ্ডীমঙ্গলে'র কথা শুনব। দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে' শ্রীমন্তের বাল্যলীলার কথায় দেখা যাচ্ছে—

শুভক্ষণে ঘড়ি ধরি পড়ে শ্রীয়পতি॥

জনার্দন পণ্ডিতের কাছে শ্রীমন্তের বিদ্যারম্ভের বর্ণনায় আছে—

পুন্য তিথি গুরুবারে　　　কঠিনী লইয়া করে
　　পূজা করিয়া সরস্বতী॥
'ক'-বর্গ যে পঞ্চাক্ষর　　　লেখি দিল ক্ষিতি-তল
　　প্রতি অক্ষর জানায়ে জনার্দ্দন।
চ-বর্গ ট-বর্গ যথ　　　পড়িলেক শ্রীয়মন্ত
　　অন্তস্থয়ে প্রবেশিল মন॥
ক্য ক্র ক্ক আদি　　　ক্ক ক্ষ অবধি
　　রেফযুক্ত পড়ে যথ ফলা।
ক্র ক্ল আঙ্ক আস্ক　　　অং পড়ে সিদ্ধি শেষে
　　বানানে পারগ হইল বালা॥
পূজা করি সরস্বতী　　　আরম্ভ করিল পুথি
　　জানিবারে সন্ধির প্রকার।
সূত্র সন্ধি করিয়া　　　সুসম পন্থেতে গিয়া
　　শব্দ সন্ধি জানিল অপার॥
চণ্ডিকার ব্রত হেতু　　　পড়িল সকল ধাতু
　　দীপিকায়ে জানিল কারণ
ষত্ব ণত্ব জ্ঞান হয়ে　　　সংস্কৃতে কথা কহে
　　পারগ হইল ব্যাকরণ।[৫৩]

দ্বিজ মাধবের 'চণ্ডীমঙ্গলে' দেখা যাচ্ছে শ্রীমন্ত আগে লেখা শেখে তারপর পড়া করে। পাঠশালায় এভাবেই লেখাপড়া হত। তবে শ্রীমন্তর লেখাপড়ার যে বিবরণ দ্বিজ মাধব দিয়েছেন তাতে সংস্কৃত শিক্ষার প্রাথমিক ধাপের বর্ণনাই

পাই। পাঠশালার কথা বড় একটা নেই তাতে। সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার জন্য যে 'ক খ গ ঘ' ও 'আঙ্ক-আস্ক' শিখতে হত তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

দ্বিজ মাধব গুজরাটে নানা জাতির বসতি স্থাপনের কথায় লিখছেন—

বৈসয়ে মুসলমান পড়ে কিতাপ কোরান
নমায়াজ পড়ে পাঁচবার।
সোলেমানী মালা করে খোদার নামে জিগির কাড়ে
সৈদ কাজী বোসিল অপার।[৫৪]

কিন্তু কোথাও মখতবের উল্লেখ করেননি। আসলে মখতব বা পাঠশালা-শিক্ষার কথা দ্বিজ মাধবে খুব একটা পাওয়া যাচ্ছে না। এবারে দেখা যাক কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীকাব্যে' আমরা কি খবর পাই। দ্বিজ মাধব ১৫৭৯-৮০ খ্রীস্টাব্দে 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' রচনা করেন। এর কিছু পরে ১৫৯৪ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' রচিত হয় বলেই জানা যায়।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীকাব্যে' আমরা সেই যুগের সমাজ ও শিক্ষার একটি ভালো ছবি পাই। মুকুন্দরাম তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গলে'র ধনপতি উপাখ্যানে শ্রীমন্তের বিদ্যাশিক্ষার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। শুভক্ষণে হাতে-খড়ি হলে শ্রীমন্ত জনার্দন ওঝার কাছে পড়া শুরু করেন।

পড়য়ে সাধুর বালা প্রথমে আঠার ফলা
কখ আঙ্ক আস্ক বানান।
গুরুবাক্যে দিয়া কর্ণ চিনিল অনেক বর্ণ
পড়িল শুনিল সুলক্ষণ॥

* * *

নিবিষ্ট করিয়া মোন লিখে পড়ে অনুক্ষণ
বিদ্যা বিনে নহে অন্যমনা॥

'রক্ষিত পঞ্জিকা টিকা', ন্যায়, কোষ, ভট্টীকাব্য জৈমুনি, নৈষধ, মেঘদূত, কুমারসম্ভব, রত্নাবলী, ভারবি, মাঘ, পিঙ্গল, হিতউপদেশ, বৈদ্যক, জ্যোতিষ, ছন্দ, ব্যাকরণ সব 'একে একে পড়ে শ্রীরপতি।'[৫৫]

দ্বিজ মাধব আর মুকুন্দরাম শ্রীমন্তের বিদ্যাশিক্ষার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে পাঠশালা শিক্ষার চাইতে টোলের শিক্ষা সম্পর্কেই বেশি জানা যায়। আসলে সংস্কৃত টোলের একটি ভালো বিবরণ পাওয়া যায় এতে। যদিও টোল বা চতুষ্পাঠীর কোন উল্লেখ দেখা যায় না এই দুই চণ্ডীকাব্যে। সংস্কৃত

উত্তররামচরিতে লবকুশের শিক্ষার বর্ণনা বা রঘুবংশে রঘুর শিক্ষার যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কৃষ্ণ, রামচন্দ্র, জনমেজয়, চৈতন্য এমনকি শ্রীমন্তের বিদ্যাশিক্ষার অনেক মিল দেখা যায়।[৫৩] এখানে উল্লেখ করা যায় যে মধ্যযুগে রামায়ণ ও মহাভারতের বাংলা করা হলেও কালিদাস বা অন্যান্য সংস্কৃত কবির কাব্য বা নাটকের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছিল এরকম কোন নজির পাওয়া যায় না। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছিল সাধারণ মানুষের জন্য। তখনকার বাংলা কাব্যগুলি মূলত হাটে-বাজারে জনগণের মধ্যে গাওয়া হত। কালিদাস প্রভৃতির কাব্য ও নাটকের সুর ও মেজাজ সে দিক দিয়ে বাংলার সাধারণ মানুষের মনে কোন টান ধরাতে পারেনি বলেই মনে হয়। তাছাড়া বাংলার লোকসমাজে প্রেম-বিরহের লোকগীতের কোন অভাব ছিল না। বাংলার লোক-মানসে রসের যোগান দিতে রচিত হয়েছিল অসংখ্য লোকগীতি আর গাথা। পূর্ব বাংলার পল্লীগীতি, সারি গান, জারি গান, নৌলা, পর্ব ও বারমাস্যা প্রভৃতি যার উদাহরণ। উচুবর্ণের লোকেরা বিশেষ করে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কিন্তু এসবের কদর করত না। এমনকি রামায়ণ ও মহাভারতের বাংলা অনুবাদ সম্পর্কেও ছিল এদের বিদ্বেষ। তাই কৃত্তিবাস-কাশীরাম দাস সম্পর্কে এই ছড়া চালু হয়েছিল—

'কৃত্তিবেশে কাশীদেসে আর বামুন-ঘেঁসে। এই তিন সর্ব্বনেশে শাস্ত্র খেলে চুষে' ॥[৫৭]

যাইহোক, মনে হয় মঙ্গলকাব্যের রচয়িতারা শ্রোতাদের সমীহ আদায়ের জন্যই তাঁদের নায়কদের 'সংস্কৃত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছেন। এইসব মঙ্গলকাব্যে তাই হাতেখড়ি বা পাঠশালার উল্লেখ থাকলেও শিক্ষার বিষয়গুলি টোলের সংস্কৃত শিক্ষার ধাঁচে রচিত হয়েছে। উচুবর্ণের বা শ্রেণীর লোকের সংস্কৃতির প্রতি সাধারণের এই মনোভাব কিন্তু স্বাভাবিক। আজকের সমাজের নিম্নবিত্তের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মোহ একই প্রবণতার সাক্ষ্য দেয়। শ্রীমন্ত আর লখিন্দর ছাড়া যাদের শিক্ষার খবর পাওয়া যাচ্ছে, তারা সবাই উচুবর্ণের লোক। তাদের পক্ষে সংস্কৃত উচ্চশিক্ষাও স্বাভাবিক। শ্রীমন্ত ও লখিন্দর বেনের ছেলে হলেও ধনীসন্তান। কাজেই তাদের সংস্কৃত উচ্চশিক্ষা পেতে হয়ত কারো আপত্তি হয়নি। এটা কিন্তু এক দিক দিয়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। দেখা যাচ্ছে মধ্যযুগেও নিম্নবর্ণের ধনীসন্তানের

পক্ষে সংস্কৃত উচ্চশিক্ষা সম্ভব হত। বৌদ্ধ-যুগে শ্রেষ্ঠী বণিকের সন্তানদের সংস্কৃত উচ্চশিক্ষা নিতে আমরা দেখেছি। বাংলায় সুদূরপ্রসারী বৌদ্ধ প্রভাবের কথাও আমরা জানি। মুসলমান আক্রমণের ফলে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জয়যাত্রা যে কিছুটা থমকে গিয়েছিল তাতেও সন্দেহ নেই। মুসলমান রাজত্বে সমাজের উপর গোঁড়া ব্রাহ্মণ কর্তাদের কর্তৃত্ব অন্তত প্রথমদিকে যে কিছুটা শিথিল হয়েছিল সেবিষয়েও সন্দেহ নেই। মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদ্মাবতী' কাব্যের ভূমিকায় কবি জানাচ্ছেন যে তাঁর চার বন্ধু মালিক ইয়ুসুফ, সালার খাদিম, মিঞা সালোন ও শেখ বেদে চার বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, পুরাণ, মীমাংসা, ন্যায় ও ধর্মশাস্ত্র এই চৌদ্দ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।[৫৮] এমনকি পদ্মাবতীর শিক্ষার যে বিবরণ কবি দিয়েছেন তাও সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার বিবরণ। বিধর্মী মুসলমানের পক্ষে সংস্কৃত উচ্চশিক্ষা পাওয়া সম্ভব হলে, বেনের ছেলের পক্ষে সংস্কৃত উচ্চশিক্ষা পাওয়া নিশ্চয়ই অসম্ভব ছিল না। জায়সী পনের শতকে জন্মেছিলেন। আলোচ্য 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য দুটি ষোল শতকে রচিত হয়েছিল। পনের-ষোল শতকে নিম্নবর্ণের ধনীসন্তানের পক্ষে সংস্কৃত উচ্চশিক্ষায় কোন বিশেষ বাধা ছিল বলে মনে হয় না। অবশ্য পরবর্তীকালে বোধহয় এটা আর সম্ভব ছিল না। অন্তত রামানন্দ যতির 'চণ্ডীমঙ্গলে' সে ইঙ্গিত আছে। সে আলোচনার আগে মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে'র কালকেতু উপাখ্যানের কথা সেরে নেব।

মুকুন্দরামের ধনপতির উপাখ্যানে যেমন ধনীসন্তান শ্রীমন্তের সংস্কৃত উচ্চ-শিক্ষার বিবরণ পাই তেমনি তাঁর কালকেতু উপাখ্যানে ব্যাধপুত্র কালকেতুর অক্ষর-পরিচয়হীন বাল্যকালের কথা পাই। কালকেতুর 'পঞ্চম বরিষে কৈল কর্ণের বেধন' কিন্তু হাতেখড়ি হলো না। কালকেতুর বাল্যকালের কথায় আছে—

শিশুগণ সঙ্গে ফিরে শশারু তাড়ায়্যা ধরে
দূরে পশু পালাইতে নারে।

* * *

গণকে আনিয়া ঘরে শুভদিন শুভবারে
ধনু দিল ব্যাধসুত-করে।[৫৯]

ব্যাধের ছেলের হাতেখড়ি বা বিদ্যাশিক্ষা সমাজে প্রচলিত ছিল না। ব্যাধের ছেলের হাতেখড়ির বদলে শুভদিনে হাতে ধনু দেওয়াই ছিল রীতি। শিক্ষায় বর্ণভেদের উদাহরণ হিসাবে এই ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কাল কেতু ধনীসন্তান

হলে কি হত তা অবশ্য জানা যায় না। আর একটি ঘটনায় ব্যাধপুত্র কালকেতুর শিক্ষা সম্পর্কে মনোভাব বোঝা যায়। চণ্ডী ছদ্মবেশে কালকেতুর ঘরে এলে কালকেতু বড়ই বিপাকে পড়ল। শেষে চণ্ডী যখন নিজের পরিচয় দিলেন কালকেতুর বিশ্বাস হলো না। কালকেতু চণ্ডীকে বলল—

হিংসামতি আমি ব্যাধ অতি নীচ জাতি।
মোর ঘরে কি কারণে আসিব পার্বতী॥
আদ্যাশক্তি বট যদি নগেন্দ্রনন্দিনী।
তোমার চরণ বন্দি জোর করি পানি॥
আদ্যাশক্তি বই মনে না যাই পাত্যারা।
শর-স্তম্ভ-বিদ্যা জান হেন বুঝি পারা॥
আপনার শতনাম কহ দেখি শুনি।[৩০]

দেবী তখন চৌত্রিশ অক্ষরে নাম কন। কালকেতু বোঝেন ইনিই দেবী। এই 'চৌতিশা' পাঠশালা শিক্ষার একটি বিষয়। 'ক খ গ ঘ' প্রভৃতি চৌত্রিশ অক্ষরে দেবীর নামের পাঠ মুখস্থ করা পাঠশালা শিক্ষার একটি বিষয় ছিল।

আসলে এইভাবেই তখন অক্ষর-পরিচয় হত। এ ঐতিহ্য অনেক পুরনো। এমনকি ললিত-বিস্তরেও দেখি গৌতম বুদ্ধ একটি অক্ষর উচ্চারণের সঙ্গে একটি শ্লোক বলছে। অক্ষর-পরিচয়ের এই রীতি আধুনিক কালেও চালু আছে। 'অ'-য় 'অজগর আসছে তেড়ে'—'আ'-য় 'আমটি আমি খাব পেড়ে' বা 'A for Apple' সেদিনও শিশুপাঠ্য বইয়ে দেখা যেত। যাইহোক, নিরক্ষর কালকেতুর কাছে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি দেবতার সমান। এখনো নিরক্ষর গ্রামবাসী চিঠি লিখতে আর পড়তে জানা লোককে বিরাট পণ্ডিত মনে করে। লেখাপড়া জানা লোকের লাঙল ছুঁতে নেই এ ধারণা এখনো গ্রাম-সমাজের গভীরে বাসা বেঁধে আছে। লেখাপড়ার সঙ্গে কায়িক শ্রমের এ বিরোধ কিন্তু ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিরই প্রভাব। ইংরেজি 'লিবারেল এডুকেশন' তাই সহজেই এই বিরোধকে বাড়িয়ে তুলতে পেরেছে। আমাদের গুরুমুখী শিক্ষার ঐতিহ্য এমন এক গুরুবাদী মানসিকতা গড়ে তোলে যে লেখাপড়া জানা লোক খেটে খাওয়া মানুষকে মানুষ হিসাবে মর্যাদা দিতে পারে না। আর খেটে খাওয়া নিরক্ষর মানুষ পড়াশুনা জানা লোকের এই উন্নাসিকতার তাড়নায় হীনমন্যতাবোধে ভোগে। বীর কালকেতুর চরিত্রেও এই হীনমন্যতার লক্ষণ সুস্পষ্ট।

যাইহোক, এই কালকেতু, দেবীর কৃপায় রাজা হয়ে গুজরাট নগরের পত্তন করলেন। সেই নগরে 'জত শিশু মুসলমান / করিয়া দলিজখান / মকদ্দম পড়ায়ে পড়ান।' অন্য এক পাঠে আছে 'যত শিশু মুসলমান। তুলিল মক্তবখান / মখদম পড়ায় পঠনা।'[৬১] দেখা যাচ্ছে বাংলায় মুসলমান সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। মখতব শিক্ষা চালু ছিল বলেই মনে হয়। অথচ গুজরাটে পাঠশালার কোন উল্লেখ পাই না। সেই সময় যে পাঠশালা শিক্ষাও বেশ চালু ছিল তার প্রমাণ কিন্তু আছে। অক্ষর-পরিচয়ের কথা ছাড়াও পাঠশালার উল্লেখ পাই শ্রীমন্তের সঙ্গে তার গুরু জনার্দন ওঝার বিবরণে। এই ঝগড়া প্রসঙ্গে মুকুন্দরাম লিখেছেন—'দ্বন্দ্বের'

ছুঁইতে না যুয়ায় বেটা জাতিতে চেমনে
উগ্র বলিয়া গালি দিস ব্রাহ্মণে।
অবিলম্বে যাও বেটা পাঠশালা ছাড়ি।
মাথা ভাঙ্গিব পাছে মারিয়া পাবুড়ি ॥[৬২]

অন্য আর এক পাঠে আছে—'অবিলম্বে জাহ মোর পাটশাল ছাড়ি'।[৬৩] 'পাঠশালা'র বদলে 'পাটশাল' লিপিপ্রমাদ সন্দেহ নেই। এখানে 'পাটশাল' কথার কোন অর্থ হয় না। মুকন্দরাম গুজরাট নগর পত্তনের বিবরণে পাঠশালার উল্লেখ আলাদা করে করার হয়ত প্রয়োজন বোধ করেননি। সে যাইহোক, শ্রীমন্ত ও কালকেতুর শিক্ষার যে বিপরীত চিত্র আমরা পাই মুকন্দরামে, তা সমাজে ধনী-দরিদ্রের অবস্থানকেই স্পষ্ট করে তোলে সন্দেহ নেই।

মুকন্দরামের 'চণ্ডীকাব্যে' পাঠশালার উল্লেখ থাকলেও সে আমলের পাঠশালা শিক্ষা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করার মত তথ্য বড় একটা নেই। এদিক দিয়ে রামানন্দ যতির 'চণ্ডীমঙ্গল' আমাদের অনেক বেশি সাহায্য করে। রামানন্দ যতির 'চণ্ডীমঙ্গল' অনেক পরে ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।[৬৪] রামানন্দ লিখেছেন—

খুলনা পুত্রের নাম রাখিল শ্রীপতি।
বিত্তারম্ভ করিয়া পাঠেতে হৈল মতি ॥
এক দ্বিজ রাখিলেক পড়াবার তরে।
শব্দশাস্ত্রে বিদ্যা হৈল অষ্টম বৎসরে ॥

সকল দেশের ভাষা ওঝা শিখাইল।
অঙ্ক শাস্ত্র বিশেষিয়া শিখাইয়া দিল॥
যব রতি মাসা তোলা সের আদি মান্।
বৈশ্য বিদ্যা ওঝা তাকে সব দিলে দান্॥

*　　*　　*

কেহ বলে ফলা নয়,　　আঙ্ক আঙ্ক ফলাময়
স্বরগুলা বানানের সার॥
ক্ল ক৯ ও বটে স্বর　　বানানেতে বার ধর
ঋ ঋ ৯ ৠ চারি লইয়া ষোল।
কয় যয় কয় রয়　　কয় নয় কয় লয়
কয় বয় কয় ময় তোল॥
সংযোগের উচ্চারণ　　কহে সব শিশুগন্
পূর্ব বর্ণ উচ্চারিব আগে।
হসন্ত করিয়া লব　　শেষবর্ণ পাছে কব
অজন্ত তবে সে ভাল লাগে॥
অঙ্কের মহলা কয়　　দশে শূন্য বৃদ্ধি হয়
কুড়ি অঙ্কে দুই শূন্য তবে।
শ্রীপতি হাসিয়া কয়　　এমন ত মত নয়
দশ দশ গুণে শূন্য লবে।
দশ গুণ মধ্যে যত　　যাবত না স্ফুরে শত
দুই আদি অঙ্ক বাঢ়ে ক্রমে।[৬৬]

রামানন্দ পাঠশালার উল্লেখ করেননি কিন্তু পাঠশালার শিক্ষার এক অসাধারণ ছবি এঁকেছেন। পাঠশালা শিক্ষার দুই মূল বিষয় লেখা আর অঙ্ক। কিভাবে স্বরসংযোগে শব্দ গড়া হবে তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। পরবর্তী 'শিশু-শিক্ষা' বা 'বর্ণপরিচয়ে'র 'কর খল' ইত্যাদির আভাস পাওয়া যায়। অঙ্কের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হত পাঠশালা শিক্ষায় তাও জানা যায়। যব, রতি, তোলা, সের ইত্যাদির হিসাব শেখান হত। বৈশ্য বিদ্যার উল্লেখও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পাঠশালা শিক্ষা পুরোপুরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা না হলেও তা ছিল পার্থিব ব্যবহারিক শিক্ষা। বণিক, ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবীর জীবনের সঙ্গে পাঠশালা শিক্ষার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। রামানন্দ যতি সেই বিশেষ

শিক্ষাধারার ছবিই এঁকেছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পাঠশালা শিক্ষার বিষয়ে এমন ভালো বিবরণ আর বড়-একটা পাওয়া যায় না। বোঝা যায় আঠার শতকের আগেই পাঠশালা শিক্ষা একটা প্রথাবদ্ধ রূপ নিয়েছিল। এ শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার কোন সম্পর্ক ছিল না। ব্রাহ্মণেতর বর্ণের পক্ষে এ শিক্ষার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। শ্রীমন্তর বেদ পড়ার অধিকার নেই একথাও রামানন্দ শুনিয়েছেন। আর তাই শ্রীমন্তকে রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্ব বলেছেন। রামানন্দ যতি পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মে আস্থাশীল। ফলে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য তাঁর কাব্যে স্বীকৃত। সেইসঙ্গে 'নব্য ন্যায় এবং ব্যাকরণ পড়া অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী পণ্ডিত গর্দভদের' ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি।[৬৬] অবশ্য তাঁর রাগের কারণ নৈয়ায়িকদের বেদান্ত বিরোধিতা। বাংলায় বেদান্তের চেয়ে ন্যায়ের আদর ছিল বেশি। শঙ্করবাদী রামানন্দ তাই নৈয়ায়িকদের একহাত নিয়েছেন। আসলে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিশ্বাসী বলেই রামানন্দ শ্রীমন্তকে সংস্কৃত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত না করে বৈশ্যবিদ্যায় শিক্ষিত করেছেন। শিক্ষায় বর্ণভেদ মেনে চলার জন্যই তাঁকে শ্রীমন্তের বিদ্যাশিক্ষার এ ছবি আঁকতে হয়েছে। তাতে অবশ্য আমাদের লাভই হয়েছে।

ধর্মমঙ্গল ও লেখাপড়া

এবারে দেখা যাক 'ধর্মমঙ্গলে' কী পাওয়া যায়। রূপরাম, ঘনরাম চক্রবর্তী আর মানিকরাম গাঙ্গুলীর 'ধর্মমঙ্গলে'ও দেখি সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার বিবরণ। তবে সবাই প্রথমে অক্ষর পরিচয় আর বানান শেখার কথা বলেছেন। তিনটি কাব্যেই লাউসেনের লেখাপড়া শুরু হয়েছিল বিদ্যারম্ভ-সংস্কারের পর। একমাত্র ঘনরামে এক ছত্রে অঙ্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঘনরাম লাউসেনকে পাণিনি পর্যন্ত পড়িয়েছেন। তবে অক্ষর পরিচয়ের পর 'আঙ্ক-আঙ্ক ফলাদি বানান' আর 'অষ্টধাতু আর অষ্টসিদ্ধি' শেষ করে কিছুটা 'অঙ্কের ভেদ'ও বুদ্ধি করে পড়েছে লাউসেন।[৬৭]

মানিকরাম 'অনায়াসে দিন দশে বর্ণ পরিচয়' করিয়ে দিয়েছেন। নরোত্তম পণ্ডিত "অকারাদি ক্ষকারান্ত যে যে বর্ণগুলি / ক্রমিক হইতে ভূমে লেখাইল সকলি ॥"[৬৮] তারপর "ব্যাকরণ প্রথমে পড়িল নানামত।" আর "পাণিনি কলাপ ভাষ্য কোষ কতশত ॥" "অবশেষে পড়িলেন সাহিত্য সকল। / মুরারি ভারবি

ভট্টি নৈষধ পিঙ্গল ॥ / কালিদাসকৃত কাব্য অন্য কাব্য কত। / অলঙ্কার জ্যোতিষ আগম তর্কশাস্ত্র ॥ / ছন্দশাস্ত্র পুরাণ পড়িল তারপরে। / উত্তম হইল বিদ্যা নয় দশ বৎসরে ॥"[৬৯] সব শাস্ত্র পড়া শেষ করে লাউসেন 'মল্ল বিদ্যা' অভ্যাস করল। মানিকরামের 'ধর্মমঙ্গলে' সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার বিষয়গুলির একটা পুরো তালিকা পাওয়া যায়। সেই তুলনায় পাঠশালা শিক্ষার কথা খুবই কম। তবে 'ভূমে লেখাইল সকলি' থেকে বোঝা যায় লেখা শেখার পদ্ধতি কী ছিল। চৌত্রিশার মাধ্যমে অক্ষর মুখস্থ করানো হত। আর মাটিতে বা বালিতে সেই অক্ষর লেখানোর অভ্যাস করা হত। মানিকরাম তাঁর 'ধর্মমঙ্গল' রচনা করেন আঠার শতকের শেষ দিকে। পুঁথির কালও সেই সময়ের। রামানন্দ যতির 'চণ্ডীমঙ্গল'ও সমকালের রচনা। বোঝা যাচ্ছে আঠার শতকে বাংলা লেখাপড়া আর অঙ্ক শেখার ধারা প্রথাবদ্ধ রূপ নিয়েছে। পাঠশালা শিক্ষা একটা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে।

রূপরামের 'ধর্মমঙ্গলে'ও আর বেশি কিছু খবর পাই না।[৭০] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে মধ্যযুগে টোলে কি পড়ানো হত তার পুরো বিবরণ পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যগুলিতে। অথচ উপনয়নের কথা তেমন নেই। যদিও হাতেখড়ি বা বিদ্যারম্ভের কথা প্রায় সব মঙ্গলকাব্যেই আছে। মঙ্গলকাব্যের চরিত্রগুলি ব্রাহ্মণ নয় তাই হয়ত উপনয়ন দেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষা দিতে অসুবিধা হয়নি। তারও কারণ কোথাও বেদ বা বেদান্ত পড়ার কোন উল্লেখ নেই। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের লোকের বেদপাঠের অধিকার নেই। তাছাড়া বাংলায় বেদ বা বেদান্ত পড়ার রেওয়াজও তেমন ছিল না। বেদ বা বেদান্ত ছাড়া অন্য সংস্কৃত শাস্ত্র পড়ায় নীচুবর্ণের লোকের যে কোন বাধা ছিল না মধ্যযুগে, তার অজস্র প্রমাণ পাওয়া যায়। মনে রাখতে হবে, রঘুনন্দন বিদ্যারম্ভ-সংস্কার প্রসঙ্গে দ্বিজের উল্লেখ করেননি আর বিদ্যারম্ভের পর বেদ বা বেদান্ত ছাড়া অন্য শাস্ত্র পড়ার বিধান দিয়েছেন।[৭১] মনুস্মৃতি মতে কিন্তু উপনয়নের পর বেদপাঠ না করে অন্য শাস্ত্র পড়া নিষিদ্ধ। মেধাতিথি তাঁর 'মনুস্মৃতি ভাষ্যে' অবশ্য এই নিষেধের ব্যাখা করেছেন এইভাবে যে উপনয়নের পর নিষিদ্ধ হলেও উপনয়নের আগে অন্য শাস্ত্র পড়ায় বাধা নেই।[৭২] মনুর আমলে উপনয়নের পরই শাস্ত্রপাঠ শুরু হত। মেধাতিথি অনেক পরের লোক, কাজেই উপনয়নের আগে শাস্ত্র-পাঠ বিধেয় এরকম ভাষ্য করেছেন। যাইহোক, মধ্যযুগে যদি বেনের ছেলে শ্রীমন্ত সংস্কৃত উচ্চশিক্ষা পেতে পারে তাহলে উনিশ শতকে সংস্কৃত কলেজে

বেনের ছেলের ভর্তি নিয়ে এত জল ঘোলা করার কারণ বোঝা ভার। সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ বৈদ্য ছাড়া অন্য বর্ণের ছেলেদের পড়তে দিতে কতই না টালবাহানা করা হয়েছিল। এবং অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্যন্ত বেনের ছেলের ভর্তিতে আপত্তি করেছিলেন।

ধর্মপুরাণ

এবার দুটি 'ধর্মপুরাণে'র কথায় আসা যাক। ময়ূরভট্টের 'শ্রীধর্মপুরাণে' দেখা যায় রামাই পণ্ডিতের চূড়াকর্ম হয়েছিল তিন বছর বয়সে। কিন্তু হাতেখড়ির কোন খবর নেই। অথচ দেখা যাচ্ছে উপনয়নের আগেই "অল্পদিনে সর্ব্বশাস্ত্রে হোল বিশারদ ॥" তারপর নয় বছর বয়সে উপনয়ন হল। আর উপনয়নের পর "রামাঞি পঠিছে বেদ আনন্দিত মনে"। রামাইয়ের ছেলে ধর্মদাসেরও হাতে-খড়ি হয়েছে বলে জানা যায় না যদিও "পঞ্চম বৎসরে শিশু যখন পড়িল। নানা বিদ্যা রামাঞি তাহারে শিখাইল"।[৭৩] ময়ূরভট্টের 'ধর্মপুরাণে'র সম্পাদক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 'ময়ূর ভট্টকে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান' করেছেন। ছাপা বইয়ের আদর্শ পুঁথি আধুনিক হলেও বিদ্যারম্ভ-সংস্কারের অনুপস্থিতি কি একাদশ শতাব্দীর ঘটনা বলেই? এ প্রশ্নের মীমাংসা করার ক্ষমতা আমার নেই।

যদুনাথের 'ধর্মপুরাণ', যার কাহিনী পরবর্তীকালের রচনা, সেখানে কিন্তু হাতেখড়ির উল্লেখ আছে। ঘনরাম ও মানিকরামের 'ধর্মমঙ্গলে'র বিবরণের সঙ্গে যদুনাথের ধর্মপুরাণের রাজপুত্র লুইধের বিদ্যাশিক্ষার অনেক মিল আছে। যদুনাথ লিখেছেন—

চারি বৎসর পরে হরষিত লুইধরে
শুভক্ষণে হাথে দিল খড়ি।
ক খ (আঠ)ার ফলা আঙ্ক আঙ্ক সিদ্ধি কলা
বানান জানিঞা লেখে অঙ্ক
চারি বিদ্যা চারি পাজি কলাপ আলাপে বুঝি
কোন শাস্ত্রে নাঞি (দিল) ভঙ্গ।

এরপর 'রঘু', 'মাঘ', 'ভট্টি', 'মুগ্ধবোধ', 'জুমর', 'পাণিনি', 'তর্ক', 'পুরাণ', 'কাব্য', 'আগম', 'স্মৃতি', 'নীতি' সব শিখে মল্লবিদ্যা অভ্যাস করে লুইধ।[৭৪]

যদুনাথের 'ধর্মপুরাণে'র বর্ণনার সঙ্গে ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গলে'র বর্ণনা মিলে যায়। যদুনাথের 'ধর্মপুরাণে' দেখি লুইধ শাস্ত্র পড়ার আগে আঠার ফলা আঙ্ক আঙ্ক অর্থাৎ যুক্ত বর্ণমালা শিখে অঙ্ক শিখেছিল। ঘনরামেও দেখি লাউসেন "অকারাদি ককারান্ত জানা হৈল স্বর। / ককারাদি ক্ষকারান্ত হল বর্ণ পার ॥ / অভিলাষে আঙ্ক আঙ্ক ফলাদি বানান। / তিনদিনে দুই ভেয়ে যতনে শিখান ॥ / অষ্ট ধাতু অষ্ট সিদ্ধি সুবস্ত অনর। / পড়িল অঙ্কের ভেদ বুদ্ধে করি ভর ॥"[৭৫] তবে এঁরা দুজনেই অঙ্কের উল্লেখ মাত্র করেছেন। রামানন্দ যতিই একমাত্র অঙ্কের কথা 'বিস্তারিয়া' বলেছেন। আর মানিকরাম ভূমিতে লেখা শেখার কথা বলেছেন। দ্বিজ মাধবও আগে লেখা শেখা পরে পড়ার কথা বলেছেন। এঁদের লেখা থেকে সে সময়ের বাংলা পাঠশালা শিক্ষা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করা যায় সন্দেহ নেই। যদুনাথের আদর্শ পুঁথির কাল ১১৪৭ বঙ্গাব্দ। সম্পাদক পঞ্চানন মণ্ডলের মতে যদুনাথ ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর ধর্মপুরাণ রচনা করেছিলেন।[৭৬] ঘনরামের ধর্মমঙ্গল ১৭১১ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়েছিল বলে জানাচ্ছেন সম্পাদক পীযূষকান্তি মহাপাত্র।[৭৭] আর রামানন্দ যতি তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' রচনা করেছিলেন ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে।[৭৮] দেখা যাচ্ছে, সতের-আঠার শতকে বাংলা পাঠশালা শিক্ষা একটা প্রথাবদ্ধ রূপ নিয়ে পুরোপুরি বিকাশলাভ করেছিল।

মঙ্গলকাব্য ছাড়াও আরো কিছু কিছু বাংলা কাব্যে আমরা পাঠশালা বা লেখাপড়ার কথা পাই। আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যে দেখি—

> পঞ্চম বৎসরে যদি হৈল রাজবালা
> পড়িতে গুরুর স্থানে দিল ছাত্রশালা।
> মহান পণ্ডিত হৈল কন্যা গুণবান।[৭৯]

দৌলত উজির বাহ্‌রাম খাঁ তাঁর 'লায়লী মজনু' কাব্যে লিখেছেন—

> "গুরুর চরণ ভজি, কুতুহলে চিত্ত মজি শাস্ত্রপাঠ পড়ন্ত সদাএ।"[৮০]

আলাওল আর দৌলত উজিরের কাব্যে দেখা যায় মেয়েরাও কিছু লেখাপড়া শিখত। মঙ্গলকাব্যে কিন্তু এবিষয়ে কোন কথা চোখে পড়ে না। মনে হয় মধ্যযুগে মেয়েদের লেখাপড়ার খুব একটা প্রচলন ছিল না। আমরা পরে এ-বিষয়ে আলোচনা করব। শেখ মনোহরের 'শমসের গাজীনামায়' দেখা যায় শামসের গাজী তাঁর 'তোলাবখানায়' অন্নবস্ত্র দিয়ে শতেক ছাত্র পালতেন এবং তাদের কোরান, আরবী, ফারসী এবং বাংলা শেখানো হত।[৮১] কিছুটা যেন মাদ্রাসা শিক্ষার আঁচ পাওয়া যায় এতে। এবিষয়ে আমরা অন্যত্র

আলোচনা করব। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শিক্ষা সম্পর্কে অনেক কথাই আছে। আমরা আতিপাতি করে খুঁজে যেটুকু পেয়েছি সেটুকুরই আলোচনা করেছি।

বাংলা পাঠশালা ও মুসলমান পড়ুয়া

সতের-আঠার শতকে লিপি করা বা রচিত বাংলা কাব্যে পাঠশালার উল্লেখের অভাব নেই। এমনকি মুসলমান ছেলেমেয়েরাও যে পাঠশালায় যেত তার নজির পাওয়া যায় দৌলত উজির বাহরাম খাঁ বিরচিত 'লায়লী-মজনু' কাব্যে। দৌলত উজির লিখেছেন—

> সেই উদ্যানে গিয়া কএস সুমতি।
> গুরুপদ ভজিয়া পড়এ প্রতিনিধি॥
> সুন্দর বালকগণ অতি সুরচিত।
> একস্থানে সভানে পড়এ আনন্দিত॥
> সেই পাঠশালাতে পড়এ কত বালা।
> সুচরিতা সুললিতা নির্ম্মলা উজ্জ্বলা।
> সে সব সুন্দরী মধ্যে এক অকুমারী
> মর্ত্ত্যেত নামিছে যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী॥[৮২]

অন্য এক পাঠে আছে—"সে উদ্যানে চৌয়াড়িতে কএচ সুমতি"। 'লায়লী-মজনু'র সম্পাদক আহমদ শরীফ জানাচ্ছেন যে পুঁথিটি পেশাদার লিপিকার কালিদাস নন্দীর লিপি করা। সম্ভবত ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে এটি লিপি করা হয়। দৌলত উজির ঔরংজেবের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৬৫৮ থেকে ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই 'লায়লী-মজনু' রচনা করেছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন সুখময় মুখোপাধ্যায়।[৮৩] আহমদ শরীফ অবশ্য দাবি করেন যে ১৫৪৩ থেকে ১৫৫৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এটি রচিত হয়।[৮৪] সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতই আমাদের ঠিক মনে হয়। সে যাইহোক, পাঠশালা শিক্ষায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই যোগ দিত তার আরো অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস'-লেখক সতীশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন: "পাঠশালায় পড়োগণ 'সিদ্ধিরস্তু' বলিয়া পাঠ আরম্ভ করিত, এবং নামতা, শতকিয়া, কড়াকিয়া, গণ্ডাবুড়ির হিসাব, কাঠাকালি, বিঘাকালি,

মণকষা প্রভৃতি মুখে মুখে অভ্যাস করিত। পাঠান আমলের শেষ ভাগ হইতে মুসলমানেরা গুরুগিরিতে বিশেষ দক্ষ হইয়াছিলেন। তখন হিন্দুর বাড়িতেও মুসলমান গুরু রাখিবার প্রথা আরম্ভ হইয়াছিল। বুড়ন পরগণা নিবাসী পীরালি মুসলমান গুরুমহাশয়গণ বুড়ানীর খাঁ সাহেব নামে হিন্দুর পাঠশালায় শিক্ষকতা করিয়া ছাত্রবর্গের ভয় ভক্তি আকর্ষণ করিতেন।"[৮৫] পাঠান আমলের শেষ ভাগে না হলেও মুঘল আমলে যে হিন্দু-মুসলমান সকলেই পাঠশালা শিক্ষায় অংশ নিত সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। পঞ্চানন মণ্ডল লিখেছেন, "পাঠশালায় বাঙ্গলা-শিক্ষা সাধারণত ব্রাহ্মণেতর জাতির ছেলেরাই গ্রহণ করিত। মুসলমান ছেলেরাও এই পাঠশালায় পড়িতে পাইত।"[৮৬] তাঁর 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্রে' দেখা যায় "সেখ কালাচাঁদ সনাতন সরকারের পাঠশালায় নিজের দুই ছেলে সেখ ফজলু হোসেন ও তম্বরখদ হোসেনকে ভর্তি করিবার উদ্দেশ্যে গুরুমহাশয়ের নিকট একরার-পত্র লিখিতেছেন।" আসলে পাঠশালার গুরু সনাতন সরকার ও সেখ কালাচাঁদের মধ্যে এক চুক্তি হয় যে আট আনা মাস মাইনা মায় খোরপোষ বাবদ মোট ছাব্বিশ টাকার বিনিময়ে ১২৬৬ সালের শ্রাবণ মাস থেকে ১২৬৭ সালের শ্রাবণ মাসের মধ্যে এই দুই ছেলেকে "পাটহরফ খাতাসোহী ও হিসাব নিকাশী কর্ম্মে তৈআর করিআ দিবো।" আর যদি "উক্ত ছাত্রদির্গেক ত্বআর না করিআ দিতে পারি তবে আপনার টাকা ফিরৎ দিবো।" অবশ্য যদি "আপনার পুত্রদীগর সাভালি করিআ কামাঞী করে এবং অন্ন কোন উজর হয় তবে আমি মহাসয়কে মোং কোলকাতা তক্ চিটী লিখিআ জানাইবো টাকার উপর ··আমার একরার ত্বক মাহীনে লৈইবো কিম্বে এই কর্ম্মে আমার গাফিলি হয় তবে আমি এই চুক্তীর টাকায় বাদ দীব।"[৮৭] পাঠশালা শিক্ষায় মুসলমানের অংশগ্রহণের এটি একটি উল্লেখযোগ্য দলিল। সেইসঙ্গে গুরুমশায়ের দায়িত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য। শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে এই চুক্তিপত্র দেখে ততদিনে শিক্ষা একটা পণ্যে পরিণত হয়েছে এরকম ভাবা হয়ত ঠিক হবে না। তবে পাঠশালা শিক্ষা যে প্রাচীন গুরুশিষ্যের সম্পর্কে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাতে সন্দেহ নেই। বৌদ্ধ আমলেই সম্ভবত বেতনের বিনিময়ে শিক্ষার প্রচলন হয়। পাঠশালা শিক্ষাও মূলত পড়ুয়াদের বেতন বা সিধার উপর নির্ভর করেই চলত। টোল-চতুষ্পাঠী কিন্তু প্রধানত জমিদার বা ধনীদের দানের উপরই নির্ভরশীল ছিল।

মনে রাখতে হবে সতের-আঠার শতকেই উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবিদের বাংলা কাব্যগুলি রচিত হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে বাংলা লেখাপড়ার

প্রচলন না থাকলে এমনটি সম্ভব হত না বলেই অনুমান করি। দৌলত উজির ছাড়াও অন্যান্য মুসলমান কবিদের লেখা বাংলা কাব্যে পাঠশালার উল্লেখ দেখা যায়। সতের শতকে সুকুর মামুদ গোপীচন্দ্রের শিক্ষা সম্পর্কে বলেছেন—"প্রাতঃকালে স্নান করি হস্তে লইলাম খড়ি। / পড়িবার কারণে যাই দ্বিজ গুরুর বাড়ী ॥ / এই রূপে শাস্ত্র পড়ি গুরু পাঠশালে। / উদয় হইল গুরু আমার কপালে॥"[৮৮] এই সময় বাংলা পাঠশালা শিক্ষা যে পুরো বিকাশলাভ করেছিল আর বেশ বিস্তারলাভ করেছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। আঠার-উনিশ শতকে লেখা, পাঠশালায় পড়ানো হত, এমন বিষয়ের পুঁথিও অনেক পাওয়া গেছে। তবে সে আলোচনার আগে মধ্যযুগের বিদেশী পর্যটকদের বিবরণগুলি কি বলে তাও একবার দেখে নেওয়া ভালো।

আলবেরুনী, আঞ্জি ও বৌদ্ধতন্ত্র

এগার শতকের আলবেরুণীর বিবরণে আমরা দেখেছি গৌড়ী অক্ষর পূর্বদেশে প্রচলিত ছিল। তিনি আরো জানাচ্ছেন যে হিন্দুরা 'ওম্' লিখে তাদের পুঁথি শুরু করত। কিন্তু এটি লেখা হত ഗ এইরকম একটি চিহ্ন দিয়ে।[৮৯] এই চিহ্নটি কিন্তু পূর্ববঙ্গে প্রচলিত 'আঞ্জি' বলেই মনে হয়। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে বিদ্যারম্ভের পর, "পুরোহিতের হাত ধরিয়া পরিষ্কার মাটির উপরে একটা কাঠি বা শরের কলম দিয়া 'আঞ্জি ক, খ' লিখিয়াছিলাম। এই 'আঞ্জি' জিনিষটা যে কি তা জানি না। ইংরেজী বর্ণমালার S অক্ষরটা উল্টাইয়া লিখিলে এই আঞ্জির মতন হয়।"[৯০] বিপিনচন্দ্র পাল অনুমান করেছিলেন যে "এই আঞ্জি প্রণবের কোন নামান্তর বা রূপান্তর হইবে।" শূদ্রের ওঁ উচ্চারণের অধিকার ছিল না। তাই হাতেখড়ির সময় ক, খ, লেখার আগে 'মাঙ্গলিক রূপে ভগবানের নাম' লেখার জন্য 'এই আঞ্জি প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল।'[৯১]

উপেন্দ্র ঠাকুরের মতে, "মৈথিলি অক্ষরের শুরুতে যে আঞ্জি চিহ্ন তা তান্ত্রিক প্রভাবের ফল কারণ এটা কুণ্ডলিনী বা মূলাধারের প্রতীক।"[৯২] তাঁর মতে পূর্বভারতীয় অক্ষর বিকাশলাভ করেছে তান্ত্রিক যন্ত্রানুসারে। দীনেশচন্দ্র সরকার অবশ্য এ মত সমর্থন করেন না। পাদটীকায় তিনি লিখেছেন, প্রাচীন সিদ্ধম থেকে আঞ্জির উৎপত্তি।[৯৩] এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন

পঞ্চানন তর্করত্ন 'হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন লেখমালা'য়। তিনি লিখেছেন—"পূববঙ্গে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত প্রদেশে বিদ্যারম্ভের পর বর্ণমালা লিখনের প্রথমেই আঞ্জী ৩ এই চিহ্ন লিখিবার রীতি প্রচলিত ছিল। এবং এই আঞ্জী চিহ্নের পর ককারাদি ব্যঞ্জনবর্ণ ও তৎপরে স্বরবর্ণ লিখিবার প্রথা ছিল। গৌড় বা পশ্চিমবঙ্গে প্রথমে দুইটি দাঁড়ী (॥), তৎপরে 'সিদ্ধিরস্তু,' তারপর স্বরবর্ণ, তৎপরে ব্যঞ্জনবর্ণ লিখিবার প্রথা ছিল। এখন উভয়দেশেই প্রাচীন প্রথা বিলুপ্তপ্রায়। প্রথম ভাগ ইত্যাদি শিশুপাঠ্য পুস্তকের সর্ব্বত্র প্রচলন। তাহাতে (॥) আঞ্জীও নাই 'সিদ্ধিরস্তু'ও নাই।" পঞ্চানন তর্করত্নও উপেন্দ্র ঠাকুরের মতোই মনে করেন—"এই কুণ্ডলিনী শক্তি হইতেই শব্দাদির উদ্ভব হইয়া থাকে। স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ উৎপাদন এই কুণ্ডলিনীরই কার্য্য। বর্ণপ্রসবিনী কুণ্ডলিনীর অবস্থা-ভেদে চারি প্রকার সংজ্ঞা তন্ত্রশাস্ত্রে আছে যথা—(১) পরা (২) পশ্যন্তী (৩) মধ্যমা (৪) বৈখরী। আঞ্জী চিহ্ন মধ্যমা ভাবাপন্ন কুণ্ডলিনী শক্তির চিত্র প্রতিকৃতি।" তিনি আরো বলেন যে—"বলা আবশ্যক যে আঞ্জী ও প্রণব একই বস্তু নহে অর্থাৎ আঞ্জী চিহ্ন ৩ (ৎ) বা 9 ওঁকার সূচক নহে। এত-দুভয়ের প্রভেদ বিষয় এই মাত্র বলিলেই চলিবে যে, আঞ্জী মধ্যমা ভাবাপন্ন বলিয়া কণ্ঠাদি সহযোগে উচ্চারণীয় নহে ; প্রণব বৈখরী ভাবাপন্ন, তাই কণ্ঠাদি সহযোগে উচ্চার্য্য।" তাঁর মতে "গৌড় বা পশ্চিমবঙ্গে যে প্রথমে দুইটি দাঁড়ি (॥) দেওয়া হইত, তাহা ইড়া ও পিঙ্গলার চিত্র-প্রতিকৃতি, মধ্যে সুষুম্না স্থানে আকাশ রূপে প্রদর্শিত, শব্দাভিব্যক্তি আকাশেই হয় এই নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত ইহ'র সহিত জড়িত আছে। ···ইহার পর 'সিদ্ধিরস্তু' গুরুর আশীর্ব্বাক্য এবং শিষ্যের প্রার্থনা বাক্য। তৎপরে অ-কারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণমালা—যাহা তন্ত্র ও শব্দ-শাস্ত্রসম্মত ক্রমযুক্ত, তাহাই পশ্চিমবঙ্গে লিখিত হইত।"[৯৪]

আমরা হিউয়েন সান্ ও আই সিনের বিবরণে 'সিদ্ধিরস্তু'র উল্লেখ পেয়েছি। বৌদ্ধ তন্ত্রের সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকাই স্বাভাবিক। বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে বৌদ্ধদের মাধ্যমে তন্ত্র বাংলায় এসেছে। বৌদ্ধরা বাংলা থেকে বিতাড়িত হলেও রেখে গেল তাদের দেবদেবী আর তন্ত্র। তাঁর মতে কালী, তারা বৌদ্ধদের দেবী। সরস্বতী পূজায় 'ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ' মন্ত্র তন্ত্রের অবদান। তারার সাতটি রূপভেদ হচ্ছে—উগ্রা, হোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী ও ভদ্রকালী। তিনি আরো বলেন—"যদি কালী বৌদ্ধ দেবতা হন, তাহা হইলে বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ জন বৌদ্ধ, ইহার

ভিতর কতক নির্জলা বৌদ্ধ, কতক ভেজালে দেওয়া।"[৯৫] হয়ত পঞ্চানন তর্করত্নের কথাই ঠিক যে "তন্ত্রপ্রধান গৌড়বঙ্গ ও কামরূপ তাহাকে (সিদ্ধিরস্তু) যে আকারেই হউক, প্রথমে স্মরণ করিতে চিরদিন যত্ন করিয়াছে।"[৯৬] তবে পঞ্চানন তর্করত্ন যে লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যারম্ভের পর আগে স্বরবর্ণ, পরে ব্যঞ্জনবর্ণ লেখা হত তা বোধহয় ঠিক নয়। এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে পশ্চিমবঙ্গেও হাতেখড়ির পর ব্যঞ্জনবর্ণ বা 'ক খ গ ঘ' দিয়ে লেখা শুরু হত, পরে স্বরবর্ণ শেখা হত। বাঁকুড়ার যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির বাল্যশিক্ষা এভাবেই শুরু হয়েছিল। যোগেশচন্দ্র রায় হুগলী জেলার দিগ্‌ড়া গ্রামে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

আঞ্জি বা সিদ্ধিরস্তুর ধর্মীয় বা তাত্ত্বিক আলোচনার জটিল আবর্তে না ঢুকেও বলা যায় চিঠিপত্রের শুরুতে হরি বা দুর্গানাম স্মরণের মতই সাধারণ মানুষ হাতেখড়ির সময় আঞ্জি বা সিদ্ধিরস্তু চিহ্ন এঁকে লেখা শুরু করত, লেখাপড়ায় সিদ্ধিলাভের কামনায়। 'সিদ্ধিরস্তু' কথার অর্থও 'সিদ্ধি হোক'। তবে আঞ্জি বা সিদ্ধিরস্তুর ব্যবহারের ইতিহাস দেখে মনে হয় তান্ত্রিক বৌদ্ধের অবৈদিক ভাষা শেখার প্রণালী পাঠশালার বাংলা শেখার প্রথাকে অনেকটা প্রভাবিত করেছিল। তাই বলে পাঠশালা শিক্ষা বৌদ্ধ শিক্ষাধারার প্রভাবেই গড়ে উঠেছিল এরকম একতরফা সরলীকরণ বাঞ্ছনীয় নয়। একই যুক্তিতে কেউ হয়ত আঞ্জি ও তন্ত্রের সম্পর্ক থেকে 'প্রাক্-আর্য' শিক্ষার প্রভাব খুঁজতে পারেন।

আলবেরুণী 'ভূর্জপত্রের পুঁথি', 'গৌড়ী অক্ষর' ও 'অঙ্কের' কথা উল্লেখ করেছেন।[৯৭] আলবেরুণীর বিবরণের ইংরেজি অনুবাদে, "শিশুরা স্কুলে কালো ফলকে সাদা কিছু দিয়া বাঁ থেকে ডাইনে লম্বা দিকে লিখত" এরকম লেখা আছে।[৯৮] আলবেরুণী 'স্কুল' বলতে ঠিক কী শব্দ ব্যবহার করেছিলেন সে খবর না থাকায় বিষয়টা বুঝতে একটু অসুবিধা হয়। তবে শিশুদের মধ্যে লেখা শেখার প্রচলন ছিল এবং লেখা শেখার কোন একরকম ব্যবস্থা ছিল সেটা বোঝা যায়। হয়ত তারা অঙ্কও শিখত। কিন্তু আলবেরুণী শিশুদের অঙ্ক শেখার কোন কথা বলেননি। হিউয়েন সান্ ও আই সিনের বিবরণে দেখা যায় শিশুরা ছয় বছর বয়সে 'সিদ্ধিরস্তু' মুখস্থ করত।[৯৯] লেখা শেখা বা অঙ্কের কথা এঁদের বিবরণে বড় একটা নেই। বোঝা যাচ্ছে একাদশ শতাব্দীতে শিশুদের লেখা শেখার প্রথা চালু হয়ে গেছে। হয়ত শিশুদের

লেখা শেখার ব্যবস্থা হিসাবে লিপিশালার মতো কোন প্রতিষ্ঠানও ছিল। এর বেশি কোন কথা নিশ্চয় করে জানা যায় না।

ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণ, সরকারি ও বেসরকারি নথি

আলবেরুণী এদেশে আসেন এগার শতকে। এই এগার শতক থেকে সতের শতকের আগে পর্যন্ত শিক্ষার অবস্থা কি ছিল তার পরিচয় আমরা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পেয়েছি। সতের শতকে অনেক ইউরোপীয় পর্যটক ভারতে আসেন। এঁদের মধ্যে বার্নিয়ের, ট্যাভার্নিয়ের আর পিয়েত্রো দেল্লা ভেল্লে অন্যতম। এঁরা সকলেই এঁদের বৃত্তান্ত লিখে রেখে গেছেন। বার্নিয়ের তাঁর বিবরণের এক জায়গায় লিখেছেন যে দেশটা 'সর্বব্যাপী অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন' এবং এখানে 'স্কুল কলেজ' প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নেই। কেইবা এগুলি প্রতিষ্ঠা করবে আর কারাই বা এগুলিতে পড়তে আসবে।'[১০০] আবার আর এক জায়গায় সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান হিসাবে বেনারসের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং একে ভারতের এথেনস বলেছেন।[১০১] বার্নিয়েরের বিবরণ থেকে শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও ট্যাভার্নিয়েরের বিবরণে আমরা অনেক খবর পাই।

ট্যাভার্নিয়ের জানাচ্ছেন যে রাজা জয়সিংহ অভিজাত শিশুদের শিক্ষার জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে লিখতে, পড়তে এবং অঙ্ক শেখানো হত। মাটিতে চকখড়ি দিয়ে রাজপুত্রেরা অঙ্ক কষত।[১০২] তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বানিয়াদের শিক্ষার বর্ণনা করেছেন। ব্রাহ্মণরা বেনারসে সংস্কৃত শিক্ষা করত। বানিয়ারা তাদের সন্তানদের রাস্তায় রাস্তায় খেলাধুলা করে সময় নষ্ট করতে না দিয়ে ছোটবেলা থেকেই তাদের অঙ্ক শেখাতে শুরু করে। ফলে এইসব বাচ্চারা অঙ্কে এমন দক্ষ হয়ে ওঠে যে কালি কলম ছাড়াই মুখে মুখে কঠিন কঠিন অঙ্ক করতে পারে। তাদের বাবারাই তাদের এসব শেখায়। ট্যাভার্নিয়ের এদের অঙ্ক শেখার কোন স্কুলের উল্লেখ করেননি।[১০৩] সে যাইহোক ট্যাভার্নিয়েরের বিবরণ থেকে জানা যায় যে তখন লেখা এবং অঙ্ক শেখা বিশেষ চালু ছিল। আর বানিয়ারাই অঙ্কের উপর বিশেষ জোর দিত।

পিয়েত্রো দেল্লা ভেল্লেও সতের শতকেই ভারতে এসেছিলেন। তিনি প্রধানত পশ্চিম ভারত সম্পর্কেই লিখেছেন। একদা তিনি এক মন্দিরের

চাতালে চারজন বালককে এক অদ্ভুত নিয়মে অঙ্ক শিখতে দেখেন। ঘটনাটির তিনি এক বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। এরা সবাই শিক্ষকের কাছ থেকে একটা পাঠ নেয় প্রথমে। তারপর সবাই মিলে সেই পাঠটি মুখস্থ করে। তাদের একজন সুর করে চেঁচিয়ে একটি নিয়ম বলে। যেমন, 'এক একে এক', 'দুই একে দুই'। অন্যরা সবাই একই কথা সুর করে চেঁচিয়ে বলে। আর বলার সঙ্গে চাতালে বেছানো বালিতে আঙুল দিয়ে নামতাটি লেখে। এই ভাবে এরা লেখা ও অঙ্ক শেখে।[১০৪] বাংলা পাঠশালাতেও এইভাবেই লেখা আর অঙ্ক শেখা হত। পিয়েত্রোর বিবরণে অনেক মিশনারী পরিচালিত স্কুলের খবরও পাওয়া যায়।[১০৫]

আঠার শতকে এডওয়ার্ড ইভস্ লণ্ডন থেকে ভারতে আসেন। ইভসের বিবরণে জানা যায় ১৭৫৬-৫৭ খ্রীস্টাব্দে বাংলায় বাংলা লেখাপড়া শেখার অনেক স্কুল ছিল। ইভস্ লিখেছেন—"যদিও শিশুদের লেখাপড়া শেখার অনেক স্কুল ছিল তবে তাতে মাতৃভাষার বেশি আর কিছু শেখানো হত না।"[১০৬] ১৭৯১ সালে ক্রফোর্ড জানাচ্ছেন, "সব শহরে এবং প্রধান প্রধান গ্রামগুলিতে শিশুদের লেখাপড়া শেখার স্কুল ছিল।"[১০৭] তিনি জানাচ্ছেন যে খুঁটির উপর তালপাতার ছাউনি দিয়ে স্কুলঘর তৈরি হত। বালকেরা মাটিতে চাটাইয়ের আসনে বসত। তালপাতার পুঁথি ব্যবহার হত। বাঁ হাতে পুঁথি ধরে ডান হাতে লোহার শলা দিয়ে চেপে লেখা হত। কিন্তু প্রায়ই তারা বালিতে আঙুল দিয়ে লিখত ও অঙ্ক কষত। কখনো কখনো নুড়ি বা কড়ি দিয়ে গোনা অভ্যাস করত।[১০৮] মেয়েরা সাধারণত বাপমায়ের কাছেই শিক্ষা পেত। শিশুরা পরিবারে পেশাগত প্রশিক্ষণ পেত।[১০৯] সাধারণত পারিবারিক পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় যেতে পারত না।[১১০] উইলিয়ম ওয়ার্ড উনিশ শতকের শুরুতে লিখেছেন যে প্রায় সব বড় গ্রামেই সাধারণ স্কুল ছিল।[১১১] তিনি আরো জানাচ্ছেন যে এই গ্রামের স্কুলগুলিতে পার্থিব শিক্ষা দেওয়া হত। পাঠশালার শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছেন—"অক্ষর পরিচিতির পর যুক্তাক্ষর লিখতে হত। তারপর মানুষের নাম, গ্রামের নাম, পশুপাখীর নাম লিখতে হত। পরে অঙ্ক লেখা শুরু হত। পাতায় লেখা শুরু হলে পড়ুয়ারা দিনে দু'বার সর্দার পড়ুয়ার সঙ্গে কড়া, গণ্ডা, বুড়ি, পণ ও কাহনের নামতা মুখস্থ বলত। তারপর এক থেকে একশ পর্যন্ত সংখ্যা ও নামতা মুখস্থ করতে হত। শেষে কলাপাতায় যোগ, বিয়োগ

গুণ, ভাগ, ওজনের নিয়ম ইত্যাদি শিখতে হত। বড় ছেলেরা সাধারণ চিঠিপত্র ও দলিল বা চুক্তিপত্র লিখতে শিখত।"[১১২] উনিশ শতকের প্রথম দশকেই বুকানন হ্যামিলটন জানাচ্ছেন যে, "হিন্দু ও মুসলমান ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষা হত পাঠশালায় কোন গুরুমশাইয়ের কাছে। আর এই গুরুমশাইরা যে কোন বর্ণের ও ধর্মের হত! এইসব পাঠশালা শিক্ষকের জন্য কোন সরকারি অনুদান বা সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল না। জীবনধারণের জন্য এদের সম্পূর্ণভাবে পড়ুয়াদের উপর নির্ভর করতে হত।" তিনি আরো জানাচ্ছেন যে, "পাঁচ বছর বয়সেই শিশুরা পাঠশালায় যেত। এরা একই সঙ্গে লিখতে ও পড়তে শিখত। এই পদ্ধতি ছিল দারুণ।"[১১৩]

রামরসায়ন

এই প্রসঙ্গে উনিশ শতকের প্রথম দিকে রচিত রঘুনন্দন গোস্বামীর 'রামরসায়নে' রাম ও তার ভাইদের লেখাপড়া শেখার বিবরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। রঘুনাথ গোস্বামী লিখছেন—

…পঞ্চম বৎসর আসি দরশন দিলা ॥ / বশিষ্ঠাদি বিপ্রে লয়্যা বসুমতিপতি। / বিদ্যারম্ভাদি করিলা শুদ্ধমতি ॥ / …অকারাদি বর্ণ বোলাইলা রামে পড়ি। / লেখাইলা তিনবার ধরাইয়া খড়ী ॥ / এই রূপ আর তিন জনে আরম্ভিলা।/ দশরথ দক্ষিণাতে দ্বিজেরে তুষিলা ॥ / তবে সবে সখা সঙ্গে সঙ্গতি করিয়া। / অধ্যাপক পাশে পাঠ করেন যাইয়া ॥ / বেদবর্গ বিধাতা সে বিদ্যার লাগিয়া। / অধ্যাপক পদে পড়ে প্রণত হইয়া ॥ / …অল্পকালে অক্ষর শিখিলা চার ভাই। / অপর বালক লেখে তাঁহাদের ঠাই ॥ / যদি কেহ নাহি আস্যে লিখিবার ডরে। / ধরিয়া আনেন সবে তারে গিয়া ঘরে। /…কিছু কালে কৈলা ব্যাকরণ আরম্ভণ।/ সংস্কৃতাদি অষ্টাদশ ভাষা বিবরণ ॥ / গীত বাদ্য নিত্য চিত্র কর্ম্ম আদি যত। / চতুঃষষ্টি কলা শাস্ত্র পড়েন সতত ॥…

…পুঁথি বাম কক্ষান্তরে, দোয়াত দক্ষিণ করে, চারি ভাই কিবা সে বিরাজ।/ সব সখা সঙ্গে মেলি পদব্রজে যান চলি, নানা রঙ্গে বাহু দোলাইয়া। / পথে যাইবার কালে, পরস্পর সবে মিলে, শাস্ত্র কথা যান বিচারিয়া ॥[১১৪]

বাংলা পাঠশালার একটি সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে। প্রথমে হাতেখড়ি, তারপর অক্ষর পরিচয় ও লেখা শেখা। সর্দার পড়ুয়ার কাছে অন্যদের পড়া শেখা।

পাঠশালা পালানো পড়ুয়াদের পাকড়াও করে আনা। বই বগলদাবা করে দল বেঁধে পাঠশালায় যাওয়া। উনিশ শতকের অনেক পাঠশালা পড়ুয়ার স্মৃতিকথার সঙ্গে মিলে যায় এ বর্ণনা। এখানে দেখা যাচ্ছে অক্ষর পরিচয় ও লেখা শেখার পর রামেরা চার ভাই সংস্কৃত উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে। অনেক টোলের পড়ুয়ারই অক্ষর পরিচয় হত পাঠশালায়। রামরসায়নে পাঠশালায় কেমন পড়া হত তার পরীক্ষার কথাও পাই। যেমন—"কোন কোন দিনে কোলে করিয়া নৃপতি। / পাঠ পরিচয় নেন প্রীতি যুক্ত মতি ॥ / জিজ্ঞাসিবা মাত্র তার করেন উত্তর। / শুনিয়া সভার সব বিস্মিত অন্তর ॥"[১১]

লালবিহারী দে, যিনি ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে জন্মেছিলেন, তাঁর পাঠশালা জীবনের স্মৃতিকথায়ও এইরকম পরীক্ষার কথা পাই। লালবিহারী দের বয়স পাঁচ বছর হলে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর হাতেখড়ি হয়। পরদিন সকালে তিনি গ্রামের পাঠশালায় পড়তে যান। গুরুমশাই মাটিতে বাংলা অক্ষর লিখে দেন আর লালবিহারী দে তার উপর খড়ি বুলিয়ে লেখা মক্স করেন। পাঠশালায় লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখানো হত। উঁচুমানের পড়ুয়ারা জমিদারি হিসাব আর চিঠি লেখাও শিখত। মানসিক অঙ্ক আর সুন্দর ছাঁদে অক্ষর লেখার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হত। একমাত্র বই যা সাধারণত পড়ানো হত তা 'শিশুবোধক'। পড়ুয়ারা সামর্থ্য অনুসারে কেউ এক আনা, কেউ দু আনা বেতন দিত আবার গরিব পড়ুয়ারা সামান্য সিধা দিয়েই রেহাই পেত। গুরুমশাইয়ের মাসের আয় ছিল দু টাকার মত। পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল প্রায় ত্রিশ জন। তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখ ছাড়াও অন্যান্য নিম্নবর্ণের পড়ুয়া ছিল।

লালবিহারী দের স্মৃতিকথায়ও সর্দার পড়ুয়া আর পলাতক পড়ুয়া ধরে আনার কথা আছে। পরীক্ষা সম্পর্কে তিনি লেখেন যে সন্ধ্যায় বৈঠকখানা ঘরে খুড়া মশাইয়ের সামনে তাঁকে পরীক্ষা দিতে হত। ছেলেরা একে 'ঘোষা' বলত। মুখে মুখে কঠিন কঠিন অঙ্ক বলতে হত।[১১৬] 'রামরসায়নে'ও পরীক্ষার এই 'ঘোষা' পদ্ধতির কথা পাই। লালবিহারী দের পাঠশালার স্মৃতি পাঠশালা শিক্ষাপদ্ধতির একটি ঐতিহাসিক দলিল সন্দেহ নেই। তাঁর এই ছেলেবেলাকার স্মৃতির সঙ্গে তাঁর 'গোবিন্দ সামন্ত' বা 'Bengal Peasant Life' বইটি মিলিয়ে পড়লে বাংলা পাঠশালার ঐতিহ্য ও সমস্যার ইতিহাস সম্যক বোঝা যায়।

রামচন্দ্রের লেখাপড়ার বিবরণে অবশ্য অঙ্কের কোন উল্লেখ নেই। মনে

হয় সংস্কৃত উচ্চশিক্ষা যারা শিখত তারা বড় একটা অঙ্কের ধার ধারত না। কিন্তু তাদেরও বাংলা অক্ষর পরিচয় ও লেখা শিখতে হত। কারণ তখন সংস্কৃত পুঁথিগুলি সাধারণত বাংলা হরফেই লেখা হত। যাইহোক, আমাদের উপরের আলোচনায় একথা স্পষ্ট যে সতের-আঠার শতকে বাংলা পাঠশালা শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল, আর বেশ গতিশীল হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন বর্ণের লোকেরা পাঠশালা শিক্ষা নিত। মুসলমান পড়ুয়ার নজিরও খুবই মেলে। এমনকি নিম্নবর্ণের ধনী ঘরের ছেলেরা সংস্কৃত উচ্চশিক্ষাও পেতে পারত বলে মনে হয়। যদিও এরকম নজির খুব বেশি নেই। মধ্যযুগের পাঠশালা শিক্ষার গতিশীলতার ছবিটা বেশ ভালো বোঝা যায় 'অ্যাডাম রিপোর্ট' থেকে। ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা চালু হওয়ার ঠিক আগে দেশজ প্রাথমিক শিক্ষা কিরকম ছিল তার একটা বাস্তব ছবি পাওয়া যায় এই রিপোর্টে।

অ্যাডাম রিপোর্ট

দেশজ পাঠশালা শিক্ষা সম্পর্কে সরেজমিন তদন্ত করে উইলিয়াম অ্যাডাম ১৮৩৫, ৩৬ ও ৩৮ খ্রীস্টাব্দে তিনটি বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করেন শিক্ষা কমিটির কাছে। তিনি জানাচ্ছেন যে, তখন বাংলা ও বিহারের দেড় লক্ষ গ্রামের বেশির ভাগ গ্রামেই একটি করে পাঠশালা ছিল। তাঁর মতে তখন এক লক্ষ দেশজ পাঠশালা ছিল গরিব শ্রেণীর শিশুদের মাতৃভাষায় লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার জন্য [১১৭] ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে জানাচ্ছে যে এরকম পঞ্চাশ হাজার পাঠশালাকে ১৮৮১-৮২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে শিক্ষা বিভাগের আওতায় আনা হয়েছিল।[১১৮] অ্যাডামের রিপোর্ট থেকে বোঝা যায় এই পাঠশালা শিক্ষা বিশেষ বিস্তারলাভ করেছিল। অ্যাডাম আরো জানিয়েছেন যে এই পাঠশালা শিক্ষার সঙ্গে টোল বা চতুষ্পাঠীর সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার কোন সম্পর্ক ছিল না। পাঠশালা ও টোল ছিল পুরোপুরি আলাদা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ দুটি শিক্ষাধারা।[১১৯] সব বর্ণের ও ধর্মের শিশুরাই পাঠশালায় পড়তে আসত। শিক্ষকরাও ছিলেন সব বর্ণের ও ধর্মের। তবে এঁদের বেশির ভাগই ছিলেন কায়স্থ।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে উইলিয়াম ওয়ার্ড, বুকানন হ্যামিলটন এবং উইলিয়াম অ্যাডাম বাংলা পাঠশালা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন। এঁদের লেখা

বিবরণ বাংলা পাঠশালার ইতিহাসের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল এবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এঁদের মধ্যে আবার উইলিয়াম অ্যাডামই একমাত্র ব্যক্তি যিনি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে সরেজমিন তদন্ত করে এবং আগের লেখাগুলি খতিয়ে দেখে দেশজ শিক্ষা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পেশ করেছেন। কাজেই আমরা অ্যাডামের প্রতিবেদন নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করব।

অ্যাডাম রিপোর্টে দেখা যায় যে, বর্ধমানের ১৩টি থানায় ৬২৯টি পাঠশালায় ৬৩৯ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩৬৯ জনই ছিল কায়স্থ। বাকিদের ১০৭ জন ব্রাহ্মণ, ৫০ জন সদ্‌গোপ, ৩০ জন আগুরি, ১৩ জন বৈষ্ণব, ১০ জন তেলি, ৯ জন ভট্টা (?), ৬ জন গন্ধবণিক, ৬ জন কৈবর্ত্ত, ৫ জন চণ্ডাল, ৪ জন কুমার, ৩ জন নাপিত, ৩ জন সুবর্ণবণিক, ২জন গোয়ালা, ২ জন বাগ্‌দী, আর নাগ, তাঁতী, দৈবজ্ঞ, বৈদ্য, যুগী, বাড়ুই, কামার, ময়রা, ধোবা, রাজপুত ও কলু একজন করে। ৯ জন মুসলমান আর ৩ জন খ্রীস্টান।[১২০] বীরভূমে মোট যে ৪১৪ জন শিক্ষক সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া হয় তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ আর সদ্‌গোপ ছিল মোট ৩৫৪ জন। বাকিরা অন্য বর্ণের বা ধর্মের। একমাত্র কায়স্থ শিক্ষকের সংখ্যাই ছিল ২৫৬ জন। ১ জন ছিল মুসলমান শিক্ষক আর ৪ জন খ্রীস্টান। দক্ষিণবিহারে ২৮৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ২৭৮ জনই ছিল কায়স্থ। মুর্শিদাবাদে ৬৭ জন শিক্ষকের ৩৯ জন ছিল কায়স্থ।[১২১]

পড়ুয়ারাও এইরকম বিভিন্ন ধর্ম বা বর্ণ সম্প্রদায় থেকে এসেছিল। বর্ধমানের ৬২৯টি পাঠশালার মোট পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ১৩০০০-এর কিছু বেশি। প্রতি পাঠশালায় গড়ে ২১ জন লেখাপড়া করত। এদের মধ্যে ৩,৪২৯ জন ছিল ব্রাহ্মণ, ১,৮৪৬ জন কায়স্থ, ১,২৫৪ জন সদ্‌গোপ। বাকিদের ৭৬০ জন একেবারে নীচের স্তরের বিভিন্ন বর্ণের মানুষ। ১০৮ জন বৈদ্য, ১৬১ জন ক্ষত্রিয়, ৭৬৯ জন মুসলমান আর ১৩ জন খ্রীস্টান ছাড়া বাদবাকি পড়ুয়ারা এসেছিল মাঝের বর্ণের থেকে।[১২২] বীরভূমের পড়ুয়াদের ছবিও প্রায় একই রকম। অ্যাডাম জানাচ্ছেন, একেবারে নীচের বর্ণের এবং শ্রেণীর শিশুরা ক্রমেই বেশি বেশি করে পাঠশালায় পড়তে আসছিল। তিনি এবিষয়ে একটা গতিশীলতা লক্ষ করেছিলেন।[১২৩] তাঁর মতে পাঠশালা ছিল মধ্য ও গরিব শ্রেণীর শিক্ষার জায়গা। খেয়াল করলে দেখা যাবে বর্ধমানের মোট তের হাজার পাঠশালা পড়ুয়ার অর্ধেকই নীচুবর্ণ থেকে এসেছিল।

ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা চালু হওয়ার সঙ্গে কিন্তু এই গতিশীলতা থেমে যায়।

আসলে ব্রিটিশ অ্যাংলো-বেঙ্গলী স্কুল শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশজ পাঠশালা শিক্ষা তার জীবনীশক্তি হারাতে থাকে। আগে উঁচুশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা সংস্কৃত বা আরবী-ফারসী পড়ত। অ্যাডামের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে প্রায় সমান সংখ্যক হিন্দু ছাত্র সংস্কৃত ও আরবী-ফারসী স্কুলে পড়ত। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল আরবী-ফারসী স্কুলের মোট পড়ুয়ার বেশির ভাগই ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু। আরবী-ফারসী স্কুলের মোট ৩৬৬৩ জন পড়ুয়ার মধ্যে ২০৯৬ জনই ছিল হিন্দু।[১২৪] সংস্কৃত টোল বা চতুষ্পাঠীতে কিন্তু মুসলমান পড়ুয়ার দেখা পাওয়া যেত না। এবিষয়ে ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত রামমোহন রায়ের একটি লেখা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রামমোহন লিখেছেন—

"অপর আমার পিতার পূর্বপুরুষদের ব্যবহারানুসারে এবং পিতার বিশেষ ইচ্ছাক্রমে আমি পারস্য ও আরবীয় বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, যেহেতুক মুসলমানের আদালতে কর্ম্মাকাংক্ষিরদের এই দুই ভাষায় বিদ্যার অত্যাবশ্যক এবং আমার মাতামোহেরদের ব্যবহারানুসারে আমি সংস্কৃত ভাষা ও ধর্মশাস্ত্রের পাঠারম্ভ করিলাম, ঐ সকল শাস্ত্রের মধ্যে হিন্দুরদের যে সকল বিদ্যা ও ব্যবস্থা সমুদায়ই আছে।"[১২৫]

মুঘল ও ব্রিটিশ আমলে বাংলার জমিদাররা বেশির ভাগই ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থান এই দুই আমলেই তাদের রাজভাষা শিখতে আগ্রহী করেছিল। আবার সমাজে নিজের অবস্থানের নিরাপত্তার স্বার্থেই এরা সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করত। বাংলা ভাষার প্রতি বা বাংলা পাঠশালা শিক্ষার প্রতি এদের কোন শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ ছিল না। না থাকারই কথা। এতে অবশ্য প্রাক্-ব্রিটিশ আমলে সাধারণ মানুষের লাভ বই ক্ষতি হয়নি। সাধারণ মানুষ নিজেদের মতো করে নিজেদের শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। সাধারণ মানুষের শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে পাঠশালাগুলি পুরোপুরি আলাদাভাবে গড়ে উঠেছিল। পাঠশালা শিক্ষকদের পাঠশালা পড়ুয়ার উপর নির্ভর করতে হত, ফলে বেশি করে পড়ুয়া যোগাড় করাই ছিল তাদের স্বার্থ। আর তাই পাঠশালা শিক্ষা ক্রমেই নীচের মানুষকে আরো বেশি করে টানছিল।[১২৬]

ব্রিটিশ আমলের প্রাথমিক স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল, আর কলেজের ক্রমসম্পর্কিত গোটা ব্যবস্থা আগের আলাদা শিক্ষাব্যবস্থার গোড়া-ধরে টান মারল। বিভাগীয়

প্রাথমিক স্কুলের দাপটে পাঠশালা শিক্ষার দম ফুরিয়ে গেল। এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থা উঁচুশ্রেণীর, বিশেষ করে নতুন গজিয়ে ওঠা ভদ্রলোক শ্রেণীর পক্ষে যতটা প্রয়োজনীয় ছিল নীচুশ্রেণীর পক্ষে ঠিক ততটাই অপ্রাসঙ্গিক ছিল। উঁচু ও নীচুশ্রেণীর একই শিক্ষাব্যবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই নীচুবর্ণের ও শ্রেণীর শিশুরা হয়ে গেল অবাঞ্ছিত। শিক্ষা হয়ে উঠল উঁচুশ্রেণীর একচেটিয়া কারবার। আর নীচুবর্ণের ও শ্রেণীর শিশুরা শিক্ষার আঙিনার বাইরে চলে গেল।

যাইহোক, আঠার শতকের বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ ও উনিশ শতকের গোড়ার সরকারি-বেসরকারি নথি ও সাক্ষ্য থেকে জানা গেল যে তখন পাঠশালা শিক্ষা সারা দেশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এবং সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ ক্রমেই বেশি করে এই শিক্ষায় অংশ নিচ্ছিল। এবার দেখা যাক পাঠশালায় পড়ানোর পুঁথিগুলি, পাঠশালার পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে আমাদের কতটা ওয়াকিবহাল করে। পাঠশালার পাঠ্যবিষয়গুলি কি ছিল আর সেগুলি সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবনের সঙ্গে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ ছিল সে আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য।

পাঠশালার পুঁথি : চৌত্রিশা ও বাংলা পঞ্চাশদ্ বর্ণ

পাঠশালার পুঁথির বিবরণ পাই আমরা প্রধানতঃ আবদুল করিমের 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' আর পঞ্চানন মণ্ডল সংকলিত 'পুঁথি-পরিচয়' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে। একাধিক চৌতিশার বিবরণ পাওয়া যায় এঁদের পুঁথির তালিকায়। আবদুল করিমে দেখি 'চৌত্রিশ অক্ষরের চৌতিশা', 'রাধিকার চৌতিশা', 'কালকেতুর চৌতিশা' 'সুধন্ধার চৌতিশা', 'দময়ন্তির চৌতিশা', 'কৃষ্ণের একপদী চৌতিশা'র উল্লেখ।[১২৭] 'পুঁথি-পরিচয়' প্রথম খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ দাস রচিত 'অক্ষর বর্ণন' নামে একটি অক্ষর শেখার পুঁথির বিবরণ আছে। তাতে দেখি—

ক : বলে কৃষ্ণ কথা সুন একমন হঞা / কহিব কৃষ্ণের চৌত্রিশ অক্ষর লঞা।

খ : বলে খেতি তলে মনস্থ দেহ প্যাঞা / থানিক থাকরে ভাই সাধু সঙ্গ লঞা।

গ : বলে গোবিন্দ নাম বড়ই মধুর/গোবিন্দ ভজএ জেই সে বড় চতুর।[১২৮]

এটিও আসলে একটি চৌত্রিশার পুঁথি। লিপিকাল ১২২৩ সাল। খুব

পুরনো পুঁথি নয়। তবে মঙ্গলকাব্যে চৌত্রিশার উল্লেখ থেকে বোঝা যায় চৌত্রিশার সাহায্যে বর্ণপরিচয়ের প্রথা বহুকালের। আসলে এইসব চৌত্রিশা থেকেই আমরা বুঝতে পারি পাঠশালায় বর্ণপরিচয় হত কিভাবে। আধুনিক 'অ-এ অজগর আসছে তেড়ে', 'আ-এ আমটি আমি খাব পেড়ে' চৌত্রিশারই রকমফের মাত্র। একটা বিষয়ে অবশ্য কিছুটা খটকা আছে। বাংলা বর্ণমালার সংখ্যা ৪৭ আর 'ক্ষ' আর 'ৎ' বাদে ৪৫টি। অথচ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের চৌত্রিশাতে পাই ৩৪টি অক্ষর। পঞ্চানন মণ্ডল লিখছেন—"বর্তমানে 'ক্ষ' ও 'ৎ' বাদে বাঙ্গালা বর্ণমালায় স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ মোট ৪৬টি রহিয়াছে; কিন্তু পূর্বে বিদ্যা আরম্ভ হইত ৩৪ অক্ষরের বর্ণমালা সহযোগে। এই ৩৪ অক্ষরের ধারা আমরা বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যে 'চৌত্রিশা'-স্তরের মধ্যে রক্ষিত দেখিতে পাই।"[১২৯] সমস্যার সুরাহা কিন্তু হল না। আই সিনের বিবরণে দেখি ৪৯টি অক্ষরের উল্লেখ। হিউয়েন সান্ ৪৭টি অক্ষরের উল্লেখ করেছেন।[১৩০] আর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অ-কারাদি ক্ষ-কারান্ত পঞ্চাশদ্ বর্ণের উল্লেখ দেখি।

তিনটি ছাপা 'শিশুবোধকে' আমরা অক্ষরসংখ্যা পেয়েছি তিন রকম। বেণীমাধব ভট্টাচার্য 'সংশোধিত' 'শিশুবোধকে' আছে ১৪টি স্বর আর ৩৭টি ব্যঞ্জনবর্ণ, মোট ৫১টি বর্ণ। তারাচাঁদ দাস[১৩১] 'সংগৃহীত' 'শিশুবোধকে' দেখি ১৬টি স্বর আর ৪০টি ব্যঞ্জন, মোট ৫৬ বর্ণ।[১৩২] পূর্ণচন্দ্র শীল সম্পাদিত 'শিশুবোধকে' পাই ১৬টি স্বর আর ৪১টি ব্যঞ্জন, মোট ৫৭টি বর্ণ।[১৩৩] বেণীমাধব ভট্টাচার্যের বইয়ে স্বরবর্ণের মধ্যে 'অং' ও অঃ' নেই; আর ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে 'ং' 'ঃ' 'ঁ' নেই। তারাচাঁদ দাসের বইয়ে ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে 'ক্ষ' নেই। 'অং' 'অঃ' 'ক্ষ' 'ং' 'ঃ' 'ৎ' 'ঁ' এই ৭টিকে বর্ণমধ্যে ধরলেও মোট বর্ণ দাঁড়ায় ৫০টি। কাজেই চৌত্রিশ অক্ষরের মীমাংসা হয় না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' বা তার প্রভাবে লিখিত বইগুলিও এ সমস্যার সুরাহা করতে আমাদের কোন সাহায্য করে না। ঈশ্বরচন্দ্রের 'বর্ণপরিচয়ে' আছে ১২টি স্বর আর ৩৯টি ব্যঞ্জনবর্ণ। তিনি স্বরবর্ণ থেকে 'অং' 'অঃ' 'দীর্ঘ ঋ' 'দীর্ঘ ৯' বাদ দেন। আর ব্যঞ্জন থেকে 'ক্ষ' ও 'ৎ' ছেঁটে দেন।[১৩৪] যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ঈশ্বরচন্দ্রকেই অনুসরণ করেন। তাঁর 'শিক্ষাসোপানে'ও দেখি ১২টি স্বর আর ৩৯টি ব্যঞ্জন।[১৩৫] রামসুন্দর বসাকের 'বাল্যশিক্ষা'য় স্বরবর্ণ ১২টি, ব্যঞ্জনবর্ণ ৪০টি। 'ক্ষ' বাদ গেছে। আর 'ড়' 'ঢ়' 'য়' 'ৎ' 'ঁ' কে

আলাদা করে ধরা হয়েছে।[১৩৬] ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে ছাপা মোহিনীমোহন বসুর 'খোকার বই'-তেও দেখি ১৩ স্বর আর ৪০ ব্যঞ্জন। মোহিনীমোহন 'দীর্ঘ ঋ'-কে স্বরবর্ণে জায়গা দিয়েছেন তাই তাঁর স্বরের সংখ্যা তের।[১৩৭]

এদিকে হিন্দু স্কুল পাঠশালার ক্ষেত্রমোহন দত্ত 'সংগৃহীত' 'শিশু সেবধি বর্ণমালা'য় আছে ৩৪ ব্যঞ্জন আর ১৬ স্বর।[১৩৮] ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির 'বর্ণমালা'য়ও আছে ৩৪ ব্যঞ্জন আর ১৬ স্বর।[১৩৯] কিছু পরে ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে ছাপা ক্যালকাটা খ্রীষ্টিয়ান স্কুল বুক সোসাইটির 'জ্ঞানারুণোদয়ঃ অর্থাৎ বালক শিক্ষার্থ প্রথম সহজ উত্তরোত্তর কঠিন পাঠযুক্ত বঙ্গভাষার বর্ণমালা'-য় দেখি ৩৪ ব্যঞ্জন আর ১৪ স্বর। স্বরবর্ণ থেকে 'অং' আর 'অঃ' বাদ দেওয়া হয়েছে।[১৪০] কিন্তু ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে ছাপা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা'-তে পাই ১৬ স্বর আর ৩৪ ব্যঞ্জন। মোট ৫০ বর্ণ।[১৪১] আবার রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠে' দেখি ১১টি স্বরবর্ণ আর ৩৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ।[১৪২] 'শিশু সেবধি বর্ণমালা', স্কুলবুক সোসাইটির 'বর্ণমালা' আর 'জ্ঞানারুণোদয়ে' ব্যঞ্জনবর্ণ আছে আগে। আর পরে দেওয়া আছে স্বরবর্ণ। ব্যঞ্জনবর্ণ থেকে 'ড়, ঢ়, য়, ং, ঃ, ঁ, ৎ' এই সাতটি বাদ গেছে। কিন্তু 'ক্ষ'-কে ধরা হয়েছে। 'শিশুশিক্ষা'তেও মদনমোহন এই নীতি নিয়েছেন। আসলে এই ষোল স্বর আর চৌত্রিশ ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়েই বাংলা 'অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশদ বর্ণ।' মদনমোহন তর্কালঙ্কার বাংলা পঞ্চাশ বর্ণের ধারা মেনেই 'শিশুশিক্ষা' রচনা করেছিলেন।

'সহজ পাঠে' রবীন্দ্রনাথ স্বরবর্ণ থেকে 'দীর্ঘ ঋ, ৯, দীর্ঘ ৯', অং, অঃ', এই পাঁচটিকে বাদ দিয়েছেন। ব্যঞ্জনে 'ক্ষ' শুদ্ধ ৩৪ অক্ষর রেখেছেন, 'শিশুশিক্ষা' আর 'বর্ণমালা'র মতোই। চৌত্রিশ অক্ষরের চৌতিশা এবার যেন একটু খোলসা হল। চৌতিশা আসলে চৌত্রিশ ব্যঞ্জনবর্ণের পরিচয়। বাংলা পাঠশালায় অক্ষর পরিচয় হত ৩৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে। স্বরের মূল কাজ ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দগঠন করা। ব্যঞ্জনবর্ণ শব্দে জায়গা নেয় নিজ রূপ বজায় রেখেই কিন্তু স্বরের আকৃতি যায় পাল্টে। 'শিশু সেবধি বর্ণমালা', স্কুল বুক সোসাইটির 'বর্ণমালা' ও 'জ্ঞানারুণোদয়ে' বাংলা পাঠশালার রীতি অনুসারেই ব্যঞ্জনবর্ণ আগে দেওয়া হয়েছে। বেণীমাধব ভট্টাচার্যের 'শিশুবোধকে'ও ব্যঞ্জনবর্ণ আগে, পরে স্বরবর্ণ। চৌতিশাগুলিও ক খ গ ঘ এই ক্রম দিয়েই শুরু। 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'তে দেবীর চৌত্রিশ অক্ষরে নামকথনে যে ক্রম পাই তা এইরকম—ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ই(ঞ), ট, ঠ, ড, ঢ, ণ (রয়ণো রয়ণা রামি), ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য,

(জমের নন্দিনী), র, ল, ব, শ, (সৈলসুতা), স, হ, ক্ষ।[১৪৩] কেবল 'ঙ' আর 'ষ' নেই। আসলে 'শ'-এর জায়গায়ও 'স' ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলায় 'শ, ষ, স'-এর উচ্চারণ এ ই রকম। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বানানের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে উচ্চারণভিত্তিক বানান লেখা হত। ফলে 'যম' লেখা হত 'জম' এই বানানে। যাইহোক, চৌতিশা যে চৌত্রিশ ব্যঞ্জন তাতে সন্দেহ নেই। উনিশ শতকের মাঝামাঝিও যাঁরা জন্মেছিলেন তাঁদের লেখা শুরু হয় ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে। স্বরবর্ণ শেখেন তাঁরা ব্যঞ্জনবর্ণের পর। কৃষ্ণকুমার মিত্র ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বছর বয়সে তাঁর হাতেখড়ি হয়। পুরোহিত তাঁকে "আঁজি শ্রী. ক, খ, গ, ঘ, চ" লেখান। পরে তিনি স্বরবর্ণ শেখেন। তাঁর শিক্ষা শুরু হয়েছিল 'শিশুবোধক' দিয়ে। বিপিনচন্দ্র পাল, যিনি ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে শ্রীহট্টের অন্তর্গত পৈল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরও 'আঞ্জি ক, খ' লিখে লেখা শুরু হয় এবং 'শিশুবোধক' দিয়ে পড়া শুরু হয়। এটাই তখন রেওয়াজ ছিল।[১৪৪] যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, যিনি ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে জন্মেছিলেন, তিনিও হাতেখড়ির পর 'ক, খ, গ, ঘ' লেখেন পরে 'শিশুবোধক' পড়েন।[১৪৫] পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের এই মনীষীদের বাল্যশিক্ষার বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে লেখা শেখা শুরু আর শিক্ষা শুরু 'শিশুবোধক' দিয়ে। বোঝা যায় দুই বঙ্গেই এই বই পড়া হত এবং লেখা শেখার একই প্রথা চালু ছিল।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে সম্ভবত মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা' থেকেই স্বরবর্ণ আগে আর ব্যঞ্জনবর্ণ পরে দেওয়ার রীতি শুরু হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বোধহয় প্রথম বাংলা পাঠ্য বইয়ে 'ক্ষ' বাদে ৩৯ ব্যঞ্জনের রেওয়াজ চালু করেন। তিনিই 'দীর্ঘ ঋ, দীর্ঘ ৯, অং, অঃ' স্বরবর্ণ থেকে বাদ দেন। রবীন্দ্রনাথ '৯'-কেও ছাঁটাই করে ১১টি স্বরবর্ণে পাঠ দেন। কিন্তু 'ক্ষ' শুদ্ধ চৌত্রিশ ব্যঞ্জনের পুরনো বাংলা রীতি ছাড়েন না।

বাংলা ব্যাকরণ মতে স্বরবর্ণ এগারটি। চারটি হ্রস্বস্বর 'অ, ই, উ, ঋ' আর সাতটি দীর্ঘস্বর 'আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ'। '৯'-কার বাংলায় ব্যবহার হয় না। আর ব্যঞ্জনবর্ণ 'ক্ষ' সমেত ৩৪টি। ক-বর্গ, চ-বর্গ, ট-বর্গ, ত-বর্গ, প-বর্গ এই পাচটি বর্গে ২৫ অক্ষর; 'য, র, ল, ব' এই চারটি অন্তঃস্থ বর্ণ; আর 'শ, ষ, স, হ' এই চারটি উষ্মবর্ণ। মোট হল ৩৩টি বর্ণ। সঙ্গে 'ক্ষ'-কে নিলে হয় ৩৪ বর্ণ। 'ং, ঃ, ँ' এই তিনটিকে বলে অযোগবাহ। মধ্যযুগের বাংলায় এগুলির ব্যবহার

বড় একটা দেখা যায় না। এগুলি ব্যবহার না করেও স্বচ্ছন্দে বাংলা লেখা যায়। আর 'ড়, ঢ়, য়, ৎ' এই চারটি আধুনিক বর্ণ।[১৪৬] আমাদের দেখা 'শিশুবোধক' ও 'বাল্যশিক্ষা' বিশ শতকে ছাপা। মনে হয় 'শিশুশিক্ষা' ও 'বর্ণপরিচয়ে'র দ্বারা এগুলি প্রভাবিত। যাইহোক, রবীন্দ্রনাথের বর্ণসংস্কার নিঃসন্দেহে বাংলার প্রচলিত বিধিসম্মত।

স্যাখত : শুভঙ্করের আর্যা

পাঠশালার আর একটি জরুরি পুঁথি 'স্যাখত' বা 'সেহাখত'। 'সেহা' ফারসী শব্দ অর্থ 'হিসাব' আর 'খত' চিঠি বা নথি। 'সেহাখত' কথার অর্থ হিসাবের নথি। 'শিশুবোধকে' 'সেহাখত সন্ধান' নামে একটি বিষয় আছে। তাতে জমিজমার হিসাব, টাকা-পয়সার হিসাব রাখার নিয়ম বর্ণনা করা আছে। শেষে আছে—"তলবে উস্থল দিলে বাকী জানা যায়। / কার বাকী হয় কার ফাজিল বুঝায় ॥ / তলবে ফাজিল আর উস্থল বাকীতে। / বাহির তেরিজ দিয়া হয় মিলাইতে ॥"[১৪৭] জমিদারি সেরেস্তার কাজের জন্য 'সেহাখত সন্ধান' জানা বিশেষ জরুরি ছিল। খাজনাপত্র ইত্যাদির হিসাব রাখার নিয়ম শেখার জন্যও এর দরকার হত।

'পুঁথি-পরিচয়ে'র প্রথম খণ্ডে 'স্যাখত' শিরোনামে দশজন লেখকের ভণিতা-যুক্ত সন্দর্ভের নমুনা দেওয়া হয়েছে। লিপিকাল দেওয়া আছে ১০৮৯-৯৩ সাল (মল্লাব্দ নয়) অর্থাৎ সতের শতকের শেষ দিকে লিপি করা হয়েছে। এতে চিঠি লেখার ধারা, পাঠশালা শিক্ষার ধারা, অঙ্কের উদাহরণ সবই আছে। নারায়ণ দাস চিঠি লেখার বয়ান শেখাচ্ছেন এইভাবে—

> "শ্রীগুরুচরণ বন্দ করিয়া মস্তকে / পত্রের নিয়ম কিছু কহিব সংক্ষেপে। পিত্যামহো মহাসয় করিয়া প্রণতি / সেবকান সেবক বলিয়া লিখি পাতি। / ···জ্ঞাতি বন্ধু আদি যত গুরুজন / সেবক প্রণাম করি লিখি নিবেদন। / পরম পুজনিয় বলি দিবে শিরনাম / পত্রের নিয়ম এই সুন সাবধান।"[১৪৮]

তখন পাঠশালায় 'চিঠিপত্র লিখিবার ধারা', 'নাম লিখিবার ধারা,' 'গ্রাম লিখিবার ধারা' শেখানো হত। 'শিশুবোধকে'ও এইসব বিষয় আছে।

আবদুল করিমের পুঁথির বিবরণে চিঠি লেখার বয়ান শেখার একটি সন্দর্ভ আছে। 'জমিদারের কাছে গোমস্থার পত্র' নামে এই সন্দর্ভে দেখি—

গোমস্থাএ নিবেদএ   স্থন চৌধুরি মহাশএ
বিক্রমপুরের অধিকারি তুমি।
কিঞ্চিত করিবে মন   মোর এক নিবেদন
সাক্ষ্যাতে কহিতে পারি আমি॥
বর দুস্ক সন্তাপে তোমা আশ্র লইল বাপে
অন্যকিছু সাহশ্র (সাশ্রয়) পাইবার।
বকেআ মোর বাকী নাই   গোচরে তোমার ঠাই
কোনদেশে হেন অবিচার॥
পোনর টাকা ষুলি ধানি চল্লিশ টাকা গনাই আমি
ইত পীদাএ কাগজ সব চাহ।[১৪৯]

'পুঁথি-পরিচয়ে' আর একটি সন্দর্ভের নমুনায় দেখি—"অষ্টাদস ছাওাল পড়িছে নিরন্তর / অষ্টশব্দী আদি করি পড়িল অমর। / বিবিধ প্রকারে অঙ্ক শিখিআছে সভে / অষ্টকোঠা অষ্টপর সিক্ষা করে ইবে। / সরকার বেড়িয়া সভে বস্তে ডানি বাঁ / অধ্যয়ন করাইছে সুখিরাম খাঁ। / তিলির নন্দন তার নারাঙ্গিতে বাস / কঠিন কঠিন কঙ্ক করিছে প্রকাস।"[১৫০] এই সন্দর্ভের সাক্ষ্যে পঞ্চানন মণ্ডল লিখেছেন, "ব্রাহ্মণেতর জাতিদের ছিল গুরুমহাশয়ের পাঠশালা। সেখানকার কৃতিত্ব ছিল সাধারণতঃ কঠিন কঠিন অঙ্ক প্রকাশ করাতেই। অষ্টকোঠা, অষ্টশব্দী, অমর প্রভৃতির অধ্যাপনা অধ্যয়ন চলিত সেখানে সুখিরাম খাঁ-এর মতো তিলির ছেলের কর্তৃত্বে। সেখানেও অবলম্বন হাতে লেখা পুঁথি।"[১৫১] সবই ঠিক কিন্তু একটা খট্‌কা থেকে যায়। 'অমর' বলতে যদি 'অমরকোষ'ই বোঝায় তাহলে কি বুঝব পাঠশালায় সংস্কৃত শেখানো হত, নাকি 'অমরকোষে'র কোন বাংলা তর্জমা পড়ানো হত। এইসব সন্দর্ভের ভাষা ও বানান দেখে কিন্তু মনে হয় আদৌ অমর পড়ানো হত না। এটা একটু বাড়িয়ে বলা হয়েছে। এই বাড়িয়ে বলার প্রবণতা কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিস্তর দেখা যায়। যাইহোক, 'পুঁথি-পরিচয়ে'র ১৭নং পুথি যাতে এই সন্দর্ভগুলি আছে, তার কাল দেখে বোঝা যায় সতের শতকে পাঠশালা শিক্ষা পরিণত রূপ পেয়েছে। আর সেখানে ব্রাহ্মণেতর জাতিদেরই প্রাধান্য ছিল। এই পুঁথিটিতে যে দশজনের ভণিতাযুক্ত সন্দর্ভ আছে তাদের নয়জনই অব্রাহ্মণ। আর একমাত্র ব্রাহ্মণ দ্বিজ রামদুলাল রায়ের সন্দর্ভেই রয়েছে

তিলির নন্দন সুখিরাম খাঁ নামক পাঠশালা গুরুর উল্লেখ। পাঠশালার শিক্ষায় অঙ্কের উপর যে বিশেষ জোর দেওয়া হত সেবিষয়েও সন্দেহ নেই। আর অঙ্ক শেখার আর্যায় বা সেহাখতে কায়স্থ বালার উল্লেখ দেখে পাঠশালায় কায়স্থের প্রাধান্য সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না।

পাঠশালায় অঙ্ক শেখার অনেক আর্যার নমুনা পাওয়া যায়। এইসব আর্যাগুলি সাধারণতঃ শুভঙ্করের আর্যা বলেই পরিচিত ছিল। বেশি দিনের কথা নয়, যাঁরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ম্যাট্রিক' পরীক্ষা দিয়েছেন তাঁরাও ছোটবেলায় শুভঙ্করের আর্যা মুখস্থ করেছেন। তাঁদেরও 'কড়াকিয়া' 'গণ্ডাকিয়া' পড়তে হয়েছে। তাঁরা অনেকেই "কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে। / কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে॥ / কাঠায় কাঠায় ধূল পরিমাণ। / দশ বিশ গণ্ডা হয় কাঠার প্রমাণ" এই কাঠা কালি বা বিঘা কালি "জমি বিঘা যত তঙ্কা হইবেক দর। / তঙ্কা প্রতি ষোল গণ্ডা কাঠা প্রতি ধর॥ / যত আনা তত গণ্ডা পাই প্রতি বট। / গণ্ডা প্রতি ষোল তিল ঘুচাও কপট॥ / কড়া প্রতি চারি তিল শুভঙ্কর ভণে। / জমা বন্দী কর শিশু আনন্দিত মনে॥"[১৫২]—এইসব শুভঙ্করের আর্যা মুখস্থ করেছেন বানান শেখার সঙ্গে সঙ্গেই। সেইসঙ্গে অন্তত কুড়ি ঘরের নামতা অবশ্যই মুখস্থ করতে হত।

শুভঙ্কর কে ছিলেন? কোন্ সময়ের লোক ছিলেন? শুভঙ্করের নামে একাধিক আর্যা রচয়িতা ছিলেন কিনা? এইসব বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা না করেও বলা যায় সতের শতক থেকেই আর্যাগুরু শুভঙ্করের নাম শোনা যায়। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎ বঙ্গে' ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের হাতে লেখা একখানি শুভঙ্করী পুঁথি থেকে লম্বা উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি জানাচ্ছেন "লঙ সাহেব উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিয়াছেন ১৩০ বৎসর যাবৎ শুভঙ্করের আর্য্যার আবৃত্তিতে অনুমান ৪০,০০০ বঙ্গ বিদ্যালয় মুখরিত হইয়া আসিয়াছে।'[১৫৩] পরবর্তী মঙ্গলকাব্য রচয়িতাদের মতোই পরবর্তী অনেক আর্যা রচয়িতাই শুভঙ্করের আর্যা স্মরণ করে তাদের আর্যা রচনা করেছেন। 'পুঁথি-পরিচয়ে'র প্রথম খণ্ডে ১০৮৯-৯৩ বাংলা সালে লিপি করা একটি পুঁথি থেকে কিভাবে পাঠশালায় অঙ্ক ও বিভিন্ন বিষয় শেখানো হত, তার কিছু নমুনা দেওয়া আছে। কৃষিজীবীর পক্ষে প্রয়োজনীয় একটি অঙ্কের নমুনা এইরকম—

"শুভঙ্করে সদাকাল করিয়া প্রণাম / স্বাখত (ে) ম (া) হন ইহা কহে

সোভারাম।" / "মক্কা সহরে আছে পীরের দস্তগির / শতকোটী বিঘা জমি ত হার জাগীর। / শত শীসে গোছ হয় শীসে শত ধান / পীরের দোয়ায় ফলে সকল সমান। / বিঘা পরিমাণ হয় শত কাহন গোছে / কেতা ধান হুয়া পীর কায়স্তকে পুছে।"[১৫৪]

ধাঁধার আকারে লেখা এইসব অঙ্কের প্রশ্ন দেখে শিশুপাঠ্য বাংলা অঙ্ক বইয়ের প্রশ্নবোধক অঙ্কের কথা মনে পড়ে। সেদিন গেছে যখন বাংলা স্কুলের পড়ুয়ারা তথাকথিত ইংরেজি স্কুলের ছাত্রদের চাইতে অঙ্কে অনেক বেশি দক্ষ বলে স্বীকৃতি পেত। এমনকি উনিশ শতকের হিন্দু স্কুলের ছাত্রদের চাইতে বাংলা স্কুলের পড়ুয়ারা অঙ্কে অনেক দড় ছিল।

'পুঁথি-পরিচয়' দ্বিতীয় খণ্ডেও আমরা এরকম অঙ্ক শেখার অনেক আর্যার নমুনা পাই। ভৃগুরাম, দুর্গারাম, গোবিন্দরাম, শুভঙ্কর ও বাসুদেব ঘোষের এই আর্যাগুলির লিপিকাল দেখা যাচ্ছে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। বাসুদেব ঘোষের আর্যার একটি অঙ্কের প্রশ্ন ও তার সমাধান এইরকম—

> সাতটাকায় সাত বিঘা সরিষার জমী, হকু না হকু খন্দ কৌড়ি নাই কমি।
> পাকা খন্দ দেখি তথা পক্ষের উৎপাত, ফান্দ বসাইয়া গৃস্থ হইল তফাত।
> হেনকালে তথা আইযে আশী হাজার ছ সয় চল্লিস পক্ষগণ,
> হরশীত হয়্যা সরিষা করয় ভক্ষণ।
> দৈবজোগে এক পক্ষ পড়্যা গেল ফান্দে, গৃহস্থের পায়ে ধর্য়া
> সেই পক্ষ কান্দে।
> পরানে না মার মোরে সুন চাষা ভাই ; পক্ষক করিয়া
> কৌড়ি লহ মোর ঠাঞি।
> বাসুদেব ঘোষ তবে কহে কায়েস্থেরে পক্ষ প্রোতি কত পড়ে কহত আমারে।
> এতেক সুনিয়া তবে কায়েস্তের গন, হাতে খড়ি লয়া করে অঙ্কের পাতন।
> হরিয়া পুরিয়া অঙ্ক করিল নীর্ন্নয়, পক্ষপ্রিতি এক দস্তি
> কমি বেশী নয়।[১৫৫]

পাঠশালা শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের পাঠসংকলনের পুঁথিও দেখা যায়। 'বাঙ্গলা প্রাচীন পুথির বিবরণে' 'বিবিধ সন্দর্ভের পুঁথি' বলে একটি পুঁথির বিবরণ আছে। আবদুল করিম জানাচ্ছেন—"ইহা একখানি সংগ্রহ গ্রন্থ বা নানা কবির রচিত পাঁচালী, বারমাস্যা, চৌতিশা, শ্লোক প্রভৃতির একখানি ক্ষুদ্র 'Encyclopaedia'।" নরোত্তম কেরানির লিপি করা এই পুঁথিটি ১১৭৯ মঘী সনের লেখা।[১৫৬] উনিশ

শতকে ছাপা 'শিশুবোধক'ও এইরকম একটি বিবিধ পাঠসংকলন। জেমস লঙ্‌ তাঁর *A Descriptive Catalogue of Bengali Works*-এ ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে ছাপা একটি 'শিশুবোধকে'র বিবরণ দিয়েছেন। তাতে অক্ষর পরিচয়, নামতা, অঙ্ক, গঙ্গা বন্দনা থেকে গুরু-দক্ষিণা, দাতা কর্ণ, প্রহ্লাদ চরিত্র ও চাণক্য শ্লোক সবই সংকলিত হয়েছিল।[১৫৭] এই 'শিশুবোধক' গ্রামবাংলার পাঠশালাগুলিতে অবশ্যপাঠ্য বই হিসাবে বহুকাল পড়ানো হত। আমাদের দেখা 'শিশুবোধক' তিনটি বহু পরে ছাপা হয়েছিল কিন্তু বিষয়সূচী একই ছিল। হয়ত ইংরেজি অক্ষর বা মাসের নাম পরবর্তী যোগ। 'পুঁথি-পরিচয়' দ্বিতীয় খণ্ডে দ্বিজ দুর্গারাম রচিত 'শিশুজ্ঞান চরিত্র' নামে এইরকম একটি পাঠসংকলনের পুঁথির বিবরণ দেখা যায়। এতে তখনকার পাঠশালায় পড়ানোর বিষয় ও পদ্ধতি সম্পর্কেও জানা যায়। দুর্গারাম লিখেছেন—

> প্রথমে আরম্ভ বিদ্যে চৌত্রিস অক্ষ্যর···কর কল লিখ তারপর।
> ···কনক মকিরি ১খ] কিল্লি আদি···আংকো আঙ্কো সিদ্ধি লিখ
> না করিহ হেলা।
> সিখিলে বানান সর্ব্ব জানিবে···ন অক্ষ্যরে অক্ষ্যরে তবে
> করিবে প্র [মান]।
> বানান সিখিলে কিছু নাই য়বোগর অবোহেলে চালাইবে পুথির
> য়ক্ষ্যর।
> গুরুদক্ষিন্যা পড় জতো সিষুগন খত পাটা আদি কর লিখন
> পড়ন।
> অতোর্পর কড়ির অংক সিখ জতো বালা কড়ানে গণ্ডাকে লিখ
> না করিহ হেলা।
> স্বটিকে বুড়িকে লিখ পুনকে আদি জতো চৌকে
> লিখিতে কেহ না করিহ ভ্রস্তো
>
> * * *
>
> পড়ুআ পড়ুআ দন্দ না করিহ কেহ মনে করো সকলে
> হইবে একগ্রহ।[১৫৮]

দেখা যাচ্ছে, প্রথমে অক্ষর পরিচয়, পরে বানান, তারপর খত পাটা লিখতে শিখে গুরুদক্ষিণা পড়ে অঙ্ক শেখা, এই হচ্ছে মোটামুটি পাঠশালার শিক্ষাসূচী। 'কর কল লিখ তারপর' দেখে 'শিশুশিক্ষা' বা 'বর্ণপরিচয়ের' কর খল'-র কথা মনে

পড়ে। অবশ্য 'শিশুজ্ঞান চরিত্রে'র লিপিকালও খুব একটা পুরনো নয়। এটির লিপিকাল ১২৬৪ সাল। তবে লিপিকাল আর রচনাকালে তফাত থাকতে পারে।

পঞ্চানন মণ্ডল তাঁর 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' দ্বিতীয় খণ্ডে বীরভূম জেলার খুজুটীপাড়া গ্রামের ব্রজবাসী দাসের কাছে পাওয়া এক 'বাহিদা' বা 'কড়চা'-র বিবরণ দিয়েছেন। এতে পাঠশালা শিক্ষার ৯৮ প্রস্থের উল্লেখ দেখা যায়। এই ৯৮ প্রস্থের মধ্যে 'ক খ, অঙ্ক, আঙ্ক, সিদ্ধী, বানান, কড়া, গোণ্ডা, বুড়ি, পোন, চক, কাঠা, সের, ছটাক,…জমাবন্দী, কড়িকষ্যা, মনকষ্যা, সেরকসা…সুদকসা… ইটকালি, নৌকাকালি, দেয়াল কালি, দধিকালি, পুষ্কনি কালি…পথের মাপ, ভুমীর মাপ…চিটী লিখিবার ধারা…গ্রাম লিখিবার ধারা, পত্র লিখিবার ধারা, স্মাখত সন্ধান, নাম লিখিবার ধারা, জমা গুজস্তার-খাজনা দাখিল লিখিবার নির্ন্নয় …খত পাটা, কবুলতি…গোমস্তার কবুলতি, গোমস্তার হুকুমনামা, হিসাব' প্রভৃতি আছে।[১৫৯] ছাপা 'শিশুবোধকে'ও এইসব প্রস্থের সন্দর্ভ আছে। এই 'বাহিদা'-র লিপিকাল ১২৭১ সাল দেখে বোঝা যায় উনিশ শতকের শেষেও গ্রাম-বাংলায় এধরনের শিক্ষা চালু ছিল। অবশ্য সব পড়ুয়াকেই এই ৯৮ প্রস্থ শিখতে হত তা কিন্তু ঠিক নয়। কোন পাঠশালায় হয়ত জমিদারি হিসাবের উপর জোর ছিল। কোথাও মহাজনী হিসাব। আবার কোন কোন পাঠশালায় লেখা, পড়া আর নামতা, আর্যা ও সাধারণ হিসাবের অঙ্কের উপর সমান জোর দেওয়া হত। তবে লেখা আর অঙ্কই যে পাঠশালার প্রধান দুই শেখার বিষয় ছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নেই।

পাঠশালায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা

পাঠশালায় যে নানা বৃত্তির বা পেশার শিক্ষা হত তার ভূরি ভূরি নজির মেলে। এমনকি ঘর তৈরি, পুকুর কাটা, বা কুয়ো তৈরির মাপজোকও শেখানো হত পাঠশালায়। আবদুল করিমের 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণে' 'গৃহ-নির্ম্মাণ বিধি' নামে এক সন্দর্ভের উল্লেখ দেখা যায়। এতে আছে—

> বাড়ি করি সমভাগে মাঝে রাখ একপাত
> তার দক্ষিণে বান্ধ ঘর
> পিছে রাখ বারহাত তবে গার সুতের গাত।

অথ তথ বন্ধঘর তেড় মিসাই সাতে হর।
সাতে হরি রহে জে ঘরের পতি হএ সে। ১৬০

'ইটকালি,' 'নৌকাকালি,' 'পুষ্কনি কালি,' 'দেয়াল কালি'র কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এই প্রসঙ্গে ১২০৪ সালে রচিত একটি লেখার কালি তৈরির ছড়ার উল্লেখ করা যায়। ছড়াটি এইরকম—

লোধ লাহা লোহার গুঁড়ি অর্কাঙ্গার যবার কুড়ি
গাবের ফল হরিতকী ভৃঙ্গার্জ্জুন আমলকী
বাবলা ছাল জঁাটির রস ডালিম সেছে করিবে কষ
ভেলায় কর্য এক আলি চারিযুগলা উঠবে কালি ॥১৬১

বোঝা যাচ্ছে দেশজ পদ্ধতিতে কালি তৈরি করা হত। মধ্যযুগে কালি দিয়ে তুলট কাগজে পুঁথি লেখার প্রথা চালু ছিল। পাঠশালার অবলম্বন যেসব পুঁথি পাওয়া গেছে সেগুলি সাধারণত শর, শকুনের পালক, কঞ্চি, খাগের বা লোহার কলম দিয়ে তুলট কাগজে বা তালপাতায় লেখা হত। পাঠশালার গুরুগিরি করার মতোই পুঁথি নকল করা ছিল তখনকার দিনের একটি বেশ রমরমা পেশা।

পাঠশালা শিক্ষা আধুনিক অর্থে বৃত্তিমূলক শিক্ষা হলেও তা যে পুরোপুরি ব্যবহারিক শিক্ষা ছিল সেবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। প্রাক্-ব্রিটিশ আমলে রাজকর্মচারী, জমিদার, পুরোহিত, প্রভৃতি উচুশ্রেণীর লোকেরা প্রধানত আরবী-ফারসী বা সংস্কৃত শিক্ষা করত। কেউ কেউ বাড়িতে হয়ত বাংলাও শিখত। রামমোহন রায় তখনকার রীতি অনুসারে আরবী-ফারসী ও সংস্কৃত শিখেছিলেন। বাড়ীতে গুরুমশায়ের কাছে কিছু বাংলাও শিখেছিলেন। পাঠশালার সঙ্গে এঁদের বড় একটা সম্পর্ক ছিল না। পাঠশালায় পড়ত যারা তারা ছিল মূলত কৃষিজীবী, কারিগর, দোকানদার বা জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারীদের সন্তান। কৃষি, কুটিরশিল্প, কারিগরি আর ব্যবসাই ছিল তখন সাধারণ মানুষের প্রধান জীবিকা। চাকরির খুব একটা সুযোগ ছিল না। কিছু কৃষিজীবী একই সঙ্গে জমিদারি সেরেস্তায় বা মহাজনের খাতা লেখার কাজ করত। পাঠশালা শিক্ষা ছিল এইসব সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ এক সাধারণ শিক্ষাধারা। উনিশ শতকের প্রথম দিকের সরকারি-বেসরকারি বিবরণ ও নথি দেখে বোঝা যায় এ শিক্ষা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল আর বেশির ভাগ গ্রামেই এধরনের পাঠশালা ছিল।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার দু'একটি নজির পাওয়া গেলেও সাধারণভাবে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার রেওয়াজ ছিল না বলেই মনে হয়। দৌলত উজির লায়লী-মজনুর লেখাপড়ার উল্লেখ করেছেন আর আলাওল 'পদ্মাবতী' কাব্যে রাজবালার লেখাপড়ার কথা লিখেছেন। লায়লীর মা কিন্তু মেয়েকে বেশি লেখাপড়া করাতে নারাজ। লায়লীর মা মেয়েকে বলছেন—'আজি হোন্তে তেজহ চৌয়াড়ি পাঠশাল্। / কুলের মহিমা নিজ রাখহ আপনা।'[১৬২] মেয়েরা বেশি লেখাপড়া শিখলে কুলের কলঙ্ক। তাছাড়া ইতিমধ্যেই লায়লী মজনুর প্রেমে মজেছে। কাজেই লায়লীর মা শঙ্কিত। এর থেকে মেয়েদের লেখাপড়া সম্পর্কে সমাজের মনোভাব বোঝা যায়। এ অবস্থায় মেয়েদের লেখাপড়ার খুব অবকাশ ছিল মনে হয় না।

মীমাংসা

এ পর্যন্ত যেসব উপাদান ও সাক্ষ্য আমরা দেখেছি তাতে বোঝা যায় দেশজ বাংলা পাঠশালা শিক্ষার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল মুসলমান অধিকারের পরেই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের সঙ্গে এই শিক্ষার বিকাশের স্বাভাবিক যোগসূত্র ও প্রাচীন ভারতের প্রাক্-উপনয়ন শিক্ষার সীমাবদ্ধতা আমাদের এই সিদ্ধান্তের ভিতকে পাকা করে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক প্রভাবে রচিত 'চর্যাগীতে'র আদি বাংলা থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মধ্যযুগের বাংলার মাঝখানের ইতিহাস আজো অন্ধকারে। বৌদ্ধ পাল রাজত্বের অবসান আর ব্রাহ্মণ্য সেন রাজত্বের অভ্যুদয়ে বাংলার জনজীবনে কি ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দাপটেই যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার দম আটকে ছিল এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। আর মুসলমান অধিকারের পরেই যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আবার প্রাণের জোয়ার দেখা দেয় তাতেও সন্দেহ নেই। সেন আমলেই বাংলায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চার বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়।[১৬৩] অথচ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না বললেই চলে। ব্রাহ্মণ্য স্মৃতির বিধান বৌদ্ধতন্ত্রানুসারী জনগোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দেওয়ায় এমন প্রয়াস বুঝি আগে দেখা যায়নি। এই সময়ই বাংলায় বেদচর্চার প্রচলনের

অন্য হলায়ুধ 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বম্' রচনা করেন। বল্লালসেন নিজে এবিষয়ে উদ্যোগ নেন এবং একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন।[১৬৪]

বল্লালসেন তাঁর 'দানসাগরে' ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের মহিমা কীর্তন করেন। ব্রাহ্মণকে জমিদান করলে দাতা দশ কল্পকাল স্বর্গবাস করেন। অবশ্য জমির পরিমাণ ও উর্বরতার উপর দাতার স্বর্গবাসের কাল নির্ভর করবে একথাও বলা থাকে। অনুর্বর বা বন্ধ্যা জমি দান করা চলে না।[১৬৫] বেদবিদ্ ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করে বাংলায় বসতি করানোর এক সুপরিকল্পিত প্রয়াস দেখা যায় সেন আমলের ভূমিদান প্রশস্তিগুলি লক্ষ্য করলে। দেওপাড়া প্রশস্তিতে দেখা যাচ্ছে বিজয়সেনের বদান্যতায় বেদবিদ্ ব্রাহ্মণরা এত ধনী হয়ে উঠেছিল যে তাদের বউদের মণিমুক্তা চেনানো শেখাতে হয়েছিল।[১৬৬] বল্লালসেনের নইহাটি তাম্রলিপিতে দেখা যাচ্ছে ওভাসুদেব শর্মণ নামে এক ব্রাহ্মণকে একটি গ্রাম দান করা হচ্ছে।[১৬৭] আর একটি তাম্রলিপিতে দেখা যাচ্ছে লক্ষ্মণ-সেন ব্রাহ্মণদের সুন্দর বাগান আর সবচেয়ে উর্বর জমি আছে এমন অসংখ্য সেরা গ্রাম দান করেছিলেন।[১৬৮] এরকম আরো অনেক ভূমিদান প্রশস্তি পাওয়া গেছে। এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে সেন আমলে শাসক শ্রেণীর অংশ হিসাবে এক নতুন ব্রাহ্মণ জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির গজদন্ত গরিমায় সেন আমলে শাসক শ্রেণী নিজেদের বাংলার নিজস্ব ভাবধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। বাংলার লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধতান্ত্রিক প্রভাবে। বাংলার লৌকিক দেব-দেবীরা বৌদ্ধতান্ত্রিক দেব-দেবীর ছাচে ঢালা। অবশ্য তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতবাদও যে লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। বাংলার লৌকিক ধর্মে দার্শনিক তত্ত্বের চেয়ে জাগতিক সুখ-দুঃখ-বেদনার প্রতিফলন অনেক বেশি। শাসক শ্রেণীর অবহেলা এবং বিরূপতা সত্ত্বেও বাংলার লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতি অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো বয়ে চলেছিল সাধারণ মানুষের অন্তরঙ্গ আশ্রয়ে। প্রকাশের বেদনায় ব্যথিত বাংলা সেদিন বলদর্পী শাসকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। নিজেকে সে গুটিয়ে নিয়েছিল নিজের ভিতরে। বক্তিয়ার খিলজীর ঘোড়সওয়ারের পথে তাই সে কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বাংলা বিজয় অবশ্য শুধু ঘোড়সওয়ার দিয়ে হয়নি। সুফী দরবেশের ভূমিকাও ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বৌদ্ধতন্ত্র প্রভাবিত দেশজ ধর্ম সম্প্রদায় ও যোগাচারী সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যে মেলবন্ধনও ছিল স্বাভাবিক। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে

এই মেলবন্ধনের ভাব বেশ লক্ষ করা যায়। বিজয়ী বাহিনী ও সুফী দরবেশের প্রভাবে ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর এক বড় অংশ ইসলাম ধর্মের দিকে ঝোঁকে। সুলতানী আমলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দাপট সরে গেলে বাংলার দেশজ দেব-দেবীরা আবার বাংলা কাব্যসাহিত্যে জাঁকিয়ে বসার অবকাশ পান। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বন্ধ দরজা খুলে যায়।[১৬৯] এই পটপরিবর্তনের একটা অর্থনৈতিক দিকও নিশ্চয়ই ছিল।

সুলতানী আমলে বাংলায় কৃষি ব্যবস্থায় কি ধরনের পরিবর্তন ঘটেছিল সে সম্পর্কে খুব ভালো না জানা গেলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের যে প্রসার ঘটেছিল সেবিষয়ে তথ্যের অভাব নেই। মমতাজুর রহমান তরফদার জমিতে কৃষকের স্বত্ব সম্পর্কে লিখেছেন যে মুঘল ও প্রাক্-মুঘল আমলে জমির পাট্টা প্রথা চালু ছিল।[১৭০] মুঘল আমলে যে এই প্রথা চালু ছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। টোডরমলের রাজস্ব ব্যবস্থা বা শের শাহের রাজস্ব বন্দোবস্তের আগে অবস্থাটা কি ছিল সে সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানতে পারি। তরফদার পাট্টার কথা উল্লেখ করলেও তার স্বপক্ষে কোন ভাল প্রমাণ দাখিল করেননি। কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল' বা রামেশ্বরের 'শিবায়নে'র সাক্ষ্য যথেষ্ট নয় বলেই মনে হয়। বিশেষ করে রামেশ্বরের 'শিবায়ন' অনেক পরের রচনা।[১৭১] তবে সুলতানী আমলের বিদেশী পর্যটকদের বিবরণে বৈদেশিক বাণিজ্যের বিবরণ দেখে মনে হয় তখন কৃষির বেশ প্রসার ঘটেছিল। বাংলা তখন চাল, চিনি, গম, সুতীর কাপড় ও রেশমবস্ত্র রপ্তানি করত।[১৭২] তখন বাংলায় অনেক বন্দর ও নগর ছিল। বহু নগরে টাকশাল ছিল এখবরও পাওয়া যায়।[১৭৩] এইসব বিবরণ ও সুলতানী আমলে ধাতুমুদ্রার নিদর্শন দেখে মনে হয় তখন বাংলায় কড়ি ও ধাতুমুদ্রা দুয়েরই প্রচলন ছিল। সুলতানী আমলে ধাতু-মুদ্রার বহুল প্রচলন ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসারের সাক্ষ্য দেয়। মাহুয়ান, যিনি ১৪০৬ খ্রীস্টাব্দে বাংলায় এসেছিলেন, জানাচ্ছেন,—"এটা একটা বিরাট দেশ। এদেশের জনসংখ্যা যেমন অসংখ্য তেমনি উৎপাদিত…দ্রব্যের পরিমাণও বিশাল…ধনীরা জাহাজে করে পণ্য নিয়ে বিদেশে যায় বাণিজ্য করতে। অনেকে ব্যবসা করে। আর একটা বড় সংখ্যক লোক কৃষিকাজে নিযুক্ত…এদের ভাষা বাংলা, ফারসীও বলা হয়ে থাকে।

এদেশের প্রচলিত মুদ্রা হচ্ছে 'টঙ্কা' নামের রূপার মুদ্রা…বড় বড় পণ্য বিনিময়ে এই মুদ্রা ব্যবহার হয়। কিন্তু ছোটখাটো কেনা-বেচায় কড়ি

নামে একধরনের সামুদ্রিক শামুক ব্যবহার হয়। ...বছরে দু'বার ধান উৎপন্ন হয়।"[১৭৪] বারবোসাও তাঁর বিবরণে জানাচ্ছেন যে বাংলায় প্রচুর তুলা ও চিনি উৎপাদিত হত। এবং বাংলা বেশ সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল।[১৭৫]

এই বিবরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের বেশ রমরমা চলছিল। আর ধাতুমুদ্রা ও কড়ি দুয়েরই প্রচলন ছিল। কৃষির অবস্থাও যে বেশ ভালো ছিল তাও অনুমান করা যায়। সুলতানী আমলের বহু ধাতুমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে অথচ সেন আমলের ধাতুমুদ্রা পাওয়া যায় না বললেই হয়। এইসব দেখে মনে হয় সুলতানী আমলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ গতিশীল হয়ে উঠেছিল। আর এই গতিশীলতা সম্ভবত মুঘল আমলে তার শেষ সীমায় পৌছয়। সুলতানী আমলেই বাংলায় মাদ্রাসা শিক্ষার শুরু হলেও তা ছিল সাধারণভাবে মুসলমান শাসকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মুঘল আমলেই সম্ভবত হিন্দুরাও আরবী-ফারসী শেখা শুরু করে। তবে মুসলমান শাসকরা কখনই বাংলা ভাষার চর্চা বা শিক্ষার বিরোধিতা করেনি। বরঞ্চ অনেক সুলতান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ দিয়েছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হুসেন শাহের নাম বারে বারে সস্নেহে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীকর নন্দী লিখেছেন "নৃপতি হুসেন শাহ্‌ হএ ক্ষিতি পতি। সামদান দণ্ডভেদে পালে বসুমতী।"[১৭৬] সুলতানী আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-চর্চার বাড়বাড়ন্ত তাই কিছু অস্বাভাবিক নয়।

যাইহোক, ব্রাহ্মণরা দেশ শাসনের অধিকার হারালেও সমাজ শাসনের হাল কিন্তু ছাড়েনি। এই সময়ই সংস্কৃতচর্চার একচেটিয়া অধিকারী ব্রাহ্মণরা তাদের স্মৃতিশাস্ত্র ঢেলে সাজতে শুরু করে। এই নব্য স্মৃতির পুরোধা রঘুনন্দনের বিধানে বাংলায় ব্রাহ্মণ ছাড়া বাকি হিন্দুরা সবাই শূদ্র হয়ে যায়। শূদ্রদের আবার জলচল আর জল অচল এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এতে কিন্তু বাংলা ভাষার একটা বড় উপকার হয়। সংস্কৃত সাহিত্যচর্চায় অনধিকারী শূদ্ররা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় প্রধান ভূমিকা নেয়। যদিও উপরতলার কৃষিজীবী ও ব্যবসায়ী শূদ্ররাই এবিষয়ে মূল উদ্যোগ নেয়, নীচের শূদ্রদের এতে অংশগ্রহণে বাধা থাকে না। বাংলায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের অস্তিত্ব অস্বীকার করায় প্রাক্-উপনয়ন হাতেখড়ি সংস্কারের গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং এই সংস্কারের সীমা আগের দ্বিজাতি ছাড়িয়া যায়। আর তাই রঘুনন্দনে হাতেখড়ি সংস্কার প্রসঙ্গে দ্বিজাতির উল্লেখ থাকে না। এতে কিন্তু সব শূদ্রেরই অধিকার স্বীকৃত

হয়। মনে রাখতে হবে, যে-সমাজে পুঁজি ও পণ্যের নিয়মে উৎপাদনশীল শ্রম নিয়ন্ত্রিত হয় না অর্থাৎ প্রাক্‌-ধনতান্ত্রিক সমাজে ধর্মীয় সংস্কার ও আচার এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে সামাজিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে। রঘুনন্দনের বিধান তাই মধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাসের আলোচনায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

যাইহোক, সুলতানী আমলের এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় গড়ে ওঠে মধ্যযুগের বিশাল বাংলা সাহিত্য আর পাশাপাশি গড়ে ওঠে বাংলা শিক্ষার প্রথাবদ্ধ ধারা বাংলা পাঠশালা। স্বাভাবিকভাবেই উপরতলার শূদ্ররাই মূলত এই-দুই ধারার ধারক-বাহক। সঙ্গে ছিল আর সবাই। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ফিরে এসেছিলেন প্রাক্‌-সেন আমলের লৌকিক দেবদেবীরা কিছুটা ব্রাহ্মণ্যভাবে সংস্কৃত হয়ে। চৈতন্যর বৈষ্ণব ভাবধারা ও ভক্তি আন্দোলন একদিকে এই দুই ধারাকে বেগবান করে, অন্যদিকে ব্রাহ্মণের বিচ্ছিন্নতাকে অনেকখানি দূর করে। বাংলা ভাষাচর্চার প্রতি ব্রাহ্মণের অবহেলা ও বিরূপতা অনেকটা কেটে যায় এই আন্দোলনের ফলে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার চৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনের চরিত্র কবির, নানক বা রামদাসের ভক্তি আন্দোলন থেকে আলাদা। চৈতন্যের আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল মূলত ব্রাহ্মণদের হাতে।[১৭৭] বাংলার বাইরে থেকে আসা এই ব্রাহ্মণেরা সুলতানী আমলের প্রথম দিকে বেশ নিগৃহীত হয়।[১৭৮] দেশজ ভাবধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংহতি স্থাপন তখন এদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। চৈতন্য মূলত সে কাজটি করেছিলেন। বাংলার শূদ্র জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কিছুটা সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাংলার লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ব্রাহ্মণ্য বাতাবরণে বরণ করার প্রথম ও প্রধান ভূমিকা নেয় এই আন্দোলন। অন্যদিকে সহজিয়া বৈষ্ণব ও সহজপন্থী সুফীরা বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের মেলবন্ধন ঘটিয়েছিল। গড়ে উঠেছিল বাংলার পীর সাহিত্য।[১৭৯] এইভাবে লৌকিক ধর্ম আর সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে মিলে-মিশে বাংলা ভাষা, সাহিত্য আর শিক্ষার এক বেগবান ধারা গড়ে উঠেছিল মধ্যযুগে।

সুলতানী আমলে গড়ে উঠলেও সতের শতক নাগাদই বাংলা পাঠশালার পুরো বিকাশ ঘটে। সতের-আঠার শতকের বাংলা সাহিত্য ও বিদেশী পর্যটকদের বিবরণে পাঠশালার উল্লেখ ও বর্ণনার ছড়াছড়ি। পাঠশালার প্রধান দুটি শিক্ষার বিষয় লেখা আর অঙ্ক। সতের শতকের আগে যে শুভঙ্করের আর্যাগুলি রচিত হয়নি সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। এই সময়ই অঙ্ক শেখার বিবিধ

আর্যাগুলির উদ্ভব ও বহুল প্রচলন দেখা যায়। এর সঙ্গে সেই সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থার একটা কার্য-কারণ সম্পর্কও অনুমান করা যায়।

মুঘল আমলে বিশেষ করে সতের শতক নাগাদ বাংলার অর্থনীতি যে যথেষ্ট গতিশীল হয়ে উঠেছিল সেকথা বহু ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন। মুঘল আমলেই টাকায় রাজস্ব আদায় শুরু হয়।[১৮০] বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে যথেষ্ট পরিমাণ রূপা আমদানি হতে থাকে।[১৮১] দেশে মুদ্রা অর্থনীতির প্রসার ঘটে। বাণিজ্যিক শস্যের উৎপাদন, রমরমা ধানচালের কারবার, বস্ত্রশিল্পের ও রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার সতের শতকের গ্রামীণ অর্থনীতিতে মুদ্রার গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল সন্দেহ নেই। টাকায় রাজস্ব আদায়ের ফলে কৃষকরা অনেক সময় শস্য বিক্রি করত। কাজেই বাজারের দামের টানাপোড়েনেও তাদের আগ্রহ ছিল। আবার মহাজনদের প্রভাবও বাড়ছিল।[১৮২] এমনকি কাপড় তৈরির ক্ষেত্রে শ্রম বিভাজনের প্রসার ঘটছিল বলেও কেউ কেউ মনে করেন।[১৮৩] মুঘল আমলেই বাংলার রেশম ও চিনিশিল্পের প্রসার ঘটে।[১৮৪] সতের শতকে মুদ্রা অর্থনীতির এই প্রসারের সঙ্গে হিসাবের জটিলতা ও অঙ্ক শেখার প্রয়োজন বাড়ার একটা সম্পর্ক স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। তাছাড়া মুঘল আমলেই জমির পাট্টা, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদির প্রচলন ও গুরুত্ব সমধিক হয়। ফলে নথিপত্র লেখার ধারা শেখাও জরুরি হয়ে উঠে। সতের শতক নাগাদ বাংলা পাঠশালার বাড়বাড়ন্ত তাই নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল বলেই অনুমান হয়। আবার সব বাংলা পাঠশালায়ই লেখা ও পড়া শেখানো হলেও কোন কোনটিতে জোর ছিল জমিদারি হিসাবের উপর, আবার কোন কোনটিতে জোর দেওয়া হত মহাজনী হিসাবের উপর। আসলে ব্যবহারিক শিক্ষার উপর জোরই ছিল বাংলা পাঠশালার জীয়নকাঠি। বাংলা পাঠশালা ছিল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা।

ব্রিটিশ আমলে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা সব মিলিয়ে এক গোটা শিক্ষাব্যবস্থা চালু হলে ব্যবহারিক শিক্ষার স্বয়ংসম্পূর্ণ পাঠশালা শিক্ষাধারা শুকিয়ে যেতে থাকে। উনিশ শতকের শেষে দেশজ ৫০০০০ পাঠশালাকে ব্রিটিশ ধারার প্রাথমিক স্কুলে পরিণত করা হয়।[১৮৫] ব্রিটিশ গোটা শিক্ষার প্রাথমিক স্কুলগুলিও অনেক কাল পাঠশালা নামেই পরিচিত ছিল। ব্রিটিশ গোটা শিক্ষাধারার প্রাথমিক স্কুল বা প্রাথমিক শিক্ষা ছিল শিক্ষার প্রথম ধাপ। উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হিসেবেই প্রাথমিক স্কুলের মূল

ভূমিকা। যদিও গণস্বাক্ষরতা বিস্তারে প্রাথমিক শিক্ষার একটা নিজস্ব ভূমিকাও স্বীকার করা হত। কিন্তু ব্যবহারিক শিক্ষা ব্যতিরেকে সাক্ষরতার মূল্য নিতান্তই সীমিত। কাজেই এই উদ্দেশ্যপূরণে প্রাথমিক স্কুলের ভূমিকা নগণ্য মাত্র।

চতুর্থ অধ্যায়

মখতবের কথা

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশটা দখল করে গোটা কয়েক দেশজ শিক্ষাধারা চালু দেখতে পায়। এ সম্পর্কে ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে গঠিত প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন জানাচ্ছে যে তখন একদিকে ছিল ব্রাহ্মণদের সংস্কৃত শিক্ষার টোল, মুসলমানদের গোঁড়া ইসলামী উচ্চশিক্ষার মাদ্রাসা আর সাধারণ ধর্মীয় শিক্ষাব মখতব। অন্যদিকে ছিল অসংখ্য গ্রাম্য পাঠশালা।[১] শিক্ষা কমিশনের মতে এই গ্রাম্য পাঠশালাগুলি ছাড়া বাকি সবই মূলত ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মখতব-গুলিকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলা হলেও এগুলির প্রধান কাজ ছিল পড়ুয়াদের কোরান পড়া শেখানো একথা স্পষ্ট করেই উল্লেখ করা হয়েছে শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে।[২] তবে মখতব সম্পর্কে খুব একটা বিস্তারিত আলোচনা শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে নেই। আসলে বুকানন হ্যামিলটন, উইলিয়াম ওয়ার্ড, উইলিয়াম হ্যামিলটন বা উইলিয়াম অ্যাডাম যাঁরা উনিশ শতকের গোড়ায় বাংলার দেশজ শিক্ষা বিষয়ে খোঁজখবর করেছেন এবং এবিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ লিখেছেন তাঁরা কেউই বাংলার মখতব শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ কোন খোঁজ নেননি। অন্তত এঁদের লেখা থেকে বাংলা পাঠশালা সম্পর্কে অনেক কথা জানা গেলেও বাংলার মখতবগুলি সম্পর্কে বড় একটা কিছু জানা যায় না। পরেও এ সম্পর্কে খুব ভালো আলোচনা কেউ করেছেন বলে আমি জানি না। এবিষয়ে আবদুর রহিমের আলোচনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েই আমি একথা বলছি। মখতব সম্পর্কে ভালো আলোচনা না হওয়ার একটা বড় কারণ এবিষয়ে ঐতিহাসিক উপাদানের অভাব। মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে কিন্তু ঐতিহাসিক উপাদানের অভাব নেই। তাই দেখা যায় মুসলমানের শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা মানেই মাদ্রাসা শিক্ষার আলোচনা। আবার প্রাক্-ব্রিটিশ প্রাথমিক শিক্ষার আলোচনা মানেই পাঠশালার আলোচনা। এমনকি আবদুর রহিমের সুলিখিত আলোচনায়ও মখতব ও পাঠশালা এক করে ফেলা হয়েছে শেষ পর্যন্ত। প্রাথমিক শিক্ষার একটি আলাদা ধারা মখতব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা চোখেই পড়ে না।

অথচ ১৩২৭ সালের 'এছলামাবাদী' কাগজে দাবি করা হয়েছে —"বঙ্গদেশে প্রায় ২০ লক্ষ মছজেদ আছে। প্রত্যেক মছজেদে ন্যূনাধিক পঞ্চগানা আর জুমআর নামাজ হয়। অন্তত অর্দ্ধেক মছজেদে বা তাহার সংলগ্নে সাবেক ধরনের মকতব আছে। এ সকল মকতবে পড়িয়া বালকেরা কোরআন শরিফ পড়া শিখে, নামাজের দোওয়া দরুদ কায়দা কানুন শিক্ষা লাভ করে, মুনশী বা মিঞাজীর সঙ্গে সঙ্গে নামাজ পড়িতে অভ্যস্ত হয়, রাহ-নেজাত, মেহতাহল জন্নাৎ ইত্যাদি মছলার দু'একখানা বই বেশ মুখস্ত করিয়া লয়। বাঙ্গালার ২।৪ খানা সাহিত্যের ও অঙ্কের বইও পড়িয়া এবং বুঝিয়া লয়।"[৩] 'এছলামাবাদী' হয়ত একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। ১৯২০-২১ সালে বাংলায় ১০ লক্ষ মসজেদ সংলগ্ন মখতব ছিল এ দাবির সপক্ষে সাক্ষ্যের বড় অভাব। তাছাড়া এতসব বিষয় ও বই পড়ার বা শেখার ব্যবস্থা কোন বিশেষ মখতবে থাকলেও বেশির ভাগ মখতবেই থাকা সম্ভব নয়। অন্তত এতসব বিষয় পড়া বা শেখা হত এমন নজির বড় একটা পাওয়া যায় না। সে যাইহোক, প্রাথমিক বা ধর্মীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে মখতব যে সাধারণ মানুষের একটা বেশ বড় অংশের চাহিদা মেটাত সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। আর তাই পাঠশালার মতোই মখতবের ইতিহাস আলোচনা ছাড়া দেশজ শিক্ষার ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না।

ভারতের ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস প্রসঙ্গে

প্রাক্-ব্রিটিশ দেশজ শিক্ষার ইতিহাসগুলিতে মাদ্রাসা শিক্ষার বিস্তারিত আলোচনা থাকলেও মখতব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা দেখা যায় না। নরেন্দ্রনাথ লাহা তাঁর 'Promotion of Learning in India during Muhammedan Rule' বইয়ে মূলত মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়েই আলোচনা করেছেন। মখতব সম্পর্কে খুব একটা কিছু জানা যায় না তাঁর বই থেকে। যদিও মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাস হিসাবে বইটি যারপরনাই মূল্যবান।[৪] এস. এম. জাফরের 'Education in Muslim India' বইটি নরেন্দ্রনাথ লাহার বইয়ের আদলে এবং তার উপর ভিত্তি করেই লেখা। জাফর বিশেষ কোন নূতন কথা জানান নি।[৫] অবশ্য ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষা বা মখতব বিষয়ে তাঁর বইয়ে কিছু আলোচনা আছে। সে আলোচনা বাংলার মখতব সম্পর্কে কতটা খাটে তাও দেখা দরকার। এফ. ই. কী তার 'Ancient Indian Education'

বইয়ে মুসলমানের শিক্ষা অধ্যায়ে মাদ্রাসা ও মখতব সম্পর্কে অনেক কথা লিখেছেন। তিনি যেসব উপাদানের উল্লেখ করেছেন তাতে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে অনেক তথ্য থাকলেও মখতব সম্পর্কে খুব একটা তথ্য পাওয়া যায় না।[৬] তিনিও নরেন্দ্রনাথ লাহার বইয়ের উপরই অনেকখানি নির্ভর করেছেন। মখতব সম্পর্কে তাঁর কথার সপক্ষে বিশেষ সাক্ষ্য হাজির করেননি। জে. এম. সেন অনেকটাই এফ. ই. কী-র বইয়ের উপর নির্ভর করে মুসলমান যুগের শিক্ষার ইতিহাস লিখেছেন তাঁর বই 'History of Elementary Education in India'-তে। এখানেও কোন তথ্যের খোঁজ পাওয়া যায় না।[৭] বিনোদ সহায় তাঁর 'Education and Learning Under The Great Mughal's' বইয়ে মুসলমানের প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে মখতব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে বাংলার মখতবের ইতিহাস আলোচনা কিন্তু এই বইগুলিতে নেই। থাকার কথাও নয়। বিনোদ সহায় মখতবের পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে ঐতিহাসিক উপাদানের অভাবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।[৮] আর এই অভাবের ফলেই আবদুর রহিম মখতব ও পাঠশালা এক করে ফেলেছেন।

আবদুর রহিম তাঁর 'বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস' প্রথম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের দশম অধ্যায়ে মুসলমান শাসনামলে বাংলায় শিক্ষা ও জ্ঞানের উন্নতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেই আমলের 'প্রাথমিক শিক্ষা' সম্পর্কে তিনি লিখছেন, "বঙ্গদেশে মুসলিম শাসনামলে মুসলমানদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ছিল···মুসলমান ছেলেমেয়েদের শিক্ষা শুরু হত মক্তবে। এসব মক্তব প্রতিটি মসজিদ এবং এমনকি ধনী ব্যক্তিদের বাড়ী-সংলগ্ন ছিল। ফলে, প্রত্যেক শহরে এমনকি গ্রামেও প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল।"[৯] তিনি কিন্তু মখতব আর পাঠশালার মধ্যে কোন তফাত করেননি। তাঁর মতে, "প্রাথমিক বিদ্যালয় মক্তব বাংলাতে পাঠশালা নামেও অভিহিত হত।"[১০] তিনি এমনকি একথাও লিখছেন যে,—'সুতরাং মিঃ এডাম কর্তৃক উল্লিখিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ছিল মুসলমান আমলে স্থাপিত এবং এর বেশীর ভাগই পুরনো মক্তব।'[১১] আমরা পরে অ্যাডাম রিপোর্টের আলোচনায় দেখব আবদুর রহিমের এই কথার উপর নির্ভর করা যায় না। তাছাড়া আবদুর রহিম মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য থেকে যেসব সাক্ষ্য যোগাড় করেছেন তা থেকে কতটা জানা যায় তাও পরীক্ষা করা দরকার।

প্রাণনাথ চোপরা মুঘল আমলের সমাজ ও সভ্যতার আলোচনায় প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে উচ্চশিক্ষার অনেক বিষয় জুড়ে দিয়েছেন। মুঘল আমলের প্রাথমিক শিক্ষার বর্ণনায় তিনি লিখছেন, "মুঘল আমলে হামেশাই মখতব চোখে পড়ত। শহর, নগর ও অনেক গ্রামে মখতবের ছড়াছড়ি ছিল। ডেলা ভেলে জাহাঙ্গীরের আমলে প্রত্যেক শহরে ও গ্রামে বেসরকারি স্কুল ছিল বলতে সম্ভবত এইসব মখতবের কথাই বলেছেন।"[১২] তিনি ডেলা ভেলেকে সাক্ষী মেনেছেন অথচ ডেলা ভেলে মন্দির সংলগ্ন যে স্কুলের লেখাপড়ার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে পাঠশালা শিক্ষার বরঞ্চ অনেক মিল আছে।[১৩] ডেলা ভেলের এই সাক্ষ্যে এতবড় সিদ্ধান্ত করা যায় না। আর তারিখি-শেরশাহীর সাক্ষ্যে মুসলমানের প্রাথমিক শিক্ষার যে পাঠ্যসূচী দেওয়া হয়েছে তাও বাংলার মখতব সম্পর্কে খাটে না। তারিখি-শেরশাহীতে আছে "হাসান খানের ছেলে ফরিদ জৌনপুরে আরবী পড়তে লাগে। সে কাজী সাহাবুদ্দিনের টীকা সহ কাফিয়াও খুব ভালো করে পড়ে এবং প্রাচীন রাজারাজড়াদের জীবনীও পড়ে। সে সিকান্দারনামা, গুলিস্তান, বোস্তান মুখস্ত করে আর দর্শনও পড়ে।"[১৪] 'কাফিয়া' হচ্ছে ব্যাকরণ। এগুলি মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয় বা ফারসী-আরবী স্কুলের বিষয়। ফরিদের শিক্ষার বিষয়গুলি মূলত ইসলামী উচ্চশিক্ষার বিষয়। এর থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বা মখতবের শিক্ষার বিষয় সম্পর্কে খুব একটা কিছু জানা যায় না।

প্রাণনাথ চোপরা বারনিয়েরের বিবরণ আর মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদ্মাবতী' কাব্যকে সাক্ষী মেনেছেন সংস্কৃত পড়ুয়ার কথায়।[১৫] কিন্তু বারনিয়ের বেনারসের সংস্কৃত শিক্ষার যে বিবরণ দিয়েছেন তা সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার বিবরণ।[১৬] আর জায়সী পদ্মাবতীর শিক্ষা সম্পর্কে লিখছেন যে, "পদ্মাবতী পাঁচ বছর বয়সে পড়াশুনা শুরু করে এবং পুরাণ পড়তে শিখে জ্ঞানীগুণী হয়ে ওঠে।[১৭] পরে বার বছর বয়সে পোষাপাখী হিরামতীর কাছে বেদ পড়ে।[১৮] এখানে তখনকার প্রাথমিক শিক্ষার কোন কথা পাওয়া যায় না। সাধারণভাবে পদ্মাবতীর শিক্ষার উল্লেখ করা হয়েছে জায়সীর কাব্যে। আলাওল জায়সীর 'পদ্মাবতী' অবলম্বনেই তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেছেন। আলাওলের কাব্যেও দেখা যায় পদ্মাবতী সংস্কৃত শাস্ত্র শিক্ষা করছে।[১৯] বারনিয়ের বা জায়সীর সাক্ষ্য হিন্দুর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। অন্তত তখনকার বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে আসা একেবারেই সম্ভব নয়। আসলে প্রাণনাথ চোপরা

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে এইসব কথা বললেও তিনি প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার বিষয়ের আলাদা আলোচনা করেননি। প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষাকে সম্পর্কিত একটি শিক্ষাধারায় দেখাবার চেষ্টা করেছেন যা প্রাক্-ব্রিটিশ বাংলার পক্ষে ঠিক নয়।

মখতবের শিক্ষা প্রসঙ্গে খালেক আহমদ নিজামী 'মাসালিক-উল আবসারে'র সাক্ষ্যে জানাচ্ছেন যে, "সরকার অসংখ্য মখতবের খরচ দিত।...এইসব মখতবের জন্য হাজার হাজার 'ফকী' (faqihs) নিযুক্ত করা হয়েছিল যাদের বেতন দিত দেওয়ান। তারা (faqihs) অনাথ শিশুদের 'কিরাত' (কোরান আবৃত্তি করা) ও লেখা শেখাত।"[২০] আবার এ. বি. এম. হবিবুল্লার মতো অনেকেই 'মাসালিক-উল-আবসারে'র সাক্ষ্যে দিল্লি ও তার আশপাশে ২০০০ হাজার 'মখতব' ছিল এরকম বলেছেন।[২১] এঁরা সকলেই অটো স্পাইসের 'মাসালিক-উল-আবসারে'র ইংরেজি অনুবাদ উল্লেখ করেছেন। মূল বইয়ে কি ছিল জানি না কিন্তু অটো স্পাইসের অনুবাদে 'মখতব' কথাটা পাইনি। স্পাইস লিখছেন, "এক হাজার মাদ্রাসা ছিল। তার মধ্যে একটি 'সফাইটদের' (Shafites) আর বাকিগুলি হানাফিদের। ৭০টি 'ব্যারামিস্তান' ছিল যাদের 'দারুস সিফা' বলা হত। দিল্লি ও তার আশপাশে প্রায় দুহাজার 'রুবৃত' (asylums) আর 'খানখা' (hospices) ছিল।"[২২] এলিয়ট ও ডাওসনের বইয়ে এগুলিকে 'chapels' এবং 'hermitage' বলা হয়েছে।[২৩] কাজেই দু'হাজার মখতব ছিল দিল্লিতে এরকম কথা বলা যায় না।

আবদুল করিম তার 'Social History of the Muslim in Bengal' বা 'Murshid Quli Khan And His Times' বইয়ে মুসলমান আমলের শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনায় মখতবের উল্লেখ থাকলেও কোন বিস্তারিত বর্ণনা নেই। তিনি প্রধানত মুসলমানের উচ্চশিক্ষা বা মাদ্রাসা শিক্ষার উপরই জোর দিয়েছেন।[২৪] কালীকিঙ্কর দত্তও তাঁর 'Alivardi And His Times' বইয়ে শিক্ষা বিষয়ে একটি অধ্যায় যোগ করেছেন। সেখানেও মখতব সম্পর্কে কোন বিশেষ খবর জানা যায় না।[২৫] ভি. পি. এস. রঘুবংশী তাঁর 'Indian Society in the Eighteen Century' বইয়ে আঠার শতকের সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থার বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনা খুবই যুক্তিপূর্ণ। তবে তিনি মখতব সম্পর্কে আলাদা আলোচনা করেননি। তিনি লিখছেন, "ফারসী স্কুলগুলিতে সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষা

দেওয়া হত; এবং এগুলিকে মখতব বা মাদ্রাসা বলা হত। এগুলি মুঘল রাজা-রাজড়াদের বদান্যতায় চলত।"[২৬] আমরা পরে দেখব বাংলার ফারসী স্কুলগুলিকে ঠিক মখতব বলা যায় না।

আসলে, বিশেষ করে মখতবে কি পড়ানো হত? মখতবের পাঠ্যসূচী কি ছিল? মাদ্রাসার সঙ্গে মখতব শিক্ষার কি প্রভেদ ছিল? বা মখতব ও পাঠশালার শিক্ষায় কি তফাত? এসব বিষয়ে সঠিক জানার মতো উপাদান খুবই কম। সমকালীন সাহিত্য বা ঐতিহাসিক নথিপত্র এবিষয়ে আমাদের খুব একটা অবহিত করে না। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে টোলের শিক্ষা বা পাঠশালা সম্পর্কে অনেক খবর জানা যায়। কিন্তু দু'এক জায়গায় উল্লেখ থাকলেও মখতব বা মাদ্রাসা সম্পর্কে ধারণা করার মতো খবর বড় একটা নেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে। এইসব অসুবিধার কথা মনে রেখেই আমরা বাংলার মখতব সম্পর্কে আলোচনা করব।

ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানপ্রধান দেশগুলিতে বেশ কয়েক ধরনের ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। এদের মধ্যে 'হালকা', 'মখতব', বা 'কুততাব', 'মসজিত' ও 'মাদ্রাসাই' প্রধান।[২৭] আসলে এদের অনেকগুলিই প্রাক্-ইসলামী আমলেও চালু ছিল। তবে ইসলাম ধর্মের প্রভাবে এগুলির অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল।[২৮] এগার-বার শতক নাগাদ এগুলি পুরোপুরি প্রথাবদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল বলেই মনে হয়। কোরানই যে ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি এবিষয়ে প্রায় সব পণ্ডিতই একমত; এমনকি কোরানে নেই এমন কোন বিষয়ে শিক্ষাদানও অনুমোদিত হত না। আসলে কোরানের বাইরের যেসব বিষয় পরবর্তীকালে শেখানো হত তাও চালু হয়েছিল কোরান-নির্দিষ্ট ধর্মীয় আইন বা নিয়মকানুনের সঠিক প্রয়োগের তাগিদে। কোরানের অনুশাসনের ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক ইসলামী উচ্চশিক্ষার বিষয় হলেও কোরানবিরোধী আলোচনা বা কোরানের অনুশাসন বিষয়ে সন্দেহ ইসলামী শিক্ষায় কখনই অনুমোদিত নয়।

মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামী শিক্ষার শুরুর কথা

এ প্রসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে মধ্যযুগে যে ইসলামী শিক্ষাধারা গড়ে ওঠে সে সম্পর্কে দু'এক কথা বলে নেওয়া দরকার। মধ্যযুগের ইসলামী শিক্ষার

উপাদানের উপর বিশেষ গবেষণা করে এ. এস. ট্রিটন জানাচ্ছেন যে, "ইসলামে প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার মধ্যে অনেক তফাত কাজেই এই দুই ধারার শিক্ষা সম্পর্কে আলাদা আলোচনা করাই বিধেয়।" তাঁর মতে, "ইসলামের শুরুর আমল থেকেই শিশুদের স্কুলের অস্তিত্ব ছিল। যদিও এসব স্কুলের একমাত্র পরোক্ষ উল্লেখই পাওয়া যায়।"[২৯] ইসলাম ধর্মের প্রথম একশ বছরে এরকম কয়েকটি উল্লেখের কথাও তিনি জানিয়েছেন তাঁর বইয়ে। একটি উল্লেখে আছে, "শৈশবে কানে দুল পরে সে যখন স্কুলে যেত তখন একজন সাবেক কালের বীরকে দেখে-ছিল।"[৩০] আর একটি উল্লেখে আছে, "উস অল-দারদা লিখছে—শৈশবে শিক্ষা নাও বয়সকালে শিক্ষা দেওয়ার জন্য।"[৩১] আরো উল্লেখ পাওয়া যায় যে একটি স্কুলে তিন হাজার পড়ুয়া ছিল আর শিক্ষক একটি গাধায় চড়ে তাদের পড়াত।[৩২] আর একজন সাবেক লেখকও স্কুলের উল্লেখ করেছেন তবে কোন বিস্তারিত বিবরণ দেননি। আরো জানা যায়, খলিফা এবং আমীররা তাঁদের ছেলেদের শিক্ষার জন্য গৃহশিক্ষক রাখতেন।[৩৩] এও জানা যায় যে, ইসলামের দ্বিতীয় শতকের শিক্ষকরা ছিলেন নামকরা পণ্ডিত। ইবনশিখিত তাঁর বাবার মতোই স্কুলে পড়াতেন। আর ইহাইয়া অল-বরমাকি অনাথ শিশুদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৩৪]

তিনি আরো জানাচ্ছেন যে প্রথম আমলে এইসব শিক্ষকরা ছিলেন বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। "বাবা যেমন ছেলের দৈহিক মঙ্গলের জন্য দায়ী, শিক্ষকরাও তেমনি তাদের মানসিক মঙ্গলের জন্য দায়ী" এরকম বিশ্বাস ছিল লোকের। এরকম প্রবাদ ছিল যে, "শিক্ষক বিনা ঠিক পথে যাওয়ার চেয়ে শিক্ষকের সঙ্গে ভুল পথে যাওয়াও ভাল। যেমন শিক্ষিত কুকুরের শিকার খাদ্য হিসাবে আইনত গ্রাহ্য কিন্তু অশিক্ষিত কুকুরের শিকার তা নয়।"[৩৫] অবশ্য পরবর্তীকালে যে এইসব শিক্ষকরা বড় একটা সম্মানিত ব্যক্তি বলে গণ্য হতেন না তাও তিনি জানাচ্ছেন। তিনি একথাও লিখেছেন যে, "প্রাথমিক শিক্ষকরা ছিল অবজ্ঞার পাত্র। তারা দিনে শিশুদের সঙ্গে কাটাত আর রাত্রে জেনানার সঙ্গে।"[৩৬] এরকম নিয়ম ছিল যে, "শিক্ষকদের অবশ্যই বিবাহিত হতে হবে এবং নিজের বাড়িতে স্কুল করা চলবে না।" ট্রিটন জানাচ্ছেন যে, "এই নিয়ম তখনকার শিক্ষকদের নীতিবোধের প্রতি তীব্র কটাক্ষ সন্দেহ নেই।"[৩৭] অন্য এক জায়গায় তিনি লিখছেন, "একজন শিক্ষকের সন্তান, যে নিজেও একজন শিক্ষক, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সে এত বোকা কেন? উত্তরে সে বলেছিল—যদি

আমি বোকা না হতাম তবে নিশ্চয়ই জারজ হতাম।"[৩৮] আসলে ইসলামী উচ্চশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে এই অবজ্ঞা দেখা দেয় বলেই জানাচ্ছেন বেয়ার্ড ডজ।[৩৯] সম্ভবত একথা ঠিক। ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বেয়ার্ড ডজের লেখা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আমরা এবিষয়ে তাঁর কথাও কিছু শুনে নেব।

মধ্যযুগের ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস আলোচনায় বেয়ার্ড ডজ জানাচ্ছেন যে, পয়গম্বর মহম্মদ যখন ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেন তখন আরব দেশে কোন প্রথাবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না। যদিও খ্রীস্টান, ইহুদী ও কিছু শহুরে লোক লিখতে, পড়তে জানত, বেশির ভাগ আরববাসীই ছিল নিরক্ষর।[৪০] পয়গম্বরের মৃত্যুর বছর পঁচিশেক পরে মুসলমানদের মধ্যে যে দু'এক জন লিখতে-পড়তে জানতেন তাঁরা আরবী ভাষায় কোরানের একটি প্রামাণ্য সংকলন তৈরি করেন। আর এই কোরানের উপর ভিত্তি করেই ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে।[৪১] নিরক্ষর আরবরা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি জয় করলে তাদের নেতারা লুণ্ঠিত বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠে। আর এই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও সুচারু ব্যবস্থাপনার জন্য নিজেদের সন্তানদের শিক্ষিত করে তোলার তাগিদ বোধ করতে থাকে। তাছাড়া তারা যখন তাঁবু ছেড়ে বিজিত প্রাচীন নগর বা নতুন গড়ে উঠা শিবির নগরীতে বাস করতে থাকে তখন তাদের সন্তানদের নাগরিক জীবনের উপযুক্ত করে তোলার প্রয়োজনও দেখা দেয়। স্বভাবতই তারা নিজেদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য গৃহশিক্ষক নিয়োগ করতে থাকে।[৪২] আরবরা নিজেরা শিক্ষিত হয়ে উঠার আগে পর্যন্ত বিজিত শিক্ষিত নাগরিক বা দাসদেরই গৃহশিক্ষক নিয়োগ করা হত।[৪৩] প্রথম দিকে গরিব ছেলেরা মসজিদে আর ধনীসন্তানেরা গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াশুনা করত। এইভাবে শিক্ষার আগ্রহ বাড়তে থাকলে উদ্যোগী শিক্ষকরা ছোট ছোট স্কুল খুলতে থাকে। বিশেষ করে বিজিত ধর্মান্তরিতদের আরবী শেখানোর জন্যও এ ধরনের স্কুলের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছিল। যদিও প্রথম দিকে এইসব স্কুলে তোতাপাখীর মতো কোরান মুখস্থ করানো হত, অচিরেই কোরানের কিছু কিছু সুরার অর্থবোধ করার মতো লেখা ও পড়া শেখানো হতে লাগল।[৪৪] এইভাবেই ইসলামী শিক্ষার গোড়াপত্তন হল। আট শতকের মাঝামাঝি নাগাদ ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষা মোটামুটি একটা প্রথাবদ্ধ রূপ নেয়। প্রথম দিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন বাড়িতে বা কারো দোকানে এই ধরনের স্কুল বসলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক স্কুল-

গুলি মসজিদেই বসত।[৪৫] ধর্মান্তরিত বিজিতদের জন্য অসংখ্য মসজিদ গড়ে-উঠছিল, সেইসঙ্গে গড়ে উঠছিল প্রাথমিক স্কুল। আসলে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন বিজিত দেশের ধর্মান্তরিতদের মধ্যে কোরান ও আরবী ঐতিহ্য প্রচারের প্রয়োজনেই ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল। এইসব স্কুলে শিশুরা দশ বছর বয়স পর্যন্ত কোরানের কিছু অংশ লিখতে ও মুখস্থ করতে শিখত আর কিছু অঙ্কও শিখত। ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের প্রয়োগ সংক্রান্ত হিসেব-নিকেশের জন্য তাদের কিছুটা অঙ্ক শেখা জরুরি হয়ে উঠেছিল। বড় হয়ে ওঠার আগেই পড়ুয়ারা এইসব স্কুলে নমাজ, ওজু প্রভৃতি ধর্মীয় আচারগুলিও শিখে নিত। দশ বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে অনেক সময় আরো তিন বছর ব্যাকরণ, সাহিত্য আর কিছু কিছু ইতিহাস পড়ত।[৪৬]

'আদাবুল-মুয়াল্লিমিনে'র সাক্ষ্যে ডজ জানাচ্ছেন যে 'আব্বাসিদ' আমলে ছেলেরা সকালের অর্ধেক সময় পড়ত, তারপর অল্প বিশ্রামের পর বাকি অর্ধেক দিন লেখা শিখত। এই পড়া আর লেখার বিষয় ছিল কোরান। মঙ্গলবার বিকেলে আর বৃহস্পতিবার সকালে ছেলেরা তাদের লেখা শুধরে নিত। শুক্রবার ছিল ছুটির দিন। অন্যান্য উৎসবের দিনেও ছুটি থাকত। শিক্ষকদের দেয় মাসিক বা বাৎসরিক বেতন সাধারণত কাজীরাই ঠিক করে দিত। শাস্তি হিসাবে বা পড়ুয়াদের সাহসী করে তোলার জন্য বেত মারার প্রথাও চালু ছিল। অবশ্য ছেলেরা যাতে আহত না হয় সেদিকেও নজর রাখা হত।[৪৭] প্রথম দিকে, শিক্ষা দেওয়া ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে বিবেচনা করে, শিক্ষকরা বিনা বেতনে শিক্ষা দিলেও অচিরেই তারা বেতন হিসাবে খাদ্যদ্রব্য বা অর্থ আশা করতে থাকে। কালে শিক্ষকতা একটি অর্থকরী পেশা হয়ে উঠে।[৪৮] ফলে বেশি আয়ের আশায় বেশি বেশি পড়ুয়া ভর্তির রেওয়াজ দেখা দেয়। ডজ জানাচ্ছেন যে, 'উমাইয়াদ' আমলে একটি স্কুলে তিন হাজার পড়ুয়া ছিল। শিক্ষক একটি গাধায় চড়ে তাদের পড়াতেন। প্রাথমিক শিক্ষকরা যে পরে নিতান্তই অবজ্ঞার পাত্র হয়ে উঠেছিল এও হয়ত তার একটা কারণ। তবে সাধারণত স্কুলগুলিতে ত্রিশ-চল্লিশ জন পড়ুয়া থাকত। শিক্ষক বসতেন একটি টুলে আর পড়ুয়ারা তাঁর চারদিকে গোল হয়ে মাটিতে বসত। তখন শ্লেটের বিশেষ প্রচলন না থাকায় ছেলেরা পাটায় লিখত। মুছে বা ধুয়ে নিয়ে তাতে আবার লেখা যেত।[৪৯] জিমার জানাচ্ছেন যে, চার বছর চার মাস চার দিন বয়সে মুসলমান শিশুর বিসমিল্লা সংস্কার হত। তারপর বিশেষ করে স্বচ্ছল পরিবারের ছেলেরা স্কুলে

গিয়ে অক্ষর শিখত। এইসব স্কুল সাধারণত কোন দোকানের এক কোণে বা কোন মসজিদে বসত। শিক্ষককে ঘিরে পড়ুয়ারা মাটিতে আসন বিছিয়ে বসত। সবাই একসঙ্গে পড়া করত। পড়ুয়াদের কোন শ্রেণী বা স্তরভেদ ছিল না। শিক্ষকের দক্ষ কানে, কোন্ পড়ুয়া ভুল উচ্চারণ করছে বা কে কোন্ শব্দ বাদ*দিয়ে গেছে ঠিক ধরা পড়ত। কেউ হয়ত অক্ষর বলছে, কেউ কোরানের প্রথম সুরা মুখস্থ করছে, কেউ অন্য কোন সুরা জোরসে পড়ে চলেছে। সব একসঙ্গে মিলে এক বিষম সোরগোল হত। এভাবেই পড়া চলত। এই পদ্ধতিতে স্মৃতিশক্তির চর্চা হলেও বিচারশক্তির কোন উন্মেষ হত না। কাঠের শ্লেটে লেখা চলত। কিছু লেখা শেখা আর কোরান মুখস্থ করেই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হত।[৫০]

এই ইতিহাস থেকে আমরা কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও বাংলার মখতব শিক্ষার পক্ষে প্রাসঙ্গিক কথা জানতে পারি। প্রথমত, ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষার গোড়াপত্তন ও প্রসারের সঙ্গে বিজিত ধর্মান্তরিতদের ইসলামী আদর্শে শিক্ষিত করার প্রশ্নটি বিশেষভাবে জড়িত। দ্বিতীয়ত, কোরানই ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি ও প্রায় একমাত্র বিষয়। কোরান মুখস্থ করা, কোরান পড়া এবং কোরানের অংশ লিখে লেখা শেখাই প্রধানত ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষার সূচী। এমনকি অঙ্ক শেখাও ইসলামী উত্তরাধিকার আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত হিসেব-নিকেশের জন্যই। তৃতীয়ত, ইসলামী প্রাথমিক স্কুলগুলি মসজিদ সংলগ্ন হয়েই গড়ে ওঠে। ফলে এগুলিতে 'সেকুলার' বা ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ নেই বললেই চলে। চতুর্থত, এ ধরনের স্কুলের শিক্ষকদের খুব একটা শিক্ষিত না হলেও চলে। স্বভাবতই ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকরা সমাজে খুব একটা সম্মানের আসন পেত না। সবচেয়ে বড় কথা, সমাজের উঁচুস্তরের মানুষেরা বিশেষ করে ইসলামী পণ্ডিতসমাজ ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষকদের যারপরনাই অবজ্ঞা করত।

একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে মধ্যযুগের বাংলার মখতব শিক্ষা প্রসঙ্গেও এই কথাগুলি খাটে। সে আলোচনার আগে উল্লেখ করা দরকার যে ট্রিটন বা ডজের লেখায় ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে 'মখতবে'র উল্লেখ বড় একটা পাওয়া যায় না। যদিও 'মাদ্রাসা'র উল্লেখ দেখা যায়। 'মখতব' একটি আরবী কথা। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে ছোটদের লেখা শেখার প্রতিষ্ঠানগুলিকে 'মখতব' বা 'কুত্তাব' বলা হত। এগুলি

সম্ভবত প্রাক্-ইসলামী আমলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।[৫১] ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়ের পর ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাবে এগুলির শিক্ষণীয় বিষয়ের বিশেষ পরিবর্তন হয়। কোরান পড়া ও ধর্মীয় শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হতে থাকে।[৫২] কোন কোন মখতবে সেইসঙ্গে কিছু কিছু লেখা, অঙ্ক, ব্যাকরণ ও কাব্য পড়ার রেওয়াজও সম্ভবত চালু হয়। কালে এগুলি আর শুধু লেখা শেখার স্কুল থাকে না। বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে ভিন্নভাষী বিজিত দেশে, লেখা শেখা গৌণ স্থানলাভ করে। ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষার স্কুল হিসাবেই কালে মখতব শিক্ষার প্রসার ঘটে। কোরান পড়া এবং ধর্মীয় আচার শেখাই মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে। আমরা জানি সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং নাগরিক জীবনের প্রয়োজনেই ইসলামী শিক্ষা বিকাশলাভ করে এবং অঙ্ক প্রভৃতি কোরানের বাইরের বিষয়ও ইসলামী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়। গ্রামবাংলার ধর্মান্তরিত গরিব মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার চাহিদা কিন্তু ঠিক এরকম ছিল না। গ্রামবাংলার ধর্মান্তরিত মুসলমানদের কোরানে বিশ্বাস ও ইসলামী আচার শেখানোই ছিল সবচেয়ে জরুরি। বাংলার মখতবগুলি মূলত এই ভূমিকাই পালন করেছে। ধর্মান্তরিতদের ধর্মীয় শিক্ষার তাগিদেই বাংলায় মখতব শিক্ষা চালু হয়। আবার এই ধর্মীয় শিক্ষার প্রাধান্যই মখতব শিক্ষাকে সংকীর্ণ গণ্ডীতে বেঁধে রাখে।

বাংলার মখতব ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য

মুসলমান অধিকারের পরই ভারতবর্ষে মখতব ও মাদ্রাসা শিক্ষা চালু হয়। সন্দেহ নেই, ধর্মান্তরিত ভারতীয়দের ইসলামী আদর্শে শিক্ষিত করাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। সুলতান সাহাবুদ্দিন বা মুহম্মদ ঘুরীই সম্ভবত প্রথম ভারতে ইসলামী শিক্ষা প্রচারের উদ্যোগ নেন। তিনি আজমীরে বেশ কয়েকটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। মুহম্মদ ঘুরীর কোন ছেলে ছিল না। ফলে ঘুরী তাঁর দাসদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। এই শিক্ষিত তুর্কী দাসদের একজন কুতুবুদ্দীন ভারতে দাস সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইসলামী শিক্ষা প্রসারে বিশেষ সচেষ্ট হন। মুহম্মদ ঘুরীর মতোই তিনি ভারতীয় হিন্দুদের মন্দির ইত্যাদি ভেঙে মসজিদ, মাদ্রাসা প্রভৃতি স্থাপন করেন।[৫৩] কুতুবুদ্দীনেরই এক সেনাপতি বক্তিয়ার খিলজী প্রথম বাংলায়

মসজিদ, মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তিনিও কুতুবদ্দীনের মতোই স্থানীয়দের মন্দির ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে ইসলামী শিক্ষা প্রচারের উদ্যোগ নেন।[৫৪] বাংলার পরবর্তী মুসলমান সুলতানদের আমলে কিন্তু বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষার অসামান্য উন্নতি ও প্রসার ঘটে।

মধ্যযুগে মূলত ধর্মান্তরিত মুসলমান শিশুদের শিক্ষার জন্যই বাংলায় মখতব ও মাদ্রাসা শিক্ষা চালু হয়। অবশ্য কালে হিন্দুরাও এতে পড়াশুনা করত এমন নজিরও কিছু পাওয়া যায়। বাংলাব ঠিক কবে প্রথম মখতব প্রতিষ্ঠিত হয় বা কে প্রথম মখতব স্থাপন করেন সে খবর জানা যায় না। তবে বক্তিয়ার খিলজীর আমলেই যে প্রথম বাংলায় মাদ্রাসা স্থাপিত হয় সে প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবত একই সময় মখতব শিক্ষাও বাংলায় চালু হয়।

যাইহোক, মুসলমান অধিকারের পর এদেশীয় নীচুশ্রেণীর মানুষ ধর্মান্তরিত হতে থাকলে মখতব শিক্ষার প্রসার ঘটে বলেই মনে হয়। মধ্যযুগের মুসলমান ঐতিহাসিকদের বিবরণে ধর্মান্তরের অনেক খবর পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের কথাও জানা যায়। তবে ইসলামী উচ্চশিক্ষার কথাই সেখানে বেশি। ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষার খবর খুব একটা নেই বললেই চলে। এই ধর্মান্তরের ইতিহাস খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় বহু-ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছায় এই ধর্মান্তর ঘটেছিল। 'ফুটাহত-ই-ফিরোজশাহী'তে ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলে ব্যাপক ধর্মান্তর ঘটেছিল বলে উল্লেখ আছে। ফিরোজ শাহ তুঘলক ইসলামী শিক্ষা বিস্তারেও এক বড় ভূমিকা নেন।[৫৫]

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও এই ধর্মান্তরের এবং মখতব প্রতিষ্ঠার কিছু খবর পাওয়া যায়। কাজেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য এবিষয়ে আমাদের কতটা অবহিত করে তাও দেখা দরকার। বিপ্রদাস পিপলাইয়ের 'মনসা-বিজয়' এবিষয়ে আমাদের বেশ খানিকটা ওয়াকিবহাল করে। বিপ্রদাস পিপলাই লিখছেন—

জতেক ছৈয়দ মোল্লা জপয়েত বিসমিল্লা
সদা মুখে কলিমা কেতাব।
হিন্দুত কলিমা দিল মুছলমানি শিখাইল
তথা বৈসে জত মুছলমান
শিখাএ নামাজ অজু সদাই মজুবে রুজু
নিরন্তর খলিপা জোগান।[৫৬]

বিপ্রদাস পিপলাই পনের শতকের কবি। যদিও সুকুমার সেন সম্পাদিত 'মনসা বিজয়ে'র আদর্শ পুঁথি আঠার শতকের।[৫৭] 'মনসা বিজয়ে'র এই ছত্রগুলি যারপরনাই তাৎপর্যপূর্ণ। বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মূল রচনায় এই ছত্রগুলি ছিল কিনা সেবিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। তবে 'মনসা মঙ্গলে'র হাসান-হোসেন পালা যে বেশ সাবেক কালের রচনা সেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' বা অন্যান্য 'মনসা মঙ্গলে'ও এই পালা দেখা যায়। অবশ্য মখতব শিক্ষার উল্লেখ তেমন আর কোথাও পাওয়া যায় না। নারায়ণদেবের 'পদ্মাপুরাণে' এই পালা নেই। শুধু দুই জায়গায় সামান্য কয়েক ছত্রে হাসান-হুসেনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে নারায়ণদেবের 'পদ্মা-পুরাণে'র সম্পাদক তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত জানাচ্ছেন যে, বিজয়গুপ্তের পুঁথিতে বর্ণিত হাসান-হুসেন পালাতে ১৫-১৬ শতাব্দীর বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। "নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত ও হুসেন সাহের অনেক পূর্ব্ববর্তী ব্যক্তি বলিয়া এই পালাটি তাঁহার পুথিতে পাওয়া যায় না। হাসান-হুসেনের যে সব উল্লেখ নারায়ণ দেবের পুথিতে পাওয়া যায়, তাহা যে অনেক পরবর্তী গায়কগণ ও লেখকগণ কর্ত্তৃক সংযোজিত হইয়াছে সুতরাং প্রক্ষিপ্ত, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।"[৫৮]

যাইহোক, পনের-ষোল শতকের অন্যান্য কবিদের কাব্যে বাংলার মখতব শিক্ষা সম্পর্কে আরো কি জানা যায় তাও দেখা দরকার। বাংলা চণ্ডীমঙ্গলে এবিষয়ে কিছু উল্লেখ দেখা যায়। ষোল শতকের কবি দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে' কালকেতু পালায় আছে—

বৈসয়ে মুসলমান পড়ে কিতাপ কোরান
নমায়াজ পড়ে পাঁচবার।
সোলেমানী মালা করে খোদার নামে জিগির কাড়ে
সৈদ কাজী বোসিল অপার।[৫৯]

দ্বিজ মাধব কালকেতুর রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির প্রজাগণের বসতির বর্ণনা করতে গিয়ে এই ছত্র কয়টি লিখেছেন। এখানে মখতবের উল্লেখ না থাকলেও 'কিতাপ কোরাণ' আর 'নমায়াজ' পড়ার কথা পাই। ষোল-শতের শতকের কবি মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' কিন্তু মখতবের পড়াশুনার বর্ণনা আছে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতু প্রতিষ্ঠিত নগরে—

যতশিশু মুছলমান তুলিল দলিঞ্জখান
মখদম পড়ান পড়না।

অন্য একটি পাঠে আছে—

যত শিশু মুছলমান তুলিল মক্কবখান
মখদম পড়ায় পঠনা।[৬০]

'মনসা বিজয়' ও 'চণ্ডীমঙ্গলে'র এই ছত্রগুলি থেকে বেশ বোঝা যায় যে, মুসলমান অধিকারের পর মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মতোই বাংলায়ও ধর্মান্তরিতদের ইসলামী আচার নামাজ-অজু শেখানোর ব্যাপারে মখতব এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। একই কারণে বাংলায়ও ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার জরুরি হয়ে উঠেছিল। ধর্মান্তরিত মুসলমানদের প্রয়োজনেই যে বাংলার নানা অঞ্চলে গ্রামে-গঞ্জে বহু মসজিদ স্থাপিত হয় তাতে সন্দেহ নেই। এইসব মসজিদকে কেন্দ্র করেই যে বাংলায় মখতব ও মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠে তাতেও সন্দেহ নেই। এইসব মসজিদেই সাধারণত মখতব বসত। আবদুল করিম জানাচ্ছেন, "দূর এলেকায় স্থাপিত মসজিদগুলি মখতব ও মসজিদ দুয়েরই কাজ করত। মুঘল আমলে বাংলায় সাধারণত একতলায় মখতব বসত আর দোতলায় থাকত মসজিদ যেমনটি দেখা যায় ঢাকার খান মহম্মদ মির্ধার মসজিদ বাড়ীতে।"[৬১] আর মসজিদের ইমাম বা পেসি ইমামই মখতবের শিক্ষকের কাজ করত। তাদেরকে মৌলভি বা মিঞাজি বলা হত।[৬২] মখতবগুলি যে শুরুতে অন্তত, ধর্মীয় প্রভাবে ও মসজিদের আশ্রয়ে গড়ে উঠেছিল তাতেও কোন সন্দেহ নেই। এইসব মখতবে কোরানের কিছু অংশ মুখস্থ করানো আর নামাজ, অজু শেখানো ছাড়া হয়ত অল্পস্বল্প লেখা শেখানো হত। ইসলামী সংস্কৃতির প্রসার বা ইসলামভাবাপন্ন মুসলমান সমাজ গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে এইসব মসজিদ সংলগ্ন মখতবগুলি স্থাপিত হলেও মখতবের বিশেষ পাঠ্যসূচী বা পাঠবিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বা সমসাময়িক ইতিহাসে খুব একটা পাওয়া যায় না বললেই চলে।

ধর্মীয় তাগিদে গড়ে ওঠায় ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষা ধর্মীয় আওতার বাইরে এসে 'সেকুলার' ব্যবহারিক শিক্ষায় পরিণত হতে পারেনি বলেই মনে হয়। ব্যতিক্রম হিসাবে হয়ত দু'একটি মখতবে কিছু ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হত। তবে মখতব শিক্ষা কখনই বাংলা পাঠশালার মতো সকল ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণীর লোকের সাধারণ ব্যবহারিক শিক্ষার চাহিদা মেটাতে পারেনি। অবশ্য ধর্মান্তরিত

মুসলমান শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার চাহিদা মেটাতে মখতব শিক্ষা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সন্দেহ নেই। আঠার-উনিশ শতক নাগাদ দেখা যায় বেশির ভাগ মখতবই আসলে কোরান স্কুল।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় যে মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের কাব্যেও মখতবের কথা বা পড়াশুনার বিবরণ বড় একটা নেই। আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যে পাঠবিষয়ের যে বর্ণনা আছে তাতে 'আরবী ফারসী আর মগী হিন্দুয়ানী'র উল্লেখ থাকলেও 'কাব্য', 'অলঙ্কার,' 'ব্যাকরণ', 'পুরাণ', 'পিঙ্গল', 'আগম', প্রভৃতি সংস্কৃত শিক্ষার বিষয়েরই প্রাধান্য।[৬৩] তবে তাঁর 'তোহ্‌ফা' নামক তত্ত্ব-উপদেশমূলক রচনায় ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে কিছু কথা আছে। আলাওল তার 'তোহ্‌ফা'য় লিখছেন—

বিদ্যা বিনু যে রহে যুগল আঁখি অন্ধ।
যত্ন কর সর্ব হস্তে বিদ্যা পঠ ভাল।
না পড়িলে অনুশোচে গোয়াইব কাল॥

* * *

সর্বশাস্ত্র শিখ আগে পড়িয়া কোরাণ।
ঈশ্বর চিনিতে বিদ্যা পঠ জন্মভর।
বিদ্যার নির্মল জ্যোতে (জ্যোতিতে) চিনিব ঈশ্বর॥[৬৪]

দেখা যাচ্ছে আলাওল আগে কোরান পড়ে পরে সর্বশাস্ত্র পড়ার কথা বলছেন। আর ঈশ্বরকে জানার জন্যই যে পড়াশুনা তাও লিখছেন। কোরানই যে ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি এবং ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মখতবের প্রধান পাঠ্যবিষয় তা আমরা আগেই জেনেছি। আলাওল তাঁর তোহ্‌ফায়, অর্থ না বুঝেও যে মুসলমান কলেমা পড়তে পারে, সে সবার পূজ্য একথাও ঘোষণা করেছেন।[৬৫] তোহ্‌ফা বাংলা ভাষায় লেখা ইসলামী আচার বিষয়ক রচনা। কাজেই তোহ্‌ফার সাক্ষ্য নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ। তোহফার পরোক্ষ সাক্ষ্য থেকে অনুমান হয় বাংলার মসজিদ সংলগ্ন মখতবেও প্রধানত কোরান পড়া হত। এবং না বুঝে পড়ারই রেওয়াজ ছিল। কারণ আরবী বিদেশী ভাষা, সে ভাষা সবার বোধগম্য হত না। তবে একথাও ঠিক আলাওল কোথাও মখতবের উল্লেখ করেননি। দেখা যাক আর আর মুসলমান কবিদের কাব্যে মখতব শিক্ষার কোন খবর পাওয়া যায় কিনা।

দৌলত কাজীর 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী' কাব্যে দেখি—

শ্রীযুক্ত আশরফ খান অমাত্য প্রধান।
ষোলকলা পূর্ণ যেন চন্দ্রমা সমান ॥
নীতি বিদ্যা কাব্য শাস্ত্র নানা রস চয়।
পড়িলা শুনিলা নিত্য সানন্দ হৃদয় ॥
হেন মতে সভা করি বসিয়া থাকিতে।
কহেন্ত সানন্দ চিত্তে প্রসঙ্গ শুনিতে ॥
আরবী ফারসী নানা তত্ত্ব উপদেশ।
বিবিধ প্রসঙ্গ কথা আছিল বিশেষ ॥[৬৬]

এক আরবী-ফারসী নানা তত্ত্ব উপদেশের কথা ছাড়া খুব একটা কিছু জানা গেল না। তবে একথা ঠিক, তখন আরবী-ফারসী পড়ার যে কিছু রেওয়াজ ছিল তা বোঝা যায়। যদি ধরে নেওয়া যায় এই কাব্যদুটির মূল চরিত্রগুলি হিন্দু তাই ইসলামী শিক্ষার প্রসঙ্গ বিশেষ নেই তাহলে দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লায়লী-মজনু' কাব্যেও ইসলামী শিক্ষার প্রসঙ্গ কেন নেই সে প্রশ্ন থেকে যায়।

দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লায়লী-মজনু' কাব্যে পাঠশালার উল্লেখ পাই, পাঠশালা ঘরের বর্ণনা পাই কিন্তু মখতব বা মাদ্রাসার বা ইসলামী শিক্ষাধারার কোন খবর পাই না। আহমদ শরীফ লিখছেন, "হিন্দু পুরাণের প্রতুল ব্যবহারে, ঘরোয়া জীবন চিত্রে, প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনায় কিংবা রীতি-নীতি ও আচার-সংস্কারের আলেখ্যে কবি তাঁর চোখে দেখা প্রতিবেশ ও ঐতিহ্যসূত্রে পাওয়া বিশ্বাস-সংস্কার এবং শিক্ষালব্ধ জ্ঞানকেই স্বীকার করেছেন। ফলে এ কাব্যে আরবী বিনামে বাঙলা দেশ ও বাঙালী জীবনেরই ছবি পাই।"[৬৭] খুবই সত্যি কথা। আসলে উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত বাঙালি মুসলমান কবিদের কাব্য আর বাঙালি হিন্দু কবিদের কাব্য ছিল একই সুরে বাঁধা বাংলা কাব্য। বোঝা যায়, তখনো বাংলা ভাষা শেখার বা বাংলা ভাষা চর্চার আদর্শ প্রতিষ্ঠান ছিল বাংলা পাঠশালা। আর বাঙালি মুসলমান কবিরাও সম্ভবত বাংলা পাঠশালাতেই বাংলা শিখতেন, তাই তাঁদের কাব্যে বাংলা পাঠশালার অনেক উল্লেখ আর মখতবের অনুল্লেখ দেখি। মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের কাব্যে মখতবের এই প্রায় অনুল্লেখ কিন্তু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মধ্যযুগে বাংলা ভাষার চর্চা ও বাংলা সাহিত্যের বিকাশে মখতব শিক্ষার অবদান যে নিতান্তই নগণ্য

সেবিষয় সন্দেহ নেই। তাই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি কবিদের কাব্যে পাঠশালার কথাই বেশি করে পাই।

মখতব ও বাংলা শিক্ষা

মসজিদ সংলগ্ন আদি মখতবগুলিতে বাংলা শেখানো হত কিনা বা বাংলা শেখানো হলে কবে থেকে মখতবে বাংলা শেখানো শুরু হয় সে খবর জানার কোন উপায় দেখি না। সতের শতকের কবি দোনাগাজীর 'সয়ফুল মুলক-বদিউজ্জমাল' কাব্যে পাঠ্যবিষয়ের যে বিবরণ আছে তাতেও দেখি মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের রীতিতে সংস্কৃত শিক্ষার বিষয়—"কাব্যশাস্ত্র রতিশাস্ত্র শিখিল পুরাণ/ সিদ্ধি শাস্ত্র আগম জ্যোতিষ আর যথ / শিখিল যথেক শাস্ত্র কি কহিব কথ"।[৬৮] তবে কালে মসজিদের বাইরেও যে ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল সে খবর পাওয়া যায়। শেখ মনোহরের 'শমসের গাজীনামায়' কোরান ও বিভিন্ন ভাষা শেখার উল্লেখ দেখা যায়। এর থেকে অবশ্য বাংলার সব মখতবে এই পাঠ্যসূচী ছিল এরকম সিদ্ধান্ত করা যায় না। হয়ত কোন কোন মখতবে বা মাদ্রাসায় এরকম শেখানো হত। শেখ মনোহর মখতব বা মাদ্রাসার উল্লেখ করেননি। তিনি শামসের গাজীর 'তোলাবখানা'র কথা বলেছেন। আঠার শতকের শেষ পাদের কবি শেখ মনোহর তাঁর 'শমসের গাজীনামা'য় লিখছেন—

তোলাব খানায় ছাত্র শতেক রাখিয়া
গাজী পালে সে সকলে অন্নবস্ত্র দিয়া।
সন্দ্বীপের অন্ধ এক হাফিজ আনিয়া
কোরান পড়াএ সবে পুণ্যের লাগিয়া।
হিন্দুস্তান হৈতে এক মৌলবী আনিল
আরবী এলেম ছাত্রগণে শিখাইল।
যুগদিয়া হৈতে এক গুরুবর আনি
শিখাইল ছাত্রগণে বাঙ্গালার বাণী।
ঢাকা হইতে মুন্‌শী আনি ফারসী পড়াএ
হেনমতে নানা ভাষাএ এলেম শিখাএ।
দিনমধ্যে নিয়ম করিল হেন মতে
দশ দশ দণ্ড ধরি ত্রিভাগে পড়িতে।

ভোর রাত্রি চারি দণ্ড আগাজে প্রহর
পাঠের সময় করে দিল গাজীবর।[৬৯]

শামসের গাজী, যিনি আলিবর্দীর সময়ের লোক বলে জানা যায়, তাঁর 'তোলাবখানা'য় বিভিন্ন ভাষা শেখার এই আয়োজন দেখে অনেকেই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, মখতবে একাধিক ভাষা বিশেষ করে আরবী, ফারসী ও বাংলা শেখানো হত। আবদুর রহিম লিখছেন, "ধর্মীয় শিক্ষাদানই ছিল প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি।...ধর্মীয় বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়াদিও মক্তবে পড়ান হ'ত।... প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে আরবী, ফার্সী ও বাংলা—এই তিনটি ভাষা শিক্ষা করতে হত।"[৭০] তিনি শামসের গাজীর 'তুলবাইখানা'র উল্লেখ করে লিখছেন, "এতে প্রমাণ হয় যে ফার্সী, আরবী ও বাংলা বঙ্গদেশের বিদ্যালয় সমূহে পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল। 'সারদা মঙ্গল' নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে আরো একটি প্রমাণের দ্বারা এই ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ গ্রন্থে আছে যে, রাজা গোবিন্দ তার পুত্র লক্ষাদরকে পণ্ডিত গৌরীদাসের তত্ত্বাবধানে রাখার সময়ে তাকে বলেছিলেন যে, বালককে বাংলা, নাগরী (হিন্দী) ও উৎকল (উড়িয়া) ভাষা শিক্ষা দিতে হইবে।"[৭১] এরকম দলছুট নজির থেকে এতবড় সিদ্ধান্ত করা কিন্তু ঠিক নয়। বাংলার পাঠশালা বা মখতবগুলিতে অন্তত এতসব ভাষা পড়ানো হত এমন নজির বড় একটা মেলে না। আজিজুর রহমান মল্লিক ঠিক উল্টো কথা বলেছেন। তিনি লিখছেন যে, "মখতব বা প্রাথমিক আরবী শিক্ষার স্কুলগুলির শিক্ষকরা ছিল অর্ধশিক্ষিত এবং এগুলিতে শুধুই না বুঝে কোরান মুখস্থ করানো হত। আর পাঠশালাগুলি ছিল সংস্কৃত প্রভাবিত বাংলা স্কুল এবং মুসলমানরা এইসব স্কুলে পড়তে আগ্রহী হত না।"[৭২] আজিজুর রহমানের এই উক্তির সঙ্গে একমত না হয়েও বলা যায় মখতবগুলি যে মূলত কোরান স্কুল ছিল এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অন্তত এ পর্যন্ত আমরা যেসব সাক্ষ্যপ্রমাণ পেয়েছি তা থেকে এরকম ধারণাই হয়। ভারতীয় শিক্ষা কমিশন ও কমিশনের বাংলা প্রদেশ কমিটির সামনে যাঁরা মুসলমানের শিক্ষা বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাঁরাও মখতব সম্পর্কে মোটামুটি একথাই বলেছেন।[৭৩] আবদুর রহিমের এ সিদ্ধান্তের সপক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণের বড়ই অভাব। আবদুর রহিম অবশ্য তাঁর বইয়ের বহু জায়গায় এরকম অসিদ্ধ সিদ্ধান্ত করেছেন। যেমন, তিনি মখতব আর পাঠশালার মধ্যে বড় একটা তফাত করেননি। তাঁর মতে, "প্রাথমিক বিদ্যালয় মক্তব বাংলাতে পাঠশালা নামেও অভিহিত হত।"[৭৪] তিনি এমনকি

একথাও লিখছেন যে, "সুতরাং মিঃ অ্যাডাম কর্তৃক উল্লিখিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ছিল মুসলমান আমলে স্থাপিত এবং এর বেশির ভাগই পুরনো মক্তব।"[১৫] এগুলি যে 'পুরনো মক্তব' সেকথা কিন্তু তাঁর লেখা থেকে প্রমাণ হয় না। কোন তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই তিনি এতবড় একটা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছেন। আর এই গোড়ায় গলদের জন্যই আবদুর রহিমের আলোচনার উপর নির্ভর করা অসুবিধাজনক। আসলে আবদুর রহিমের নিজের লেখাই তাঁর এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যায়। আমরা এবিষয়ে কিছু আলোচনা করব।

আবদুর রহিম লিখছেন, "বহু মুসলমান কবি বাংলা ভাষায় তাঁদের গ্রন্থাদি রচনা করেন। ধর্মীয় বিষয়ের উপরও তাঁরা একই ভাষায় তাঁদের গ্রন্থাদি রচনা করেন। তাঁদের লেখা থেকে প্রকাশ পায় যে, বেশীর ভাগ মুসলমান আরবী ও ফার্সী ভাষা বুঝতে অক্ষম ছিলেন। এবং সে জন্য তাঁরা বাংলা ভাষায় লিখতেন যাতে সাধারণ লোকেরা পড়তে ও বুঝতে সক্ষম হন। এতে প্রমাণ হয় যে, সাধারণ লোকেরা ধর্মীয় ও অন্যান্য বিষয়ের উপর বাংলায় লিখিত পুস্তকাদি বুঝতে পারতেন। সুতরাং বাংলা পড়ানো হত এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে এই ভাষাই শিক্ষার মাধ্যমরূপে প্রচলিত ছিল।"[১৬] এখন প্রশ্ন হচ্ছে বেশির ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালযে, সে মখতবই হোক আর পাঠশালাই হোক, 'আরবী ফার্সী ও বাংলা—এই তিনটি ভাষাই' যদি পড়ানো হয় তবে বেশির ভাগ শিক্ষিত মুসলমান আরবী, ফারসী বুঝতে অক্ষম হয় কিভাবে? তাঁর কথায় কিন্তু প্রমাণ হয় বেশির ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুধু বাংলাই পড়ানো হত। এখন আবদুর রহিমের কথামতো 'ধর্মীয় শিক্ষাদানই' যদি 'প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি' তাহলে মখতবে কোরান অবশ্যপাঠ্য ছিল। কোরান যেহেতু আরবী ভাষায় লেখা, ধরে নেওয়া যায়, যেসব মখতবে কোরান মুখস্থ ছাড়াও পড়তে ও লিখতে শেখানো হত সেসব মখতবে আরবী ভাষাই শেখানো হত। হয়ত কিছু কিছু মখতবে এইসঙ্গে বাংলাও পড়ানো হত। সে ক্ষেত্রে শিক্ষিত মুসলমানের পক্ষে আরবী না বোঝার কোন কারণ নেই। আসলে বেশির ভাগ মখতব ছিল কোরান মুখস্থ করার স্কুল। ভাষা শেখার স্কুল হিসাবে মখতবের অবদান খুবই সীমিত সন্দেহ নেই। অন্যদিকে পাঠশালাগুলিতে শুধুই বাংলা শেখানো হত। আর লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার স্কুল হিসাবেই এগুলির গুরুত্ব। মুসলমান কবিরা যে বাংলায় লিখতেন এবং সাধারণ লোকেরা যে বাংলাই পড়তে ও বুঝতে সক্ষম ছিলেন এতে বোঝা যায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব ধর্ম ও বর্ণের

লোকেদের সন্তানরাই পাঠশালায় পড়ত। মনে রাখতে হবে বাংলার হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মানুষের সকলেরই মাতৃভাষা বাংলা। কাজেই হিন্দু-মুসলমান সকলেই বাংলা শিখবে, বাংলায় লিখবে, বাংলা পড়বে এটাই তো স্বাভাবিক।

এ প্রসঙ্গে মীর মশাররাফ হোসেনের বাল্যশিক্ষার যে বিবরণ তাঁর 'আমার জীবনী'-তে লেখা আছে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। মীর মশাররাফ ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে জন্মেছিলেন। তখনো গ্রামবাংলায় প্রাক্-ব্রিটিশ দেশজ শিক্ষাধারা চালু ছিল। তিনি লিখছেন, "চার বৎসর চার মাস চার দিন পর আমার হাতে তাক্তি (হাতে খড়ি) হইয়াছিল। ...কোন কোন গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ছিল। মক্তাব মাদ্রাসার নামও কেহ জানিত না। ফারসী আরবী কেহ পড়িত না...গ্রামে আরবী ফারসী পড়ার নিয়ম নাই, প্রয়োজনও বেশী নাই। পুণ্য জন্য আরবী শিক্ষা। কোরাণ শরীফ পাঠ।...সে পড়া পড়িয়া যাওয়া মাত্র, আরবি কোরাণ শরীফের অর্থ কেহই আমাদের দেশে জানিতেন না।...আমি নন্দী মহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা অক্ষর লেখা শিক্ষা করিতে লাগিলাম। আরবি বর্ণমালা শিক্ষার অগ্রে বাঙ্গালার বর্ণমালা মুখস্থ হইল। তালপাতে অক্ষর লিখিতে শিখিলাম।"[৭৭] মীর মশাররাফের বাবার অনুরোধে জগমোহন নন্দী তাঁর পাঠশালা জায়নাবাদ গ্রাম থেকে লাহিনীপাড়ায় উঠিয়ে এনেছিলেন। আর সেখানেই মীর মশাররাফ বাংলা শেখেন। তিনি সেই সঙ্গে কোরান মুখস্থ করেন। এভাবেই তখন গ্রামবাংলার মুসলমানের লেখাপড়া শেখা চলত।

এইসঙ্গে আমরা আবুল মনসুর আহমদের 'আত্মকথা'র সাক্ষ্যে উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের গোড়ায় অবস্থাটা কি ছিল তাও জেনে নিতে পারি। তিনি লিখছেন, "...পাঁচ বৎসর বয়সে আমি চাচাজীর মক্তবে ভর্তি হইলাম, মানে অযু করিয়া পাক-সাফ হইয়া তহবন্দ-পরা অবস্থায় তালেবিলিমদের কাতারের এক কোণে বসিয়া পড়িলাম।...আমার বয়স সাত বছর পূর্ণ হইবার অনেক আগেই আমি কোরআন শরিফ 'মতন পড়া' শেষ করিলাম। 'মতন পড়া' মানে অর্থ না বুঝিয়া কোরআন পড়া।...তৎকালে লেখা ও পড়া ছিল দুইটা আলাদা কাজ। বই-পুস্তক হাতে পড়ুয়ারারে পথে-ঘাটে দেখিলেই বুড়ারা পুছ করিতেন : 'তুমি লেখ, না পড় ?' এ প্রশ্নের কারণ ছিল। মকতবে শুধু পড়া হইত। লেখা হইত পাঠশালায়। তার মানে বাংলা পড়াতেই লেখার দরকার হইত। আরবী-ফারসী-উর্দু পড়ায় লেখার দরকার হইত না। মানে

লেখা কাজে লাগিত না। অথচ মাদ্রাসায় আরবী ফারসী লেখাও শিখান হইত।'[৭৮] আবুল মনসুর আহমদ বাংলা শিখেছিলেন পাঠশালায়। তিনি জানাচ্ছেন, "১৯০৬ সালে যখন আমি প্রথম পাঠশালায় ভর্তি হই, তখন আমার বয়স আট বছর। এই সময় পাঠশালায় 'গ'-মিতি, 'খ'-মিতি ও 'ক'-মিতি এই তিনটা শিশু শ্রেণী ও তারপর ১ম ও ২য় শ্রেণী এই পাঁচ বছরের কোর্স ছিল। ..'ক'-মিতিতে আমরা এক বছর পড়িলাম এবং এখানেই বাংলা সাহিত্য, অংক, শুভংকরী ও ওয়ার্ডবুক পড়িলাম। সাহিত্য মানে বুধোদয়, ও অংকের নামতা সরল যোগ বিয়োগ এবং শুভংকরী আর্যা এই সব পড়িতাম।"[৭৯] বোঝাই যাচ্ছে পাঠশালা ততদিনে সরকারি প্রাথমিক স্কুলে পরিণত হয়েছে। যাইহোক, মখতবে যে বাংলা লেখাপড়া শেখার তেমন চল ছিল না সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং বাঙালি মুসলমানরা যে পাঠশালাতেই সাধারণত বাংলা শিখতেন তাও নিশ্চিত। সৈয়দ আমীর হুসেন ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশনের বাংলা কমিটির কাছে তাঁর সাক্ষ্যে স্পষ্টই বলেছেন যে, নিম্নশ্রেণীর মুসলমানরা প্রায়ই পাঠশালায় পড়তে যান।[৮০]

অ্যাডাম রিপোর্ট ও মুসলমানের দেশজ শিক্ষা

আসলে মধ্যযুগে যাঁরা আরবী-ফারসী শিখতেন তারা সাধারণত উঁচুশ্রেণীর লোক। বিশেষ করে যাঁরা রাজসরকারের সঙ্গে কোনভাবে যুক্ত ছিলেন বা রাজসরকারে কাজের ইচ্ছে করতেন, তাঁরা হয়ত একাধিক ভাষা বিশেষ করে ফারসী শিখতেন। সাধারণ লোকের মধ্যে আরবী-ফারসী শেখার রেওয়াজ তেমন ছিল না। রামমোহন রায় বা দীনেশ সেনের ঠাকুর্দার মত উঁচুশ্রেণীর হিন্দুরাও ফারসী শিখতেন। এ সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন, "আজিকালি যেমন ইংরেজ সরকারে চাকুরী কিম্বা আদালতে ওকালতি করিয়া জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য লোকে ইংরেজী শিখিয়া থাকে সেকালে সেইরূপ যাহাদিগকে সচরাচর ভদ্রলোক বলে তাঁহারা যত্ন করিয়া ফার্সী শিখিতেন।" বিপিন পালের বাবা খুব ভালো ফারসী শিখেছিলেন তাই সমাজে তিনি মুন্সী বলেও পরিচিত হন। তিনি কিন্তু বাংলা ভাষায় বিশেষ চর্চা করেননি এবং ইংরেজি শেখেননি।[৮১] যাইহোক বেশির ভাগ মখতব বা পাঠশালায় আরবী-ফারসী শেখানো হত এরকম সিদ্ধান্ত করার মত সাক্ষ্যপ্রমাণ কিন্তু বড় একটা

দেখা যায় না। আরবী-ফারসী শেখার যেসব স্কুল বিশেষ করে মুঘল আমলে গড়ে উঠেছিল, তাদের মখতব বা পাঠশালার ধারায় ফেলা যায় না বলেই মনে হয়। অ্যাডাম তাঁর তৃতীয় রিপোর্টেও একথাই বলেছেন। তাঁর মতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, সমাজের উঁচুশ্রেণীর লোকের জন্যই এই আরবী-ফারসী স্কুলগুলি গড়ে উঠেছিল। এতে সাধারণ মানুষের পড়ার বড় একটা সুযোগ ছিল না। আর সাধারণ মানুষ আরবী-ফারসী শেখার গরজও বোধ করত না। এ সম্পর্কে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব। তার আগে মখতব শিক্ষা বিষয়ে অ্যাডাম রিপোর্টের সাক্ষ্য যাচাই করে দেখা দরকার।

অ্যাডাম 'দেশজ প্রাথমিক বিদ্যালয়' (Indigenous Elementary School) বলতে সেইসব স্কুলের কথাই বলেছেন যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয় এবং যা দেশীয় লোকেদের সাহায্যে গড়ে উঠেছে, যা কোন ধর্মীয় বা দাতব্য সংস্থার বদান্যতায় বা সাহায্যে গড়ে ওঠেনি। তিনি বাংলায় এরকম একলক্ষ স্কুল ছিল বলে অনুমান করেছিলেন। মখতবগুলি যদি মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে থাকে এবং মসজিদের ইমাম যদি মখতবের শিক্ষক হন, যিনি 'মাদাত-ই-মাস' বা লাখেরাজ জমির আয়ের উপর নির্ভরশীল, তাহলে অ্যাডামের সংজ্ঞা অনুযায়ী সেগুলি দেশজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর্যায়ে পড়ে না। অ্যাডাম তাঁর প্রথম রিপোর্টে এমনকি একথাও বলেছেন যে, "মুসলমানের নিজেদের কোন দেশজ প্রাথমিক স্কুল নেই, না আছে তাদের কোন গৃহশিক্ষক নিয়োগের সাধারণ রীতি।"[৮২] বোঝাই যাচ্ছে অ্যাডাম এখানে রীতিমত ভুল সিদ্ধান্ত করেছেন। অ্যাডাম নিজেই তাঁর দ্বিতীয় রিপোর্টে দেশজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালিকায় আরবী-ফারসী স্কুলকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অবশ্য দ্বিতীয় রিপোর্টের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেখানে প্রাথমিক স্কুল সম্পর্কে তিনি তাঁর প্রতিবেদন লিখছেন সেখানে 'দেশজ' (Indigenous) কথাটার উল্লেখ করেননি। অন্যান্য রিপোর্টেও তিনি বাংলা স্কুল, হিন্দি স্কুল, ওড়িয়া স্কুল, আরবী স্কুল, ফারসী স্কুল বা সংস্কৃত স্কুল বলেই উল্লেখ করেছেন। তবে তৃতীয় রিপোর্টে মাতৃভাষার বা দেশজ ভাষার স্কুল (vernacular) অধ্যায়ে তিনি বাংলা, হিন্দি আর ওড়িয়া ভাষার স্কুলের কথা বলেছেন। আরবী বা ফারসীকে দেশজ ভাষা হিসাবে ধরেননি এবং আরবী-ফারসী স্কুলগুলিকে আলাদাভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে, বাংলা স্কুল আর সংস্কৃত স্কুলের মধ্যে কোন সম্পর্কই নেই। দুটো সম্পূর্ণ আলাদা শিক্ষাধারা। শিক্ষার বিষয় আলাদা, শিক্ষার উদ্দেশ্য

আলাদা, এমনকি শিক্ষকরাও সমাজের ভিন্ন শ্রেণীর লোক। কিন্তু আরবী-ফারসী স্কুলের বেলায় কিন্তু সেকথা খাটে না।[৮৩] আরবী-ফারসী স্কুলগুলি শুধু সম্পর্কিতই নয় এগুলি অনেকটা একে অপরের পরিপূরক। একই স্কুলে আরবী-ফারসী পড়ানো হয়। অনেক সময় একই শিক্ষক তা পড়ান। আরবী শিক্ষকরা প্রায় সকলেই ফারসী জানেন যদিও সব ফারসী শিক্ষক আরবী পড়াতে পারেন না। একই ছাত্র আরবী-ফারসী দুইই শেখে। কখনো আগে আরবী পড়ে পরে ফারসী শেখে। সাধারণত উঁচুশ্রেণীর হিন্দু বা মুসলমান ছেলেরাই আরবী বা ফারসী স্কুলে পড়ে।[৮৪] অ্যাডাম ইসলামী উচ্চশিক্ষার আলোচনায় মাদ্রাসার উল্লেখ করেছেন কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার আলোচনায় মখতবের কোন উল্লেখ করেননি। অ্যাডাম রিপোর্টের এটা একটা বড় গলদ সন্দেহ নেই।

ইসলামী প্রাথমিক স্কুল মখতব

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে অনেকের ধারণা মাদ্রাসাগুলি ছিল আরবী স্কুল আর মখতবগুলি ছিল ফারসী স্কুল।[৮৫] এ ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। আমরা আমাদের আগের আলোচনায় দেখেছি ট্রিটন এবং বেয়ার্ড ডজ ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার মধ্যে যে অনেক ফারাক তা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। গুজরাটের মধ্যযুগের ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস-লেখক মনসুরউদ্দিন কুরেশীও স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, মখতবগুলি ছিল মসজিদ সংলগ্ন প্রাথমিক স্কুল যেখানে লেখা, পড়া আর কোরান আবৃত্তি শেখানো হত আর উচ্চশিক্ষার জন্য ছিল মাদ্রাসা। কুরেশীর বইটি মধ্যযুগের ইসলামী শিক্ষার আঞ্চলিক ইতিহাস হিসাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মখতবের শিক্ষার বিষয় সম্পর্কে তিনি জানাচ্ছেন যে কোরানই ছিল মখতব শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষক পড়ুয়াদের কোরান পড়া শেখাতেন যাতে তারা ধর্মীয় আচার ঠিকমতো পালন করতে পারে। মখতবে কোরান পড়া হত 'নাজিরা' পদ্ধতিতে। অর্থাৎ অক্ষর পরিচয়ের পর অর্থ না বুঝেই কোরান মুখস্থ করতে হত। সাধারণত দশ-বার বছর বয়সেই পড়ুয়ারা কোরান আবৃত্তি করতে শিখে 'হাফিজ' হত। অবশ্য অসাধারণ স্মৃতিশক্তি যাদের তারা অনেক আগেই এই ক্ষমতা হাসিল করত। কোরান মুখস্থ করার পর কিছু কিছু ফারসী বই যেমন সাদীর পন্দনামা, গুলিস্তান, বোস্তান পড়তে শিখত।[৮৬] তিনি

লেখা শেখার কথাও উল্লেখ করেছেন তবে অঙ্কের কথা কিছু বলেননি মখতব শিক্ষা প্রসঙ্গে।

দেখা যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে মধ্যযুগের ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষার যে বিবরণ ট্রিটন ও বেয়ার্ড ডজ দিয়েছেন তার সঙ্গে কুরেশীর বর্ণনা মিলে যাচ্ছে। মধ্যযুগের বাংলার মখতবের শিক্ষা সম্পর্কে এ পর্যন্ত যেটুকু জানা গেছে তাতে গুজরাট এবং বাংলার মখতব শিক্ষার মধ্যে হুবহু মিল না থাকলেও খুব একটা ফারাক ছিল বলে মনে হয় না। কুরেশী যে পাঠ্যসূচী দিয়েছেন বাংলার মখতবে তার চেয়ে বেশী কিছু পড়ানো হত এমন নজির নেই। বরঞ্চ, বাংলার মখতবের বেশির ভাগ শিক্ষকই যে আরবী-ফারসী ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন সেকথা বিশ্বাসযোগ্য। আজিজুর রহমান মল্লিক লিখেছেন, মখতবের শিক্ষকরা ছিলেন অর্ধশিক্ষিত এবং মখতবগুলিতে শুধুই না বুঝে কোরান মুখস্থ করানো হত। এ অভিযোগ আরো অনেকেই করেছেন। তবে কোন কোন মখতবে একাধিক ভাষা শেখানোর মতো শিক্ষক নিশ্চয়ই ছিলেন।

যাইহোক মধ্যযুগের বাংলায় মাদ্রাসা এবং মখতব যে ইসলামী উচ্চশিক্ষা আর প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল সেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। মাদ্রাসায় আরবী ও ফারসী দুইই পড়ানো হত। অ্যাডামও তাঁর দ্বিতীয় রিপোর্টে লিখছেন যে, "মাদ্রাসায় আরবী-ফারসী দুইই পড়ানো হয়। আগে আমি ভেবেছিলাম ফারসী স্কুল প্রাথমিক শিক্ষার একটি শাখা। কিন্তু যেহেতু ফারসী শিক্ষা প্রাথমিক স্তরেই শেষ হয় না বরঞ্চ আরবী শিক্ষার একটি প্রাথমিক স্তর হিসাবে কাজ করে তাই একে উচ্চশিক্ষার শাখা হিসাবেই গণ্য করতে হবে।"[৮৭] তৃতীয় রিপোর্টে তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, আরবী ও ফারসী স্কুল পরস্পরের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে এদের একই শ্রেণীর স্কুল হিসাবে ধরা হচ্ছে।"[৮৮] বোঝাই যাচ্ছে যে অ্যাডাম আরবী-ফারসী স্কুল আর মখতব-মাদ্রাসার সম্পর্ক নিয়ে বেশ গণ্ডগোলে পড়েছিলেন। তবে এগুলি যে বাংলা পাঠশালা আর সংস্কৃত টোলের মতো সম্পর্কহীন পুরোপুরি আলাদা শিক্ষাধারা ছিল না সেবিষয়ে বোধহয় সন্দেহ নেই। অ্যাডামের এই গণ্ডগোলের একটা বড় কারণ বোধহয় মুঘল আমলের ফারসী 'সেকুলার' স্কুলের অস্তিত্ব। এই স্কুলগুলি ঠিক মখতব বা মাদ্রাসা কোন ধরনের মধ্যে পড়ে না। বিশেষ কারণে বিশেষ পরিস্থিতিতে এই স্কুলগুলি গড়ে উঠেছিল। এদের সঙ্গে ধর্মীয় ইসলামী শিক্ষার কোন সম্পর্ক ছিল না। তবে অনেক সময় ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠা এই ফারসী স্কুলকেও

মখতব বলা হত। যেমন দীনেশ সেনের ঠাকুর্দার ফারসী মখতব। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার যে কোরান আরবী ভাষায় লেখা কাজেই কোরান-কেন্দ্রিক মখতবে যদি কোন ভাষা শেখানো হয় তবে তা ফারসী না হয়ে আরবী হতে বাধ্য। অবশ্য আরবী ও ফারসী এই দুই ভাষাই শেখানো হতে পারে। তবে সেরকম মখতব মধ্যযুগের বাংলায় খুব বেশি ছিল বলে মনে হয় না। সত্যিই যদি মসজিদ সংলগ্ন অসংখ্য মখতবে ফারসী শেখার বন্দোবস্ত থাকত তবে হয়ত মুঘল আমলের 'সেকুলার' ফারসী স্কুলের এই বাড়-বাড়ন্ত হত না। যাইহোক, এখন আমরা এবিষয়ে অ্যাডাম রিপোর্টের কথা আলোচনা করব।

বাংলার ফারসী স্কুল, মখতব ও অ্যাডাম রিপোর্ট

অ্যাডাম তাঁর দ্বিতীয় রিপোর্টে রাজসাহী জেলার নাটোরের প্রাথমিক স্কুলগুলিকে প্রথমে হিন্দু প্রাথমিক স্কুল ও মুসলমান প্রাথমিক স্কুল এই দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন।[৮৯] সেই অনুযায়ী তিনি জানান যে, ১১টি হিন্দু স্কুলে মোট ১৯২জন পড়ুয়া ছিল আর বাকি ১৬টি মুসলমান স্কুলে মোট ৭০ জন পড়ুয়া ছিল। পরে তিনি এই বিভাগকে ভুল মনে করেন এবং ভাষার ভিত্তিতে এগুলিকে চারভাগে ভাগ করেন। তাঁর মতে সঠিক বিভাগ এই রকম—

(ক)	বাংলা স্কুল	১০ টি	মোট পড়ুয়া	১৭৭
(খ)	আরবী স্কুল	১১ টি	মোট পড়ুয়া	৪২
(গ)	ফারসী স্কুল	৪ টি	মোট পড়ুয়া	২৩
(ঘ)	ফারসী-বাংলা স্কুল	১ টি	মোট পড়ুয়া	২৫
(ঙ)	ফারসী-আরবী-বাংলা স্কুল	১ টি	মোট পড়ুয়া	৫
	মোট স্কুল	২৭ টি	মোট পড়ুয়া	২৭২[৯০]

এই প্রতিবেদন থেকে আরো জানা যাচ্ছে যে বাংলা স্কুলগুলিতে বাংলা লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখানো হত। শুভঙ্করের অঙ্কের নিয়ম প্রায় সব স্কুলেই শেখানো হত আর সরস্বতী বন্দনা মুখস্থ করতে হত। বেশির ভাগ স্কুলেরই কোন নিজস্ব স্কুলঘর ছিল না। সাধারণত কোন চণ্ডীমণ্ডপে, কারো বৈঠকখানায়, কখনো বা খোলা মাঠে স্কুল বসত। শিক্ষকরা সকলেই হিন্দু। ৭ জন কায়স্থ, ২ জন কৈবর্ত্ত ও ১ জন নাপিত। একটিমাত্র স্কুলের নিজস্ব স্কুলঘর ছিল। শিক্ষকদের ছাত্র বেতন বা সিধার উপর নির্ভর করতে হত। মাসে মোট আয়

হত ৫ থেকে ৭ টাকা। বইয়ের ব্যবহার বা বই পড়ানোর রেওয়াজ বড় একটা ছিল না। ৫ থেকে ১৩ বছর বয়সে পড়া শুরু হত। সাধারণত বছর পাঁচেক, কখনো কখনো ৭ বছর পর্যন্ত পড়া চলত।[৯১]

আরবী স্কুলের কথা দেখা যায় একটু আলাদা ধরনের। বেশির ভাগ আরবী স্কুলেরই নিজস্ব ঘর ছিল। শিক্ষকের বাড়িতে বসত ৫টি স্কুল আর বাকিগুলি হয় মসজিদের ঘরে বা নিজস্ব বাড়িতে বসত। শিক্ষকরা সকলেই মুসলমান আর পেশায় মোল্লা। আরবী স্কুলগুলিতে কোরানের কিছু অংশ মুখস্থ করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু শেখানো হত না। লেখা বা অঙ্কের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। শিক্ষকরাও ছিলেন প্রায় নিরক্ষর। বেশির ভাগই নিজের নামও সই করতে জানতেন না। আসলে এগুলি ছিল পুরোপুরি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দেখা যায় পড়ুয়ারা বেশ বেশি বয়সেই পড়তে আসে এবং এক থেকে পাঁচ বছর ধরে কোরান পড়ে। সাধারণত ৭ থেকে ১৪ বছর বয়সে পড়া শুরু করতে দেখা যায়। বাংলার মসজিদ সংলগ্ন মখতবগুলি যে মূলত কোরান শেখার স্কুল ছিল তা বেশ বোঝা যায়। হয়ত অনেক মখতবে শুধুই কোরান মুখস্থ করা হত আর নামাজ পড়া শেখানো হত। নাটোরের এই ১১টি আরবী স্কুল যে আসলে এই ধরনের মখতব ছিল তাতে সন্দেহ নেই।[৯২] এগুলির সঙ্গে বাংলা পাঠশালার মিলের চেয়ে অমিলই বেশি।

ফারসী স্কুলগুলি কিন্তু বাংলা স্কুলের মতোই 'সেকুলার' স্কুল ছিল। তবে অঙ্ক শেখার রেওয়াজ বড় একটা ছিল না। জোর ছিল ভাষা ও সাহিত্যের উপর। আহমদনামা, পন্দনামা, গুলিস্তান, বোস্তান, ইউসুফ-জুলেখা পড়া হত আর অল্প ব্যাকরণ শেখা হত। ফারসীতে চিঠিপত্র লেখা শেখার কথাও পাওয়া যায়। বাংলা স্কুলে বই বা পুঁথি পড়ার উল্লেখ না পাওয়া গেলেও ফারসী স্কুলে হাতে লেখা পুঁথির ব্যবহার ছিল বলেই জানা যায়। দুটি স্কুলের নিজস্ব বাড়ি ছিল আর দুটি বসত কোন পড়ুয়ার বাড়িতে। চারজন শিক্ষকই ছিলেন মুসলমান। সাধারণত সাড়ে চার বা পাঁচ বছর বয়সে পড়া শুরু হত। অবশ্য বেশ বেশি বয়সে পড়াশুরুর উদাহরণও আছে। একটি স্কুলের দু'জন পড়ুয়া দেখা যায় বাংলা শিখে ও কোরান মুখস্থ করে ১৩ বছর বয়সে ফারসী পড়া শুরু করেছে।[৯৩] অ্যাডাম এই স্কুলটিকেও কেন প্রাথমিক স্কুলের তালিকাভুক্ত করেছেন তা বোঝা গেল না। ইসলামী আইনকানুন শেখানো হয় না বলে এটিকে হয়ত ঠিক মাদ্রাসার পর্যায়ে ফেলা যায় না। মুঘল আমলে এধরনের 'সেকুলার' ফারসী

স্কুলের বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজ আইনকানুন চালু হলে এবং ফারসীর বদলে ইংরেজি রাজভাষা হওয়ায় এই ফারসী স্কুলগুলির অস্তিত্ব লোপ পায়।

বাকি দুটি স্কুলের মধ্যে 'ফারসী-বাংলা' স্কুলটির শিক্ষক একজন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। এখানে বাংলা লেখা, পড়া ও অঙ্ক শেখানো হত আর ফারসী পন্দনামা ও গুলিস্তান পড়ানো হত।[১৪] প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে এধরনের স্কুলের কথা আরো জানা যায়। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের লেখক দীনেশ সেনের ঠাকুর্দা রঘুনাথও এধরনের একটি 'মখতব' চালাতেন।[১৫] এগুলিকে ঠিক মখতব বলা যায় কিনা সন্দেহ আছে। ব্রিটিশ আমলে স্বাভাবিকভাবেই এই 'ফারসী-বাংলা' স্কুলের জায়গা নেয় 'অ্যাংলো ভার্নাকুলার' স্কুল।

নাটোরের 'আরবী-ফারসী-বাংলা' স্কুলটির শিক্ষক একজন মুসলমান। এতে আরবীতে কোরান পড়ানো হত, ফারসীতে পন্দনামা, গুলিস্তান, বোস্তান আর বাংলায় লেখা ও কিছু অঙ্ক শেখানো হত।[১৬] এধরনের স্কুলের সংখ্যা ছিল খুবই কম। বাংলার মখতবগুলির পাঠ্যসূচীও এরকম ছিল এ সিদ্ধান্ত করার মত সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। এই স্কুলটির ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচ জন অথচ 'ফারসী-বাংলা' স্কুলটির পড়ুয়ার সংখ্যা পঁচিশ। মাতৃভাষা বাংলা আর রাজভাষা ফারসী শেখার তাগিদ যত ছিল ধর্মের ভাষা আরবীর প্রতি তত টান ছিল না বলেই মনে হয়। আসলে ভাষা হিসাবে আরবী শেখার তাগিদ খুব একটা ছিল না। আরবীভাষায় কোরান না বুঝেই মুখস্থ করা হত মাত্র। অ্যাডামের অন্যান্য জেলার রিপোর্টেও দেখা যায় আরবীর চাইতে ফারসী শেখার প্রতি লোকের আগ্রহ বেশি ছিল।

গরজ বড় বালাই সন্দেহ নেই। নাটোরের ২৭ টি স্কুলের এই বিবরণ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে বেশির ভাগ পড়ুয়াই বাংলা পড়ত। তারপরেই ফারসী। ৪টি ফারসী স্কুল আর একটি ফারসী-বাংলা স্কুলের মোট পড়ুয়ার সংখ্যা ৪৮ অথচ ১১টি আরবী স্কুলের মোট পড়ুয়ার সংখ্যা মাত্র ৪২। আর ১০টি বাংলা স্কুলের মোট পড়ুয়া ১৭৭ জন।

অ্যাডাম তাঁর তৃতীয় রিপোর্টে তিন ধরনের স্কুলের কথা বলেছেন—'ভার্নাকুলার' 'সংস্কৃত' আর 'আরবী-ফারসী'। 'ভার্নাকুলার' স্কুলের আলোচনায় তিনি বাংলা, হিন্দি আর ওড়িয়া স্কুলের কথা বলেছেন। এগুলিকেই তিনি দেশজ প্রাথমিক

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলেছেন। সংস্কৃত স্কুলকে তিনি দেশজ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করেছেন। আরবী-ফারসী স্কুলগুলিকে তিনি একটি আলাদা ধারার স্কুল হিসাবে ধরেছেন। অ্যাডামের দ্বিতীয় রিপোর্টে বিভিন্ন ভাষার স্কুলের যে বিবরণ আমরা দেখেছি তা তৃতীয় রিপোর্টের বেলাও খাটে। তবে বাংলা স্কুলে মুসলমান শিক্ষক আর ফারসী স্কুলে হিন্দু শিক্ষকের কথাও তৃতীয় রিপোর্টে আছে। অ্যাডামের বর্ধমান রিপোর্টে দেখা যায় ঐ জেলার মোট ৬২৯টি বাংলা স্কুলের ৬৩৯ জন শিক্ষকের মধ্যে ৯ জন মুসলমান। আর ১৩১৯০ জন পড়ুয়ার ৭৬৯ জন মুসলমান।[৯৭] অ্যাডামের তৃতীয় রিপোর্টে দেখা যায় মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, দক্ষিণ বিহার আর তিরহুতের আরবী-ফারসী স্কুলগুলির মোট ৭২৯ জন শিক্ষকের মধ্যে ১৪ জন হিন্দু আর বাকিরা মুসলমান।[৯৮] কিন্তু এইসব স্কুলের মোট ৩৬৫৪ জন পড়ুয়ার ২০৯৬ জন হিন্দু, বাকিরা মুসলমান।[৯৯] আরবী-ফারসী স্কুলের মোট পড়ুয়ার বেশির ভাগই হিন্দু এটা কিন্তু বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আরো দেখা যায় যে ফারসী স্কুলের তুলনায় আরবী স্কুলের সংখ্যা নিতান্তই কম। মুর্শিদাবাদে মোট ১৯টি আরবী-ফারসী স্কুলের মধ্যে ১৭টি ফারসী স্কুল আর মাত্র ২টি আরবী স্কুল। মোট পড়ুয়ার ১০২ জন ফারসী পড়ুয়া আর মাত্র ৭ জন আরবী পড়ুয়া। শুধু কি তাই, ফারসী পড়ুয়াদের ৬১ জন হিন্দু যাদের ২৭ জন ব্রাহ্মণ আর ১৫ জন কায়স্থ। মুসলমান পড়ুয়ার সংখ্যা মাত্র ৪১ জন।[১০০] বীরভূমের ৭৩টি আরবী-ফারসী স্কুলের ৭১টি ফারসী আর মাত্র ২টি আরবী স্কুল। মোট ৭৩ জন শিক্ষকের ৫জন হিন্দু বাকিরা মুসলমান। মোট ৪৯০ জন পড়ুয়ার ৪৮৫ জন ফারসী ছাত্র আর মাত্র ৫ জন আরবী পড়ে। আরবী পড়ুয়ারা সবাই মুসলমান।[১০১] বর্ধমানে ৩টি স্কুলে শুধুই কোরান পড়ানো হয় যেমন দেখা গেছে অ্যাডামের দ্বিতীয় রিপোর্টে। এছাড়া আছে ৯৩টি ফারসী স্কুল আর ৮টি আরবী স্কুল। এই আটটি আরবী স্কুল আসলে মাদ্রাসা বা ইসলামী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যাই হোক, বর্ধমানের ১০৪টি স্কুলের মোট ৯৭১ জন পড়ুয়ার ১৭ জন শুধু কোরান পড়ে, ৫৫ জন আরবী স্কুলে পড়ে আর ৮৯৯ জন ফারসী স্কুলে পড়ে। এই ৮৯৯ জন ফারসী পড়ুয়ার ৪৫১ জন মুসলমান আর ৪৪৮ জন হিন্দু যাদের মধ্যে ১৭২ জন কায়স্থ আর ১৫৩ জন ব্রাহ্মণ। ৩টি কোরান স্কুলের ১৭ জন পড়ুয়াই মুসলমান। ৮টি আরবী স্কুলের ৫১ জন পড়ুয়ার ৪ জন হিন্দু আর বাকীরা মুসলমান। ফারসী স্কুলে হিন্দুপড়ুয়ার এই প্রাধান্য কিন্তু বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।[১০২] ফারসী স্কুলগুলি যে

একান্তই 'সেকুলার' স্কুল ছিল তা বেশ বোঝা যায়। বর্দ্ধমানের ৯৩টি ফারসী স্কুলের ৯৩ জন শিক্ষকের ৭ জন হিন্দু যাদের মধ্যে ২ জন ব্রাহ্মণ।

বাংলার এই ফারসী স্কুলগুলিকে মথতব বা মাদ্রাসার পর্যায়ে ফেলা যায় না। রাজভাষা ফারসী শেখার গরজেই এই ফারসী স্কুলগুলি গড়ে উঠেছিল। আর এই গরজ হিন্দু-মুসলমান সকলেরই ছিল। এগুলিকে বরঞ্চ ইংরেজ আমলের মাধ্যমিক স্কুলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সমাজের উচ্চশ্রেণীর প্রয়োজনের তাগিদে এগুলি গড়ে উঠেছিল। এই ফারসী স্কুলের পড়ুয়া ও পৃষ্ঠপোষক সাধারণত হিন্দু মুসলমান উঁচুশ্রেণীর লোক। বাংলায় ফারসী শেখার চল প্রাক্-মুঘল যুগে শুরু হলেও মুঘল আমলেই ফারসী চর্চার রমরমা দেখা যায়। আকবরের আরবী বিদ্বেষ আর রাজা তোডরমলের ভূমিরাজস্ব সংস্কারই যে ফারসী ভাষা চর্চা ও শিক্ষার বাড়বাড়ন্তের কারণ সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। এরকম শোনা যায় যে সম্রাট আকবর যা কিছু আরবী তাই ঘৃণা করতেন।[১০৩] আকবর সম্ভবত নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজ্যে কবি, দরবেশ, পণ্ডিতদের খুব খাতির ছিল। আকবর মোল্লাতন্ত্র এবং ইসলামের গোঁড়া সমর্থকদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। 'আইনি আকবরী'তে আবুল ফজল লিখছেন যে, আরবী এবং কোরানের চর্চা ভালো চোখে দেখা হত না। আকবরের আমলেই রামায়ণ, মহাভারত, অঙ্কের বই 'লীলাবতী' ফারসী ভাষায় অনুবাদ করা হয়।[১০৪] আকবরের বিভিন্ন ধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টা অবশ্য গোঁড়া মুসলমানরা ভালো চোখে দেখত না। আকবরের সময়ই সুফীমতের প্রাবল্য দেখা যায়। আবুল ফজল আরো জানাচ্ছেন যে, আগে রাজস্বের হিসাব-কেতাব হিন্দু মুহুরিরা হিন্দি ভাষায় লিখতেন। তোডরমল নিয়ম করেন যে এইসব হিসাব ফারসী ভাষায় রাখা হবে। এইভাবে তিনি হিন্দুদের ফারসী শিখতে বাধ্য করেন।[১০৫] বাংলায় তোডরমলের এই নিয়ম বহাল না হলেও উচ্চাকাঙ্ক্ষী হিন্দু-মুসলমানেরা রাজসরকারে উচ্চপদের আশায় ফারসী শিখতে শুরু করে।[১০৬] বাংলায় জমিদারী সেরেস্তায় রাজস্ব ও খাজনার হিসাব বাংলা ভাষাতেই রাখা হত।[১০৭] কাজেই বাংলা ভাষা ও বাংলায় হিসাব রাখা শেখার রেওয়াজ চালু ছিল। বাংলা পাঠশালায় জমিদারি হিসাব শেখানো হত। আবার উচ্চাকাঙ্ক্ষী হিন্দু-মুসলমানের গরজে ফারসী শেখার রেওয়াজও চালু হয়। মুর্শিদকুলী খাঁর আগে পর্যন্ত উত্তর ভারতের ফারসী জানা হিন্দু-মুসলমান কর্মচারীদেরই প্রাধান্য ছিল বাংলার রাজসরকারে। মুর্শিদকুলি খাঁর আমলেই রাজসরকারের উচ্চপদগুলি বাংলার ফারসী জানা হিন্দুদের হাতে

আসে।[১০৮] সঙ্গে সঙ্গে ফারসী শেখার রেওয়াজও বাড়তে থাকে। এই আমলের কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'রায় মঙ্গলে' এই ফারসী চর্চার লক্ষণীয় উল্লেখ দেখা যায়। কৃষ্ণরাম লিখছেন—

বালকে ফারসী পড়ে আখোন হুজুরে॥
সোনার কলম কানে দোয়াতি সম্মুখে।
কিতাবৎ নিপুণ কায়স্থগণ লিখে॥[১০৯]

কৃষ্ণরাম দাস ও ভারতচন্দ্রের কাব্যে ফারসী ভাষার প্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এঁরা দুজনই ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ফলে এই দুই ভাষার শব্দ ও বাক্যাংশের বহুল ব্যবহার দেখা যায় এঁদের রচনায়। কালে বিশেষ করে আঠার শতক নাগাদ ফারসী আদবকায়দা ও শিক্ষা বাংলার হিন্দু রাজা জমিদারের জীবন যাপন ও সেরেস্তা-কাছারির কাজকর্মকেও প্রভাবিত করে। বাংলার মুঘল সুবেদারদের দরবারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যও বাংলার জমিদারদের ফারসী ভাষা ও আদবকায়দা শেখা জরুরি হয়ে ওঠে। বাংলায় ফারসী স্কুলের বাড়বাড়ন্ত ও হিন্দু পড়ুয়ার প্রাধান্যের এটাই কারণ। এদিক দিয়ে ফারসী শিক্ষা ছিল একান্তই ব্যবহারিক শিক্ষা। যেমন ব্রিটিশ আমলে ইংরেজি শিক্ষা হয়ে উঠেছিল বাঙালি ভদ্রলোকের একমাত্র ব্যবহারিক শিক্ষা।

যাইহোক, এই ফারসী স্কুলগুলিকে যেমন ঠিক মখতব বলা যায় না তেমনি এগুলির সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষারও কোন সম্পর্ক নেই। মখতব ও মাদ্রাসা সেই অর্থে সেকুলার শিক্ষা নয়। আদি অর্থে মখতব লেখা শেখার স্কুল হলেও ইসলাম ধর্মের আওতায় এগুলি প্রায় কোরান মুখস্থ করার স্কুলে পরিণত হয়েছিল। আর ফারসী স্কুল না ছিল শুধু লেখা শেখার স্কুল, না তাতে কোরান মুখস্থ করা হত। অন্যদিকে মাদ্রাসাগুলি ছিল ইসলামী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আবার বাংলা পাঠশালার মত এতে অঙ্ক শেখার রেওয়াজ দেখা যায় না। আঠার শতকের ফারসী স্কুলগুলি যে আকবরের ধর্মনীতি আর তোডরমলের রাজস্বনীতির ফলশ্রুতি তাতে সন্দেহ নেই। ঔরংজেবের আমলে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার ঘটলেও বাংলায় ফারসী শিক্ষার গতি থেমে যায়নি।

মীমাংসা :

মখতব, বাংলা পাঠশালা ও ফারসী স্কুল

উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি আরবী-ফারসী 'সেকুলার' স্কুলগুলিকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মখতব বা মাদ্রাসার পর্যায়ে ফেলা যায় না। আবার মখতব ও পাঠশালা দেশজ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলেও এ দুয়ের মধ্যে অনেক তফাত। পাঠশালায় বাংলা লেখা, পড়া আর অঙ্কের প্রাধান্য আর মখতবে কোরান মুখস্থ করা আর নামাজ-অজু শেখার প্রাধান্য। পাঠশালা শিক্ষা পুরোপুরি ব্যবহারিক আর মখতব মূলত ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মখতব শিক্ষা প্রধানত মসজিদের আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে; ধর্মান্তরিত মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষা দেওয়ার জন্য। মখতবের শিক্ষক ও পড়ুয়ারা প্রায় সকলেই মুসলমান। অমুসলমান পড়ুয়ার সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। পাঠশালার পড়ুয়ারা প্রধানত হিন্দু হলেও মুসলমান পড়ুয়ার সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। পাঠশালা শিক্ষার প্রভাবে এবং দূর গ্রামের বাঙালি মুসলমানের তাগিদে হয়ত কিছু কিছু মখতবে কোরান মুখস্থ করার সঙ্গে অল্প বাংলা লেখা, পড়ার রেওয়াজও চালু হয়। তবে সেরকম মখতবের সংখ্যা কত ছিল তা জানার কোন উপায় নেই। এ প্রসঙ্গে অনুমান করা যায় যে বাংলা পাঠশালার ক্রমবিকাশে ফারসী সেকুলার শিক্ষার কিছু প্রভাব পড়ে থাকবে। আসলে বাংলা পাঠশালা শিক্ষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষা ও ফারসী শিক্ষার কোন প্রভাব ছিল কিনা, আবার বাংলার মখতব শিক্ষাকে পাঠশালা শিক্ষা কতটা প্রভাবিত করেছিল এটা একটা স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয় হতে পারে। মধ্যযুগে, মধ্যপ্রাচ্যে ও ভারতে, যে দেশজ প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠতে দেখা যায়, তাদের মধ্যে কিছু মিলও লক্ষ করা যায়। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই মুসলমান অধিকারের পরই বাংলা পাঠশালা শিক্ষা একটা প্রথাবদ্ধ রূপ নেয়। একই সময় বাংলায় মখতব শিক্ষাও প্রসারলাভ করতে থাকে। এই সময়ই বলতে গেলে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও বাঙালি সংস্কৃতি একটি নির্দিষ্ট রূপ পেতে থাকে। এক কথায় বাঙালি তার নিজের পরিচয় খুঁজে পায়। বাঙালির এই পরিচয় গড়ে ওঠে প্রধানত বাংলার হিন্দু-মুসলমান নীচুশ্রেণীর প্রাণের সুরে। উঁচুশ্রেণীর লোকেরা কিন্তু তখন আরবী, ফারসী আর সংস্কৃতের

সুউচ্চ মিনারে বসে আখের গোছাতে ব্যস্ত। বিপিনচন্দ্র পালের ভাষায় "যাঁহাদের রাজসরকারে চাকুরী করিবার লোভ ছিল তাঁহারা ফার্সী শিখিতেন" আর "ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত পড়িতেন"।

যাইহোক, হিন্দুদের হাতেখড়ি সংস্কারের মতোই মুসলমান শিশুদের বিসমিল্লা সংস্কার বা মখতব সংস্কারের রেওয়াজ ছিল। কানুন-ই-ইসলামে চারবছর চার মাস চারদিন বয়সে এই সংস্কার হবে এরকম বলা আছে।[১১০] বিভিন্ন মুসলমান ঐতিহাসিকের বিবরণেও এই সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুলতান বাদশার ছেলেদের বাল্যশিক্ষার যে বর্ণনা এইসব ইতিহাসে পাওয়া যায় তাতে এই সংস্কারের বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। ধরে নেওয়া যায়, সাধারণ মুসলমান পরিবারের শিশুদের মধ্যেও এই সংস্কারের রেওয়াজ ছিল। তবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মখতবের উল্লেখ পেলেও বিসমিল্লা সংস্কারের উল্লেখ বড় একটা পাওয়া যায় না। যদিও হাতেখড়ির যথেষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। ধর্মান্তরিত বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে সম্ভবত তখনো ইসলামী সংস্কারগুলি তেমন দানা বাঁধেনি। ধর্মান্তরিত মুসলমানদের ইসলামী সংস্কার রপ্ত করানোয় মখতব এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল।

বিসমিল্লা সংস্কারও হাতেখড়ির মতোই ভগবানের বা আল্লার নাম লিখে শুরু হত। বিসমিল্লা সংস্কারের পর মুসলমান শিশুকে কোরান মুখস্থ করতে হত। আর নমাজ-অজু শিখতে হত। হুমায়ুন, সেলিম, দারাশিকো ও ঔরংজেবের বাল্যশিক্ষায় দেখা যায় তাঁরা লেখাও শিখতেন সেইসঙ্গে। বিসমিল্লা সংস্কারকে 'শাজাহাননামা'য় 'মখতব' সংস্কার বলা হয়েছে।[১১১] আমরা জানি 'মখতব' কথার অর্থ লেখা শেখার স্কুল। বোঝাই যাচ্ছে বিসমিল্লা সংস্কার লেখা শুরুর সংস্কার। আবুল ফজল জানাচ্ছেন যে চারবছর, চারমাস, চারদিন বয়সে সেলিমের বিসমিল্লা সংস্কার হয়। আর বিসমিল্লা সংস্কারের পর সেলিম অক্ষর লেখা (হারুফ-ই-আবজাদ) শুরু করেন।[১১২] ঔরংজেবের ছেলেদের মধ্যে মুহম্মদ সুলতান, বাবার মতোই কোরান মুখস্থ করে এবং আরবী-ফারসী ও তুর্কী ভাষা শেখে। দ্বিতীয় ছেলে মুয়াজ্জাম ও পঞ্চম ছেলে আকবরও কোরান পড়ে ও বিভিন্ন ভাষা শেখে বলে জানা যায়। ঔরংজেবের মেয়ে জেবুন্নেসা বেগমও কোরান মুখস্থ করে এবং আরবী-ফারসী ভাষা শিখে গদ্য-পদ্য পড়েন বলে জানা যায়।[১১৩] রাজা-রাজড়াদের বাল্যশিক্ষার এই বিবরণ থেকে সাধারণের বাল্যশিক্ষা সম্পর্কে কোন সহজ সিদ্ধান্ত না করাই ভালো।

বাঙালি মুসলমানরাও এইসব ভাষা শিখতেন মখতবে এরকম নজির খুব একটা পাওয়া যায় না। উঁচুশ্রেণীর মধ্যে ফারসী শেখার রেওয়াজ থাকলেও সাধারণ নীচুশ্রেণীর মুসলমানরাও এইসব ভাষা শিখতেন একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। অ্যাডাম রিপোর্টে স্পষ্ট করেই বলা আছে আরবী-ফারসী স্কুলের পড়ুয়ারা বড় ঘরের ছেলে। তাছাড়া বাংলার মখতবগুলির শিক্ষকরা যে অনেকেই লিখতে-পড়তে জানতেন না তা বোধহয় ঠিক। মখতবে 'নাজিরা' পদ্ধতিতে কোরান মুখস্থ করা হত। এই পদ্ধতিতে অক্ষর পরিচয় হত চোখে দেখে ও কানে শুনে। অক্ষর লেখার প্রয়োজন হত না। অক্ষরের নাম ও আকারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে পড়ুয়ারা কোরানের ত্রিশতম প্যারা পড়ত। নাজিরা পদ্ধতিতে সঠিক উচ্চারণ ও বানানের প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হত।[১১৪] বাংলার মখতব শিক্ষকরা এবিষয়ে কতটা পারদর্শী ছিলেন সেবিষয়ে অবশ্য সন্দেহ আছে। এ পদ্ধতিতে কোরানের অর্থ বোঝার দরকার হত না। না বুঝে কোরান মুখস্থ করা আর নমাজ-অজু শেখাই যেখানে শিক্ষার মুল বিষয় সেখানে শিক্ষকদের সাক্ষর না হলেও চলত। বাংলার মখতব শিক্ষকদের মধ্যে যারা লিখতে-পড়তে জানতেন তাঁদের অনেকেই যে বাংলা লিখতে-পড়তে জানতেন সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। আরবী-ফারসী জানা মখতব শিক্ষক খুব বেশি ছিলেন বলে মনে হয় না। গ্রামবাংলায় বেশ কিছু আরবী-ফারসী শব্দের প্রচলন থাকলেও আরবী-ফারসী শেখার আয়োজন তেমন ছিল না। রাজস্ব ও কৃষি সম্পর্কিত এই শব্দগুলি মুখে মুখেই প্রচলিত হয়েছিল। যেমন পরে ইংরেজি শব্দ প্রচলিত হয়েছিল। মধ্যযুগে বহু আরবী-ফারসী শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল সন্দেহ নেই।

এ প্রসঙ্গে আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী'তে প্রাথমিক শিক্ষার যে সূচি ও পদ্ধতির কথা লিখেছেন সে সম্পর্কেও দু'এক কথা বলে নেওয়া দরকার। আবুল ফজলের শিক্ষাসূচির সঙ্গে কিন্তু ইসলামী কোরানভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই। আবুল ফজল কোরান মুখস্থ করা বা নামাজ-অজু শেখাকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় ধরেননি। মনে রাখতে হবে, আকবর ও আবুল ফজল কোরানভিত্তিক আরবী শিক্ষাকে খুব একটা ভালো চোখে দেখতেন না। আকবরের এই নীতি অনেক গোঁড়া মুসলমানেরই অপছন্দ ছিল। আকবরের আমলেই ফারসী ভাষা শিক্ষার রমরমা হয়। মধ্যযুগের মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে দেখা যায় বিজয়ী আরবদের ভাষা ও সংস্কৃতি প্রভূতভাবে বিজিত

পারস্যবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ভারতের সঙ্গে ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয়ও ঘটে ফারসীর মাধ্যমে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রথম যে আরবীয় কর্মচারী, ব্যবসায়ী বা যোদ্ধারা আসেন তাঁরা আসেন পারস্যের মধ্যে দিয়ে, পারস্যবাসীর ভাষা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে।[১১৫] বাংলায় সুফী মতবাদই মুসলমান অধিকার আর ইসলামী সংস্কৃতির পথ প্রস্তুত করেছিল। ইসলামী গোঁড়ামি ও একেশ্বরবাদের বিরোধেই নবম শতকে পারস্য দেশে এই মতবাদের উদ্ভব হয়।[১১৬] বাংলার জনগণ, বাংলার লৌকিকধর্ম ও বাংলা ভাষার উপর এই সুফী প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল সন্দেহ নেই। আরবী ভারতীয় মুসলমানদের কাছে ধর্মীয় ভাষার স্বীকৃতি পেলেও কখনো রাজভাষা হয়ে উঠতে পারেনি। মুঘল আমলে ফারসী ভাষা ও শিক্ষার বিস্তার হয়ত অনেক দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিল।

যাইহোক, আবুল ফজল আইনের পঁচিশ ধারায় শিক্ষার নিয়ম সম্পর্কে জানাচ্ছেন যে, হিন্দুস্থানে ছেলেদের বহুবছর কেটে যায় ব্যঞ্জন আর স্বরবর্ণ শিখে একগাদা বই পড়তে বাধ্য হয়ে।[১১৭] তিনি লিখেছেন, মহামান্য সম্রাটের নিয়ম হচ্ছে—ছেলেরা প্রথম দুই দিনে অক্ষর লিখতে শিখবে, তাদের আকৃতির সঙ্গে পরিচিত হবে আর তাদের নাম জানবে। তারপর সপ্তাহখানেক যুক্তাক্ষর শিখবে। পরে কিছু গদ্য-পদ্য পড়বে আর ঈশ্বর মহিমার কিছু পদ্য বা নীতিবাক্য মুখস্থ করবে। তারা যাতে নিজেরাই এগুলির অর্থ বুঝতে পারে সেদিকে যত্ন নিতে হবে। শিক্ষক অবশ্য তাকে কিছু সাহায্য করবে। কিছুকাল সে রোজ পদ্য বা পদ্যাংশ লেখা অভ্যাস করে হাত পাকাবে। শিক্ষক পাঁচটি বিষয়ে অবশ্যই নজর রাখবে। এগুলি হচ্ছে, অক্ষর পরিচয়, শব্দের অর্থ, পদ্যাংশের অর্থ, পদ্য ও পুরনো পড়া ঝালানো। এই পদ্ধতিতে আগে যা শিখতে বছরের পর বছর কেটে যেত তা শিশুরা অচিরেই শিখবে। প্রত্যেক পড়ুয়ার উচিত ক্রমে ক্রমে নীতিপাঠ, অঙ্ক, নামতা, কৃষিপাঠ, ওজন, পরিমাণ, পরিমাপ, দিনক্ষণ, ঘরগেরস্তি বিষয়, রাষ্ট্রনীতি, চিকিৎসা, তর্কশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র (তরিকি), গণিতশাস্ত্র (রিয়াজি), প্রকৃতিবিজ্ঞান (ইলাহি) ও ইতিহাস পড়া। সংস্কৃত পড়ুয়ারা অবশ্যই ব্যাকরণ, ন্যায়, বেদান্ত ও পাতঞ্জলি পড়বে।[১১৮]

আবুল ফজল এখানে প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার পুরো ধারার কথা বলেছেন। প্রাথমিক স্তরে অক্ষর পরিচয়, যুক্তাক্ষর ও গদ্য-পদ্য লিখতে-পড়তে শেখার কথা বলা হয়েছে। আর বলা হয়েছে অঙ্ক, নামতা, ওজন, পরিমাপ প্রভৃতি ব্যবহারিক

শিক্ষার কথা। বাংলা পাঠশালা শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে সেখানে আবুল ফজল কথিত প্রাথমিক শিক্ষানীতিই অনুসরণ করা হত। ফারসী স্কুলেও হয়ত অক্ষর পরিচয়, যুক্তাক্ষর ও গদ্য-পদ্য লিখতে-পড়তে শেখানো হত। তবে অঙ্ক বা ব্যবহারিক শিক্ষার যে সূচি 'আইন-ই-আকবরী'তে দেওয়া আছে তা খুব একটা মানা হত না। বাংলার মখতবগুলিতে কিন্তু আবুল ফজল কথিত শিক্ষাসূচি বা শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করা হত না। মখতব শিক্ষার মূল বিষয় কোরান মুখস্থ করা। নাজিরা পদ্ধতিতে না বুঝেই কোরান মুখস্থ করা হত। কাজেই লেখা শেখার উপর জোর না দিলেও চলত। মখতবের পড়ুয়ারা সুর করে কোরানের কিছু অংশ মুখস্থ করত। পাঠশালায়ও সরস্বতী বন্দনা বলতে হত। তবে পাঠশালা পড়ুয়ারা বাংলা সরস্বতী বন্দনা পড়তেও শিখত কিন্তু মখতবের পড়ুয়ারা শুধুই মুখস্থ করত। কোরান লিখতে বা পড়তে শিখত না। আর তা সম্ভবও ছিল না। মখতবের পড়ুয়াদের এবং শিক্ষকদের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। ফলে ঐ বয়সের পড়ুয়াদের পক্ষে বিদেশী ভাষা আরবী লিখতে-পড়তে শিখে কোরান পড়া খুবই কঠিন হত। আর নাজিরা পদ্ধতিতে তার দরকারও হত না। দূর এলাকার বিশেষ করে গ্রামের মখতবের বাঙালি শিক্ষকদের বেশির ভাগ নিজেরাও আরবী লিখতে-পডতে জানতেন না। অল্প কিছু মখতবে হয়ত আরবী-ফারসী বা বাংলা পড়ানো হত। এইসব মখতবের পড়ুয়াদের অবস্থা হত খুবই কাহিল। ধর্মের ভাষা আরবী, রাজভাষা ফারসী আর মাতৃভাষা বাংলার টানাপোড়েন যে মখতব শিক্ষার পথে এক বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। মখতব আর পাঠশালার মধ্যে একটা বড় তফাত এই যে পাঠশালার সঙ্গে মন্দিরের বা পাঠশালা গুরুমশাইয়ের সঙ্গে মন্দিরের পূজারীর কোন বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। যেমনটি দেখা যায় মখতব ও মসজিদের মধ্যে। আর মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা শেখার কোন সমস্যায়ও ভুগতে হয়নি পাঠশালা শিক্ষাকে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে মখতবগুলি সাধারণভাবে মসজিদের চারদেয়ালের ভেতর বসত। মসজিদ সংলগ্ন হওয়ায় তাদের একটা নির্দিষ্ট জায়গা ছিল। খুব কম গ্রামেই কিন্তু পাঠশালার জন্য কোন নির্দিষ্ট দালান বা স্কুলবাড়ি ছিল। পাঠশালা বসত কোথাও বারোয়ারীতলায়, কখনো চণ্ডীমণ্ডপে, কোন গ্রামের মাঝে অশথতলায় বা গুরুমশাইয়ের খড়ের চালায়। এই অসুবিধা সত্ত্বেও পাঠশালার গতি ছিল অবাধ। মসজিদ সংলগ্ন হওয়ার

সুবিধা ছাপিয়ে অসুবিধাগুলিই বড় হয়ে উঠেছিল মখতবের বেলায়।

আর একটি বিষয়ে মখতব ও পাঠশালার মধ্যে বিশেষ অমিল ছিল। এই পাঠশালা শিক্ষার একটা ব্যবহারিক দিক ছিল। ব্যবহারিক শিক্ষার টানেই নীচেরতলার মানুষেরা আরো বেশি করে পাঠশালা শিক্ষার দিকে ঝুঁকছিল। শিক্ষকরাও নিজেদের তাগিদে পড়ুয়া সংগ্রহে মন দিত। মখতবগুলিতে সেই পরিমাণে ব্যবহারিক শিক্ষার অবকাশ ছিল না। কোরান মুখস্থ করার দিকে যতটা ঝোঁক ছিল 'সেকুলার' ব্যবহারিক শিক্ষার দিকে ততটা ঝোঁক না থাকাই স্বাভাবিক। তাছাড়া একাধিক ভাষা শেখার টানাপোড়েনের ভোগান্তি তো ছিলই। কোরান মুখস্থ করার পেছনে ধর্মীয় আবেগ থাকলেও দৈনন্দিন জীবনের দৌড়ঝাঁপে সে আবেগের রেশ মিলিয়ে যেতে দেরি হত না। আরো একটা কথা এই যে মসজিদের ইমাম বা পেশী ইমামরাই মখতবের শিক্ষকতা করতেন। ফলে মখতব শিক্ষকদের জীবন-ধারণের জন্য পুরোপুরি পড়ুয়াদের উপর নির্ভর করতে হত না। তাদের এই স্বনির্ভরতা কিন্তু শিক্ষক-পড়ুয়ার সম্পর্ককেও প্রভাবিত করত। পাঠশালার গুরু-শিষ্যের মধ্যে মানবিক সম্পর্কের যে নিবিড়তা ছিল মখতবের মিঞাজি আর পড়ুয়াদের মধ্যে ততটা গভীর সম্পর্ক ছিল না বলেই অনেকে মনে করেন। তবে মসজিদের আওতার বাইরেও শিক্ষকের ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেক মখতব গড়ে উঠেছিল। এই মখতবগুলির সঙ্গে পাঠশালার খুব তফাত হয়ত ছিল না। এইসব মখতবে বাংলা বা ফারসী লেখাপড়ার সঙ্গে হয়ত কোরানও মুখস্থ করতে হত। তবে এই ধরনের মখতবের সংখ্যা কত ছিল তা অনুমান করার মতো তথ্য বড় একটা পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গত, বলে নেওয়া দরকার, যেসব বড় মসজিদে মখতব ও মাদ্রাসা দুইই থাকত সেখানে মখতবগুলি সাধারণত মাদ্রাসার প্রস্তুতি স্কুলের ভূমিকাই পালন করত। কিন্তু সবরকম মখতবেই কোরান মুখস্থ করা ছিল আবশ্যিক।

যাইহোক, ধর্মীয় গোঁড়ামির ফলে মখতব শিক্ষা যে সাধারণের ব্যবহারিক শিক্ষায় পরিণত হতে পারেনি সেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে ধর্মান্তরিত সাধারণ মুসলমানের ধর্মীয় শিক্ষার চাহিদা মেটাতে মখতব যে এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল সেবিষয়েও সন্দেহ নেই। আসলে মখতব শিক্ষার সীমাবদ্ধতা মখতব শিক্ষার উৎসের ইতিহাসেই নিহিত। আবার

এই সীমাবদ্ধতাই বহুদিন পর্যন্ত মখতবগুলিকে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে রক্ষা করেছিল।

ব্রিটিশ আমলে প্রাক্-ব্রিটিশ ফারসী বা ফারসী-বাংলা স্কুলের জায়গা নিয়েছিল 'অ্যাংলো-ভার্নাকুলার' স্কুল। আর পাঠশালাগুলি কালে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক স্কুল পরিণত হয়েছিল। স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবহারিক শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে এগুলি ব্রিটিশ প্রবর্তিত একটানা গোটা শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের ভূমিকা পালন করছিল। ফলে সাধারণ মানুষের চাহিদা মেটানোর ভূমিকা হারিয়ে এগুলি উচ্চ ও মধ্যবিত্তের করায়ত্ত হয়ে পড়ল। মখতবগুলি কিন্তু বহুকাল কোরান স্কুল হিসাবে তাদের নিজস্ব আলাদা সত্তা বজায় রাখতে পেরেছিল। ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে দেখা যায় মাত্র ১২৫০টি মখতব শিক্ষা বিভাগের অনুমোদন পেয়েছিল বা নিয়েছিল। অথচ সেই সময়ের মধ্যে ৫০০০০ পুরনো পাঠশালা শিক্ষা বিভাগের অনুমোদিত নিম্ন প্রাথমিক স্কুলে পরিণত হয়েছিল।[১১৯]

ব্রিটিশ গোটা শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে মখতবগুলির ভূমিকা কি হবে, এবং কি পড়ানো হবে এই নিয়ে বহু বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মখতব শিক্ষার সম্পর্ক কি হবে এই ছিল বিতর্কের কারণ। এই বিতর্কের দুটি মূল বিষয় ছিল—মখতব শিক্ষার ভাষা কি হবে আর কোরান বা ধর্মীয় শিক্ষার কি ব্যবস্থা হবে। ব্রিটিশ শাসকরা শিক্ষা বিভাগের স্কুলে প্রথম দিকে ধর্মীয় শিক্ষাকে উৎসাহ দেয়নি। আবার অনুমোদন না পেলে শিক্ষাবিভাগের দেয় সাহায্য পাওয়া যেত না। কিন্তু শিক্ষাকে শিক্ষা বিভাগের আওতায় বা নজরদারিতে আনাই ছিল ব্রিটিশ শিক্ষানীতি। এই অবস্থায় মখতবগুলিকেও শিক্ষা বিভাগের আওতায় আনার চেষ্টা হয়। যাইহোক, মখতবে কোরান পড়াতে হবে এবিষয়ে প্রায় সকল মুসলমানই একমত ছিলেন। ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে উর্দু, বাংলা, আরবী আর ইংরেজি এই চারটি ভাষার কথা ওঠে। বাংলা সরকার ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি কমিটি করেন। এই কমিটি মখতবে বাংলা ও উর্দু ভাষা শেখা আর কোরান পড়ানোর প্রস্তাব দেয়।[১২০] বিশ শতকের ত্রিশের দশকে 'বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন' তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হলে 'Moslem Education Advisory Committee' নামে একটি কমিটি ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক স্তরের জন্য একটি শিক্ষাসূচি তৈরি করে। এতে মাতৃভাষা, অঙ্ক,

ভূগোল, ইতিহাস, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থার প্রস্তাব দেওয়া হয়; এবং বলা থাকে যে ধর্মীয় শিক্ষার সময়সূচিতে কোন 'সেকুলার' শিক্ষা দেওয়া যাবে না। যেসব প্রাথমিক স্কুলে হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য সেখানেও এই সূচি চালু করতে হবে।[১২১] আসলে কোরান পড়ার সুযোগ দিয়ে মখতবগুলিকে প্রাথমিক স্কুলে পরিণত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কোরান পড়ার সময় দিতে গিয়ে যাতে মুসলমান পড়ুয়ারা 'সেকুলার' বিষয়ে হিন্দু পড়ুয়ার থেকে পেছিয়ে না পড়ে তাই ধর্মীয় শিক্ষার সময়সূচীতে কোন 'সেকুলার' বিষয় পড়াতে মানা। কালে বহু মখতবই শিক্ষাবিভাগের অনুমোদন নিয়ে প্রাথমিক স্কুলে পরিণত হয়। অবশ্য কোরান পড়ার সুযোগও থাকে। কোরান বা ধর্মীয় শিক্ষার উপর এই জোর দেওয়ার প্রবণতা কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুসলমানের ইংরেজি শিক্ষাকে বেশ ব্যাহত করে। ব্রিটিশ প্রবর্তিত প্রাথমিক স্কুল মখতবে কোরান পড়ার বা ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ থাকলেও ব্যবহারিক শিক্ষার কোন অবকাশ থাকে না। এইভাবেই বাংলার ব্যবহারিক শিক্ষার অবসান করে সাধারণ মানুষকে শিক্ষার আঙিনা থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া হয় ব্রিটিশ আমলে। মখতব আর পাঠশালা দুইই প্রাথমিক স্কুলে পরিণত হয়।

শেষের কথা

এ পর্যন্ত আমরা বাংলার দেশজ শিক্ষার তিনটি ধারা পাঠশালা, মখতব ও ফারসী স্কুল সম্পর্কে আলোচনা করেছি। প্রথম দুটি বাংলার দেশজ প্রাথমিক শিক্ষা-ধারা নামেও পরিচিত। তবে সর্বসাধারণের লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার স্কুল বলতে বোঝায় পাঠশালা শিক্ষা। মখতব মূলত কোরান শেখার স্কুল আর ফারসী স্কুল প্রধানত ফারসী ভাষা শেখার প্রতিষ্ঠান। কোন কোন বিশেষ মখতবে হয়ত একাধিক ভাষা ও অঙ্ক শেখার ব্যবস্থাও ছিল। আবার অনেক ফারসী স্কুলও মখতব নামে পরিচিত হত। পাঠশালা ও ফারসী স্কুলগুলি তুলনায় অনেক বেশি 'সেকুলার' বা ধর্মনিরপেক্ষ ছিল। আর পাঠশালা শিক্ষা ছিল অনেকখানিই ব্যবহারিক। তাছাড়া মাতৃভাষা বাংলাই ছিল শিক্ষার বাহন এবং একমাত্র শিক্ষণীয় ভাষা। ফলে খেটে খাওয়া আপামর জনগণের মধ্যে পাঠশালা শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। সুবে বাংলায় এক লক্ষ পাঠশালায় শিক্ষক ও পড়ুয়ার যে পরিচয় আমরা অ্যাডাম রিপোর্টে বা অন্যান্য নথিতে পাই তা অবশ্যই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজের সবচাইতে নীচু জাত ও শ্রেণীর লোকেরাও যে পাঠশালা শিক্ষায় অংশ নিত সে প্রমাণ আমরা পেয়েছি। তবে দেশজ শিক্ষার সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে একথাও মনে রাখতে হবে যে স্বয়ংসম্পূর্ণ আলাদা শিক্ষাধারার ভিত্তি হচ্ছে জাত, ধর্ম ও শ্রেণীভেদ।

যাইহোক, এই তিন ধারার শিক্ষার সাংগঠনিক রূপ কিন্তু প্রায় একই রকম ছিল। সাধারণত, অভিভাবক বা শিক্ষকের উদ্যোগে অথবা উভয়ের যৌথ উদ্যোগে এইসব স্কুল সংগঠিত হত। পড়ুয়াদের দেওয়া বেতনের উপর নির্ভর করেই সাধারণত এইসব স্কুল চলত। মখতবগুলি মসজিদ সংলগ্ন হওয়ায় পড়ুয়াদের দেওয়া বেতন বা সিধা ছাড়াও এদের অন্য আয় ছিল। ওয়াকফ সম্পত্তির আয় থেকে মসজিদের ইমাম বা পেশ ইমাম মাসোহারা পেতেন। তাঁরাই আবার মখতবেরও শিক্ষক ছিলেন। ফলে তাঁদের পড়ুয়াদের বেতনের উপর পুরোপুরি নির্ভর করতে হত না। পাঠশালা আর ফারসী স্কুলগুলি সম্পূর্ণ-ভাবে পড়ুয়াদের দেয় বেতনের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় শিক্ষকদের যারপরনাই উদ্যোগী হতে হত। শিক্ষকের যোগ্যতার উপর তাঁর আয়ের পরিমাণ

অনেকখানি নির্ভর করত। যোগ্য শিক্ষকের পড়ুয়ার সংখ্যা যেমন বেশি হত তেমনি গ্রামের লোকের সাহায্যও তাঁরা বেশি পেতেন। যোগ্য শিক্ষককে নিয়ে পাশাপাশি গ্রামের টানাটানির বহু খবরও পাওয়া যায়। আসলে শিক্ষকই এই তিন ধারার শিক্ষার মূল খুঁটি।

বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর কিন্তু কোন কেন্দ্রীয় খবরদারি বা সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তবে ঐতিহ্যবলে বিশেষ ধারার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই ধরনের শিক্ষা দেওয়া হত। শিক্ষকের যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মানের হয়ত কিছু তারতম্য ঘটত। এই বিকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেত। অন্যদিকে অভিভাবকের কাছে শিক্ষকের দায়বদ্ধতা শিক্ষার মানকে ধরে রাখতে সাহায্য করত। ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠত। ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে শিক্ষা পণ্য হত না। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক মূলত ঐতিহ্যের অনুশাসন বা স্মৃতির বিধানের দ্বারা নিয়মিত হত। মধ্যযুগে বেতন বা অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা দেওয়ার প্রথা চালু হলেও ব্রাহ্মণ্য গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের ঐতিহ্যও পাঠশালার ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ককে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল। একদিকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক, অন্যদিকে গ্রামসমাজের সামাজিক সম্পর্ক ও ঐতিহ্যানুসারী গুরু-শিষ্য সম্পর্ক—এই একাধিক সম্পর্কের মিলনে শিক্ষকতা পেশা হিসাবে যথেষ্ট দায়িত্বশীল ও মর্যাদাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

এবিষয়ে সন্দেহ নেই তখনকার সামাজিক সম্পর্কের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার স্বার্থেই এই বিভিন্ন ধারার স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশজ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। উঁচুশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের জন্য সংস্কৃত শিক্ষা, উঁচুশ্রেণীর মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা আর হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল উঁচুশ্রেণীর জন্য ফারসী শিক্ষা। অন্যদিকে নীচুশ্রেণীর মুসলমানদের জন্য মখতব শিক্ষা আর সর্বসাধারণের জন্য পাঠশালা শিক্ষা। এ প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখ করা দরকার যে সংস্কৃত শিক্ষার টোল আর ইসলামী উচ্চশিক্ষার মাদ্রাসা লাখেরাজ জমি বা ওয়াকফ সম্পত্তির আয়ে চললেও পাঠশালা শিক্ষা এবং অনেকাংশে ফারসী শিক্ষা প্রধানত পড়ুয়াদের দেয় বেতনের উপর নির্ভর করেই চলত। শিক্ষায় পণ্যপ্রথার এই প্রচলন দেশজ প্রাথমিক শিক্ষাকে অনেকখানি গতিশীল করে তুলেছিল।

সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও কেন্দ্রীয় খবরদারি না থাকায় এবং শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে শিক্ষকের আর্থিক স্বার্থ জড়িয়ে থাকায় বিশেষ করে পাঠশালা শিক্ষা কৃষি-

সমাজের একেবারে তলার শ্রেণী পর্যন্ত প্রসারিত হয়। পাঠশালা শিক্ষার এই প্রসার এবং নীচুশ্রেণীর মানুষের পাঠশালা শিক্ষায় বেশি বেশি অংশগ্রহণ কিন্তু সমাজের উঁচুতলার লোকদের মনঃপূত ছিল না। জমিদার ও উঁচুশ্রেণীর ব্রাহ্মণরা পাঠশালা শিক্ষার প্রসারে শুধু যে খুশি ছিল না তাই নয় তারা অনেক সময় এর বিরোধিতাও করেছে। পাঠশালায় বাংলা ভাষার চর্চা এবং বাংলা সাহিত্যের বিকাশ বিশেষ করে সংস্কৃত শাস্ত্রীয় সাহিত্যের বাংলা অনুবাদ ব্রাহ্মণ সমাজের বিরক্তির কারণ হয়। ব্রাহ্মণ সমাজের এই মনোভাব যারপরনাই প্রকট হয়ে উঠে এই উক্তিতে—

কৃত্তিবেশে কাশীদেসে আর বামুন-ঘেঁসে।
এই তিন সর্ব্বনেশে শাস্ত্র খেলে চুষে॥

পাঠশালার শিক্ষকদের বেশির ভাগই অব্রাহ্মণ নীচুজাতের মানুষ। এমনকির ব্রাহ্মণ শিক্ষক এবং কায়স্থ বা অন্য নীচুজাতের শিক্ষক পরিচালিত পাঠশালার মধ্যেও বেশ তফাত ছিল। নীচুজাতের পড়ুয়ারা সাধারণত ব্রাহ্মণ শিক্ষকে পাঠশালা পছন্দ করত না। লালবিহারী দের 'গোবিন্দ সামন্ত' বইয়ে এবিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা আছে। লেখক জানাচ্ছেন যে কাঞ্চনপুর গ্রামে দুটি পাঠশালা ছিল। একটির শিক্ষক ব্রাহ্মণ, অন্যটির কায়স্থ। "তাই বলে ব্রাহ্মণ কায়স্থের চেয়ে যোগ্যতর শিক্ষক তা নয়। পূর্বোক্ত পণ্ডিত সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের কিছু অংশ পড়লেও এবং কথায় কথায় সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করলেও বাংলার বর্ণাশুদ্ধি জ্ঞান তার ছিল অত্যন্ত কম, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পণ্ডিতটি সংস্কৃতজ্ঞতার কোন রকম অহমিকা না করলেও লোকটার পাটীগণিতে জ্ঞান ছিল অসাধারণ, জমিদারী হিসাবেও তার টনটনে জ্ঞান ছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়ের কিন্তু জমিদারী সেরেস্তা সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই ছিল না।" তিনি আরো জানাচ্ছেন যে ব্রাহ্মণের পাঠশালায় "শিক্ষালাভ করে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও ধনী বেনেদের ছেলেরা"। আর "কায়স্থ শিক্ষকের পাঠশালায় সাধারণতঃ নীচু জাত ও গরীব ছেলেরা শিক্ষালাভ করলেও দুএকজন ব্রাহ্মণের ছেলেকেও দেখা যেত।" গোবিন্দর বাবা বদন দুটো কারণে গোবিন্দকে কায়স্থ শিক্ষক রামরূপের পাঠশালায় পড়তে পাঠায়। "প্রথমতঃ প্রথমোক্ত পাঠশালায় অভিজাত ঘরের ছেলেরা পড়ে, বদনের ইচ্ছা তার ছেলে সমশ্রেণীর কাছাকাছি শ্রেণীর ছেলেদের সঙ্গে শিক্ষা লাভ করে, দ্বিতীয়তঃ, গোবিন্দকে জমিদারী সেরেস্তায় অভিজ্ঞ করে তোলা তার অভিপ্রেত।" পাঠশালা শিক্ষায় শ্রেণীভেদের এটি একটি অসাধারণ উদাহরণ।

লেখাপড়া শিখে গোবিন্দ জমিদার-মহাজনের অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে মাথা তোলার চেষ্টা করলে জমিদারের রোষে তাকে কিভাবে সর্বস্বান্ত হতে হয় তার অকপট বিবরণ আছে এই বইয়ে। ছেলের বিবাহ উপলক্ষে জমিদার প্রজাদের কাছে মাথট বা বেআইনী আবওয়াব দাবি করলে গোবিন্দ অনিচ্ছায় মাথট দিতে বাধ্য হলেও এটা যে বেআইনী জুলুম সেকথা ঘোষণা করে। ফলে জমিদারের পেয়াদা তার বাড়িতে আগুন দেয়। পোড়া ঘর মেরামতের জন্য গোবিন্দকে আবার মহাজনের দ্বারস্থ হতে হয়। ফল যা হবার তাই হয়। জমিদারের ধারণা গোবিন্দের এই ধৃষ্টতার কারণ তার পাঠশালায় লেখাপড়া শেখা। জমিদার রোষ কটাক্ষে বলে, "ও তুমি পণ্ডিত হয়েছ, তোমার চোখ ফুটে গিয়েছে, সেইজন্য মাথট দিতে চাওনা। আমি রামরূপকে বারণ করে দেব সে যেন চাষীদের ছেলেকে না পড়ায়, যদি না শোনে, তাহ'লে ঐ মূর্খটার আর একখানা ঠ্যাং ন্যাংড়া করে দেব।" জমিদারের এই উক্তিতে খেটে খাওয়া মানুষের লেখাপড়া শেখা সম্পর্কে সমাজের মালিক শ্রেণীর মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে। এখানে বলে নেওয়া দরকার যে জমিদারের অন্যায় জুলুম সম্পর্কে গাঁয়ের অশিক্ষিত নন্দ কামার বা গোবিন্দের কাকা কালোমাণিকও সমান সচেতন এবং জমিদারের বিরুদ্ধাচরণে সমান উৎসাহী।

আসলে গ্রামসমাজের গতরখাটা চাষী-মজুর জমিদার-মহাজনের জুলুম তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝে। তার জন্য লেখাপড়া শেখার দরকার হয় না। এই জুলুমের বিরুদ্ধে নিরক্ষর চাষী-মজুর রাগে ফুঁসেছে। এবং বারে বারে রুখে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই স্বতঃস্ফূর্ত উত্থান খুব কমই সংগঠিত স্থায়ী প্রতিরোধের রূপ নিয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সুদূরপ্রসারী প্রভাবে নিরক্ষর চাষী-মজুর শেষ পর্যন্ত নিয়তিবাদ বা ভবিতব্যের কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছে। নিজের হীনাবস্থাকে নিয়তির বিধান বলেই বিশ্বাস করেছে। আবার লৌকিক দেবদেবীর আশ্রয়ে কখনো গুমরে উঠেছে প্রতিবাদের বেদনা। বাংলার খেটে খাওয়া মানুষ অনেক জুলুম সহ্য করেছে, তবু ঘামে রক্তে কান্নায় বাঁচিয়ে রেখেছে নিজের অন্তরঙ্গ ভাবনা লৌকিকধর্মে ও কাব্য-সাহিত্যে। বাংলা পাঠশালা শিক্ষা বাংলার এই অন্তরঙ্গ ভাবধারাকে প্রবহমান রাখতে এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। অন্যদিকে পার্থিব জগতে টিকে থাকার ব্যবহারিক শিক্ষা বিশেষ করে জমিদারি হিসাব, পাট্টা, কবুলিয়ত ও মহাজনী হিসাব সম্পর্কে জ্ঞান খেটে খাওয়া মানুষকে নিজের অধিকার সম্পর্কে

সচেতন হতে নিশ্চিতভাবেই যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

উপরের আলোচনা থেকে একথা সাব্যস্ত করা কিন্তু ঠিক হবে না যে পাঠশালা শিক্ষা ছিল পুরোপুরি একটি প্রতিবাদী শিক্ষাধারা বা শাসক-শোষক শ্রেণীর ভাবাদর্শের প্রভাবমুক্ত একটি আলাদা শিক্ষাধারা। বরঞ্চ পাঠশালার পাঠ্যবিষয়ে বিশেষ করে শিশুবোধকের ভাষা-পাঠগুলিতে যেমন দাতাকর্ণ বা প্রহ্লাদ চরিত্রে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। অষ্টাদশ শতকে কোন কোন বাংলা পাঠশালায় চাণক্য শ্লোক পড়ানো হত বলেও জানা যায়। অন্যদিকে বাংলার লৌকিক দেবদেবীর আখ্যান পাঠশালায় পড়ানো হত এমন নজির বড় একটা মেলে না। অথচ এইসব লৌকিক দেবদেবীর মঙ্গলকাব্যের রচয়িতারা যে পাঠশালায়ই বাংলা শিখেছিলেন সেবিষয়ে বোধকরি সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলা পাঠশালার ভাষা-পাঠের পুঁথিতে লৌকিক দেবদেবীর আখ্যানের এই অনুপস্থিতির কারণ সম্ভবত ভাষা-পাঠের যেসব পুঁথি পাওয়া যায় তার কোনটাই খুব পুরনো নয়। আঠার শতকের আগের পুঁথি নেই বললেই চলে। আমার মনে হয় চৈতন্য-পরবর্তী যুগেই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শ বাংলার সাধারণ মানুষকেও অনেকটা প্রভাবিত করেছিল। চৈতন্যের ব্রাহ্মণ্য তত্ত্বানুসারী ভক্তিবাদ এবিষয়ে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল বলেই আমার ধারণা। 'শিশুবোধকে'র ভাষা-পাঠ যে অনেকটাই এই ভক্তিবাদের প্রভাবে রচিত তাতে সন্দেহ নেই। 'শিশুবোধকে'র প্রহ্লাদ চরিত্র বা দাতাকর্ণ নামক পাঠগুলি পড়ুয়াকে ভক্তিবাদের বার্তাই জানায়। 'শিশুবোধকে'র গঙ্গা বন্দনা বা সরস্বতী-বন্দনা ছাড়া অন্য পাঠগুলি প্রায় সবই কৃষ্ণমহিমার বার্তা বহন করে অথচ ধর্মঠাকুর, মনসা বা চণ্ডীমহিমার কোন আখ্যান নেই, যদিও সাধারণ মানুষের সঙ্গে এদের সম্পর্ক যারপরনাই নিবিড়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে বাংলা পাঠশালায় শুধু 'শিশুবোধকে'র ভাষা-পাঠই পড়ানো হত এরকম ভাবার কারণ নেই। তবে 'শিশুবোধকে'র প্রচলন যে সবচেয়ে বেশি ছিল অন্তত আঠার শতকে তা সম্ভবত ঠিক।

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব যে কত প্রকট হয়ে উঠছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলার লৌকিক কাব্য-সাহিত্যে সংস্কৃত শব্দের অহেতুক প্রয়োগ এবং মঙ্গল-কাব্যের নায়কদের সংস্কৃত ধাঁচে বাল্যশিক্ষার বিবরণে। আসলে লৌকিক দেবদেবী ও কাব্য-সাহিত্যকে জাতে ওঠাবার জন্যই যে এরকম করা হত একথা সকলেরই জানা। 'শিশুবোধকে' পত্রলেখার যে ধারা আমরা পাই তাতেও এই

প্রভাব লক্ষ করা যায়। পত্রলেখার ধারায় জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের, রাজা-জমিদারের প্রতি চাষী প্রজার নতমস্তক আনুগত্যের ভাব পরিস্ফুট। গ্রামসমাজের বাঁধন ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য এই আনুগত্যবোধের আত্মীকরণ বিশেষ জরুরি ছিল। বিশেষ করে পণ্য-অর্থনীতির বাধ্যবাধকতা দ্বারা যে সমাজ নিয়মিত নয় সে সমাজে উৎপাদন সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে শাস্ত্রীয় অনুমোদনে সামাজিক প্রথা গড়ে তোলা একান্তই জরুরি। মধ্যযুগের বাংলায় এই সম্পর্ক জমির ব্রাহ্মণ মালিক শ্রেণীর স্মৃতির বিধানে নিয়মিত হবে সেটাই স্বাভাবিক। ব্রাহ্মণের স্মৃতিশাস্ত্রে এমনকি রামায়ণের মতো মহাকাব্যেও বর্ণভেদে আনুগত্য ও হীনতা ন্যায়ানুগ ও ঈশ্বরের বিধান বলেই প্রচারিত। পাঠশালায় কঠোর দৈহিক শাস্তি ও গুরু-শিষ্য সম্পর্ক বেতননির্ভর শিক্ষার অনেকান্ত প্রভাবের প্রতিষেধক হিসাবেই বিবেচনা করা যেতে পারে। আসলে পাঠশালা শিক্ষার মধ্যেও এক দ্বৈরথ প্রক্রিয়া কাজ করেছে। ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি বর্ণভেদের প্রতি সামাজিক সম্মতি আদায়ে বিশেষ সাফল্যলাভ করলেও প্রতিবাদকে পুরোপুরি দমন করতে পারেনি। পাঠশালা পড়ুয়া শ্রীমন্তের সঙ্গে ব্রাহ্মণ গুরুর বচসার যে ছবি আমরা কবিকঙ্কণে ও দ্বিজ মাধবের 'চণ্ডীমঙ্গলে' পাই তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রামানন্দ যতির 'চণ্ডীমঙ্গলে' কিন্তু এই বিবাদের কোন উল্লেখ নেই। বেদান্তবাদী রামানন্দ শ্রীমন্তের 'ব্রাহ্মণেতে ভক্তি অতি' বলে জানাচ্ছেন। জমিদারের অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে গোবিন্দ সামন্তর প্রতিবাদও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

পাঠশালা শিক্ষার পার্থিব ব্যবহারিক প্রকৃতি আর বাংলা ভাষা চর্চার লোকায়ত প্রতিবেশের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শের টানাপোড়েনের প্রক্রিয়ায় বাংলা পাঠশালা শিক্ষার বিকাশ ঘটেছে। মধ্যযুগের বাংলার শাসনক্ষমতা মুসলমানের হাতে থাকায় বাংলা ভাষা চর্চার এবং পাঠশালা শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের বিকাশ যেমন অনেকখানি সুগম হয়েছিল, তেমনি আর্থ-সামাজিক ক্ষমতা প্রধানত ব্রাহ্মণ ও উঁচুবর্ণের লোকের হাতে থাকায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তবে পাঠশালার শিক্ষক ও পড়ুয়াদের মধ্যে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের সংখ্যাধিক্য থাকায় পাঠশালার স্বাতন্ত্র্য ও লোকায়ত চরিত্র অনেকটা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। পাঠশালা শিক্ষার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শ নীচুবর্ণের পড়ুয়াদের মধ্যে খানিকটা প্রতিষ্ঠা পেলেও তার পার্থিব ব্যবহারিক দিক উঁচুবর্ণ ও শ্রেণীর জুলুমের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন হতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। সবচাইতে বড় কথা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার জোয়ার এনে লোকায়ত সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আর এটাই পাঠশালা শিক্ষার সবচাইতে বড় অবদান।